নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-ফিল্.

অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

স্নেহময়ী মা'র পুণ্যস্মৃতিতে

নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে স্ফূর্ত বাংলা কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেই যুগের নিগূঢ় ভাবপ্রবৃত্তি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবি নবীনচন্দ্রের কবি-প্রকৃতিরও সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের জন্ম তাঁহার রচনাবলীর বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মধুসূদনের প্রাণ-পৌরুষের উত্তরসাধক হইলেও তাঁহার বিরাট প্রতিভার সমকক্ষতার দাবী নবীনচন্দ্রের অবশ্যই ছিল না। তথাপি সাহিত্যে প্রবল প্রাণাবেগ, স্বদেশ-ব্যাকুলতা ও আদর্শ-প্রবণতা সঞ্চারণাতেই যে তাঁহার কবিচিত্তের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত, এবং এক হিসাবে তাহা যে সেই যুগপ্রবৃত্তির সহিত সুসঙ্গত, আবার ধ্যানধারণা রসবোধ ও কাব্যরীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তনের যুগেও তাঁহার গীতিপ্রাণতা এবং জীবন-রসকৌতূহল যে রসিক পাঠকের আগ্রহ জাগাইতে সক্ষম—এ কথা সম্যক বুঝিবার চেষ্টা না করিলে এই উল্লেখযোগ্য কবির কাব্য-আস্বাদন অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। নবীনচন্দ্রের রচনা সংখ্যায় ও আয়তনে যেমন স্বল্প নহে, তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। অথচ আজ পর্যন্ত তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার কোন কোন কাব্য সম্পর্কে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা নানা সাময়িক পত্রে এবং সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে করা হইয়া থাকিলেও তাহা কবির যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। একাধিক বিচক্ষণ সমালোচক নবীনচন্দ্রের কবি-ধর্মের মূল প্রকৃতি সামান্যভাবে নির্দেশ করিয়াছেন সত্য, তথাপি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার প্রতিটি রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করার দরুণ অধিকাংশ কাব্য পাঠক তাঁহাব সম্পর্কে কতিপয় বহুল প্রচারিত ধারণার বশবর্তী হইয়াই এতকাল চলিয়া আসিতেছেন, এবং তাহার ফলে পূর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অভাবে কবির প্রতি সুবিচার করাও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। দোষোদ্‌ঘাটনের উত্তম গুণগ্রহণের আগ্রহকে বরং স্তিমিত করিয়া দিতেছে।

বর্তমান সুবিস্তৃত আলোচনা কবি নবীনচন্দ্র সেনের সমগ্র রচনার যথাসম্ভব সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ ও বিচার, এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কবি-

কৃতির যথার্থ মূল্যায়ন-প্রয়াস। কবির ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং বিচার-তৎপর থাকিয়াও তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মনোধর্ম উপলব্ধির প্রযত্ন ইহাতে পরিলক্ষিত হইবে। এই আলোচনায় অনুসৃত নীতি ও রীতি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়েই সুস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর অধ্যায়ক্রমে কবির জীবনকথা ও যুগপ্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিটি কাব্য স্বতন্ত্রভাবে যথাযথ পটভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে, গদ্যরচনাও বাদ পড়ে নাই। কবির ভাষা এবং ছন্দ-প্রয়োগের উপরও স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সর্বোপরি নবীনচন্দ্র সম্পর্কে কতিপয় প্রচলিত ধারণাকে নূতন তথ্য ও যুক্তির আলোকে পুনরায় বিচার করিয়া ক্ষেত্রবিশেষে নিরসন বা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 'দেশ, কাল ও মন' অধ্যায়ে যুগাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নবীনচন্দ্রের চিত্তস্ফূর্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিছুটা সংক্ষিপ্ত মনে হইতে পারে। কিন্তু কবিকৃতি আলোচনার পটভূমিরূপে সে যুগের ভাবান্দোলনের যতটুকু চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে, কাব্যপাঠের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া লেখকের ধারণা। মনে রাখিতে হইবে—নবীনচন্দ্রের চিত্তের দ্বিধা-সংশয়ও সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষীও যাহা সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আবার রামমোহন-বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠার পরে যে হৃদয়াবেগ-প্রাবল্য জাতির ভাবচিন্তায় দেখা দিয়াছিল, শিশিরকুমার ঘোষের বৈষ্ণবপ্রবণতা এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিব্যাকুলতা যাহাকে পুষ্ট করিয়াছিল, মুখ্যতঃ আবেগধর্মী কবি নবীনচন্দ্র আখ্যায়িকা-কাব্যে তাহারই ভাববিহ্বল রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন। সে যুগের স্বদেশচিন্তাও প্রধানতঃ আবেগপ্রবুদ্ধ। যাহা হোক, অন্যান্য অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে এই সমস্ত কথা নানাভাবে বলা হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ১৯৪৭ সালে নবীনচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন হইতেই এই বিষয়ে বিস্তৃততর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে দেশত্যাগজনিত বিপর্যয় এবং প্রৌঢ় বয়সে নূতন কর্ম-জীবন আরম্ভের বিড়ম্বনায় বহুকাল সেই কার্য অনারব্ধ থাকে। যাহা হোক, নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আমার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকাকালে কয়েক

বৎসরের স্বাধীন গবেষণার ফল। বস্তুতঃ এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয় ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে, মুদ্রণকার্য সম্পূর্ণ হয় ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। নানা কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য আমাকে ডি.-ফিল. উপাধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। প্রবীণ পরীক্ষকত্রয়—অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়গণ আমার গবেষণা-প্রবন্ধ সম্পর্কে সপ্রশংস অভিমত জ্ঞাপন করায় আমি তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বহুকাল পূর্বে কলেজ-জীবনের স্মরণীয় বর্ষ-চতুষ্টয়ে পিতৃপ্রতিম অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর আবেগ-প্রোজ্জ্বল অধ্যাপনায় উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও জীবনসাধনা সম্পর্কে আমার অন্তরে যে গভীর শ্রদ্ধা উপচিত হইয়াছিল, তাহাই নবীনচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় সর্বাধিক প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। এই গবেষণা-নিবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনা-ব্যাপারে সহায়তা করিয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ শ্রদ্ধেয় প্রবীণ আচার্যবৃন্দ নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া আমাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভানুধ্যান আমাকে শক্তি যোগাইয়াছে। স্নেহধন্যের বিনম্র প্রণাম ইঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল।

শ্রীমান সুনীলেন্দুপ্রকাশ রায় ও শ্রীমান সঞ্জীবকুমার চৌধুরী আমার নবীনচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার প্রথম প্রণোদক হিসাবে স্মরণীয়। এই গ্রন্থের নির্দেশিকাটি শ্রীমতী অনুরাধা রায়ের সযত্ন-কৃত। শ্রীশৈলেন্দ্রসুন্দর পোদ্দার, শ্রীহরনাথ পাল, শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ আমার রচনা সম্পর্কে পূর্বাপর কৌতূহলী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই আমার প্রিয়জন, তাই আমার সামান্য সাফল্যে তাঁহাদের অসামান্য আনন্দ উপলব্ধি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত। তথ্যসংগ্রহে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য শ্রীযুত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান দীপক সেনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সাহিত্যানুরক্তিবশতঃ সাগ্রহে গ্রন্থটি মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত রাখার সর্ববিধ অসুবিধা বিনা দ্বিধায় সহ্য করিয়াছেন বলিয়া মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক বন্ধুবর শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের নিকট আমি ঋণী।

কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থিতির দরুণ বহু মুদ্রণ-প্রমাদ থাকিয়া গেল, গ্রন্থশেষে প্রদত্ত সংশোধনীতে সেই কলঙ্কমোচনের কিছুটা চেষ্টা হইয়াছে। ৩০২ পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্রের যে কাব্যাংশটুকুকে আমি স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, উহা বস্তুতঃ ধ্বনিপ্রধানছন্দ। এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় প্রবীণ ছান্দসিক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অনুরূপ সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রশ্রয় ভিক্ষা করি।

কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

সূচী

নবীনচন্দ্রের পুনর্মূল্যায়ন

এক যুগের শক্তিমান কবির কাব্যসৃষ্টির বিপুল প্রশস্তি অন্যযুগে শোচনীয় অবজ্ঞায় অবলুপ্ত হইয়াছে—সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পরবর্তী কালে সেই হৃতগৌরব কাব্য পাঠকচিত্তে যে দ্বিধা-সংশয় জাগাইয়া তোলে, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় তাহা বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি ওর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।
তারপর চলে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়'।

'মধু-চক্রের' অন্যতম কবি নবীনচন্দ্র সেনের কবি-কৃতি সম্পর্কেও অনুরূপ দ্বিধা বেশ কিছুকাল হইতে আমাদের মনে জাগিয়াছে, তাঁহার মূল্যমান সম্পর্কেও আমরা এখন আর নিঃসংশয় নই। অথচ নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিষ্ঠা এক সময় গৌরবজনক ছিল। তাহা শুধু মধু-পন্থার অনুবর্তনের জন্য নহে; তাঁহার প্রবল প্রাণশক্তি, অদম্য হৃদয়াবেগ ও আন্তরিক উচ্ছ্বাসই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জ্যেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহার প্রতিভাকে সস্নেহ স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক সমালোচকদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নানা সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কোন কোন কাব্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন প্রথম তাঁহার 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে (১৯১৫) এক সহৃদয় বিস্তৃত সমালোচনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ নবীনচন্দ্রের কবি-মানসের মূল প্রবৃত্তিসমূহ নিপুণভাবে নির্দেশ করেন। তাঁহার মন্তব্য সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করিলাম এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত আমরা শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধায় বিচার করিয়াও নবীনচন্দ্র-সম্পর্কে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

"নবীনচন্দ্র ভাবুক, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভাবাবেগ বা কল্পনাদৃষ্টির প্রসার অনেক বিস্তৃত ও দূরগামী। তাঁহার ভাষাও সমধিক জ্বালাময়ী, লীলাচঞ্চল, বেগগামী ; তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি এবং মনুষ্যত্বনিষ্ঠাও হয়ত সমধিক প্রসারিত ; কিন্তু ইনি তাঁহাদের ন্যায় সংযত এবং কুশলী কবি নহেন। ভাবাবিষ্ট হইলে তাঁহার আত্মসংযম থাকে না।...সুতরাং নবীনচন্দ্রের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কবির অনুরূপ আবেগ আছে, স্থানের প্রসারও আছে, কিন্তু অনুরূপ গাম্ভীর্য এবং শিল্প-সংযম নাই।......সকল দোষ সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের কাব্য সাহিত্য-রসিকের চিরকালের উপভোগ্য হইয়া আছে।"[২] বিরুদ্ধ সমালোচনাও যে সে যুগে একেবারে হয় নাই—এমন নহে, এবং তাহা হইয়াছিল প্রধানতঃ তাঁহার 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া। 'ভারতী' (১২৯৪) এবং 'নব্যভারত' (১৩০০) পত্রিকার দুই একটি প্রবন্ধই শুধু সেই বিষয়ে উল্লেখ্য নয়, বীরেশ্বর পাঁড়ে রচিত 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭) গ্রন্থটি নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে পুরাণ-ইতিহাসের তথ্যবিরোধিতা ও সামঞ্জস্যহীনতার অভিযোগ লইয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল। তবু সেযুগে নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সপ্রশংস স্বীকৃতিই ছিল বহু ব্যাপক। মোহিতলালের ভাষায়—"মনে রাখিতে হইবে তখন হেম-নবীনের যুগ, মাইকেল কেবল মহাকবি নামটি মাত্র খেতাবস্বরূপ লাভ করিয়া বিদায় হইয়াছেন, কবি বিহারীলাল তখন কবিই নহেন।"[৩] অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে সুস্থির কবি রবীন্দ্রনাথও হেম-নবীনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"তখন হেম বাঁড়ুজ্জ্যে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোন দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোন একটি কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন, কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুলে ছিলুম।"[৪] সেই নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহ সম্পর্কে আজ আমরা দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাবি—

এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল্ জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক চিন্তার গতি লক্ষ্য করিতে হইবে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন—'এককালে লোকে সত্য সত্যই তাঁহাকে (নবীনচন্দ্রকে) মহাকবি অর্থাৎ মহাকাব্য-রচয়িতা কবি বলিয়া মনে করিত, এখন তাঁহার সে খ্যাতিতে আর বড় কেহ বিশ্বাস করে না,······নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এখনও গ্রন্থাকারে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা কত পরিমাণে কবির প্রতিভায় আর কত পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্তির কৃপায় বলা কঠিন। নবীন সেনের অবকাশরঞ্জিনী, অমিতাভ, অমৃতাভ প্রভৃতি কাব্য আজ আর কে পড়িয়া থাকে? তাঁহার পলাশির যুদ্ধ এখনো লোকে পড়ে, তার কারণ পলাশির যুদ্ধ অনেক স্থলেই বায়রণের চাইল্ড-হ্যারল্ড কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ।"[৪] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক খ্যাতির কারণ নির্ণয় এখনকার পাঠকের পক্ষে দুষ্কর। তাঁহাদের মহাকাব্যগুলি ব্যর্থতার মরুভূমি।······মধুসূদন-গঠিত নূতন কাব্য-সংস্কার বা tradition মাত্র ছিল তাঁহাদের সম্বল।"[৫] আদৌ নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য ব্যর্থতার মরুভূমি কিনা, মধুসূদনের কাব্য-সংস্কারের অধিক কিছু তিনি দিতে পারিয়াছিলেন কিনা, এবং পলাশির যুদ্ধ অনেক স্থলেই চাইল্ড-হ্যারল্ডের আক্ষরিক অনুবাদ কিনা, তৎসম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু চাইল্ড-হ্যারল্ডের সম্পর্ক-সূত্রই পলাশির যুদ্ধের জনপ্রিয়তার এবং অদ্যাবধি পাঠযোগ্যতার অন্যতম কারণ—একথা সত্য কী? 'চাইল্ড-হ্যারল্ড' তখন যদি বা কিছু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করিতেন, এখন তাহাও করেন না। বাঙ্গালা দেশে উক্ত ইংরেজী কাব্যের প্রতিষ্ঠা কতটুকু? আবার পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বলিয়াই যদি নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলী এখনো পঠিত হইয়া থাকে, তবে রবীন্দ্র-পূর্ব অধিকাংশ কাব্য-গ্রন্থের ক্ষেত্রেই কি সে কথা প্রযোজ্য নহে? যেই মধুসূদনের সৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে পূর্বোক্ত সমালোচকও নিঃসন্দিগ্ধ, তাঁহার সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাত্রেরাও নিজ হইতে পড়ে কিনা সন্দেহ—সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের কথা নাই বা বলিলাম। যে গীতিকাব্য বাঙ্গালী মনোবৃত্তির অনুকূল বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার 'ভোরের পাখী' (রবীন্দ্রনাথ আখ্যাত) বিহারীলালের কবিতা আজ কয়জনে পড়ে? সুতরাং কেবল মাত্র আধুনিক পাঠকের সংখ্যাহ্রাসের নিরিখেই পূর্ববর্তী কবিদের মূল্যমান নির্ণয়ের প্রয়াস যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী

প্রতিভার অবিরল ধারাসম্পাতে বাঙ্গালায় যে কাব্যপ্রপাত জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় সমস্ত পূর্বধারাই একান্ত ক্ষীণ ও আবিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে নবীনচন্দ্র-অনুসৃত কাব্যধারায় নিঃসন্দেহ ছেদ পড়িয়াছে, আমাদের মানস-প্রবৃত্তি ও কাব্যচেতনা ভিন্নপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিয়াছে। তাই রবীন্দ্র-পূর্ব বহু খ্যাতিমান কবি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ আজ নিষ্প্রভ।

পূর্বেই বলিয়াছি, নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের রসোৎকর্ষ সম্পর্কেই এ যুগের সংশয় সর্বাধিক, এবং পূর্বাপর অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার লক্ষ্যও তাহারাই। রবীন্দ্রনাথও একস্থলে হেম-নবীনের কাব্যের রসভিত্তিক আলোচনার ঔচিত্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,—"হেম বাঁড়ুজ্জ্যে বৃত্র-সংহার লিখলেন, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন, এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যরূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা সে তর্ক এখানে করতে চাইনে—কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি, ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।"[৭] এই আদর্শে কাব্যত্রয়ের বিচার করিতে গিয়া নবীন সমালোচক তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধে (১৯৫৪ সালে প্রকাশিত) নবীনচন্দ্রের কাব্যগঠন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই।[৮] সাম্প্রতিককালে তাঁহার রচনাটুকুই নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের বিস্তৃত আলোচনাপ্রয়াস। ইহাতেই বোঝা যায়—এই কবির সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কত স্তিমিত। নবীনচন্দ্রের কাব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এযাবৎ হয় নাই। নবস্ফূর্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্মবাণী-ব্যাখ্যাতা মোহিতলাল মজুমদার নবীনচন্দ্রের কাব্য-বিশ্লেষণ না করিলেও তাঁহার কবি-কৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ নানাস্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"নবীনচন্দ্রের আবেগ ছিল, কিন্তু সে আবেগ অন্ধ; তিনি আদৌ আত্মসচেতন ছিলেন না, অতিশয় আত্মাভিমানী ছিলেন; তাই তাঁহার মনে ভাব ও কল্পনার যেমন অবাধ অধিকার ছিল, প্রবলতাও ছিল, তেমনি তাহা উপর দিয়াই বহিয়া যাইত,—অন্তরের মধ্যে কাব্যসৃষ্টির গভীরতর প্রেরণা হইয়া উঠিবার অবসর পাইত না।"[৯] ত্রুটিনির্দেশ সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি যে

অবহিত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা বহুপূর্বে বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট লিখিত একটি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে—"ইংরেজী যুগের বাংলা-কাব্যে নবীনচন্দ্রের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। নবীনচন্দ্রও এই যুগের একজন Representative poet ; সেই যুগের ভাবাবেগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাব্যগুলিতে মুক্তস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। ভাবুকতা, ভাবপ্রবণতা ও লেখনী-স্বাচ্ছন্দ্য—এই তিনটি গুণ তাঁহার উপযুক্ত মাত্রায় ছিল, তাঁহার কাব্যগুলি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।"[১০] এই কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের মত যুগপ্রতিভূ কবিদিগের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা চিরকালই আপন শক্তি-মহিমায় স্বতন্ত্র, যুগসীমায় থাকিয়াও যুগোত্তীর্ণ, স্বকীয় পথে তাহার সার্থক প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যুগবিশেষের নিগূঢ়তম প্রবৃত্তি ও আন্তরধর্ম বুঝিয়া লইতে হইলে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট প্রতিভা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বল্প প্রতিভাবান কবিদিগের দিকে তাকাইতে হইবে, কেননা তাঁহাদের মধ্যেই যুগের সহজ স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। যেহেতু তাঁহারা যুগ-নাট্যের প্রধান নায়ক নন, পার্শ্বচরিত্র ; সেহেতু প্রায়ই পার্শ্বে বা নেপথ্যে থাকিয়া দর্শকের মতই যুগনাট্যলীলা উপভোগ ও বর্ণনা করিবার সুযোগ ইঁহাদের বেশী। "It is commonly in the work of lesser and forgotten writers that the spirit of an age has its fullest expression."[১১] তাই নবজাগ্রত বাঙ্গালীর সংশয়-বিশ্বাস ও প্রাণাবেগের পরিচয় কেবলমাত্র মধু-বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইতেই পাইলে চলিবে না, হেম-নবীনের স্থূল কাব্যদেহের মধ্যেও তাহার অবিন্যস্ত অথচ যথাযথ প্রকাশ লক্ষ্য করিতে হইবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত রসবিচারের আলোকে নবীনচন্দ্র-প্রমুখ কবির ত্রুটি ও অপূর্ণতাসমূহ একালের চোখে পীড়াদায়ক হইতে পারে, তবু যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের কাব্যসাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিমাপ করা অবশ্য প্রয়োজন।

ইংরেজ-কবি বায়রণের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের তুলনা স্বাভাবিক হইলেও সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত নহে, কিন্তু কবি-খ্যাতির উত্থান-পতন বিষয়ে উভয়ের ভাগ্য যেন অনুরূপ। নবীনচন্দ্রের মত স্বদেশে বায়রণেরও খ্যাতি যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল।[১২] Sir A. Quiller Couch যদিও 'his carelessness as an artist'-ই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তিনিই আবার বায়রণের কবিত্ব-মূল্যায়নে কেবলমাত্র রস-রূপের বিচারকেই মুখ্য

করিয়া তোষার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"The countrymen of Shakespeare have too often, in despite of his example, surrendered themselves to the slavery of 'form', of poetic 'laws' and 'rules'. That is an error on the right side; and yet it turns into a serious error when it blinds our vision to the fine power in the man, or deadens our sense of the daemonic brain out of which verses teemed like armed men and stanzas in troops, a revolutionary host."[১৩]

নবীনচন্দ্রের কাব্য-মূল্যায়নেও উক্ত মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শক্তির প্রকাশও কি বায়রণের অনুরূপ নহে? পূর্বেই বলিয়াছি—রবিরশ্মির ঔজ্জ্বল্যে মধু এবং বঙ্কিম ব্যতীত বিগত শতাব্দীর প্রায় সকল কবির সৃষ্টিই নিষ্প্রভ মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের আন্তরিক সাধনা ও সীমায়িত সিদ্ধির কোন স্বতন্ত্র মহিমাই স্বীকার্য নয়—সাহিত্যবিচারে এই অনুদারতাও প্রশংসার্হ নহে। নবীনচন্দ্রও অসতর্ক শিল্পী ছিলেন, তাঁহার ভাবকল্পনা ও রূপসৌন্দর্যের মধ্যেও হয়ত সর্বথা সামঞ্জস্য ছিল না; তবু তাঁহার ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র 'Form', 'Poetic laws' ও 'Rules'এর তৌলদণ্ড ধরিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা ভুল করিব। তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট উক্ত 'power in the man' এবং 'doemonic brain'কেও মর্যাদা দিতে হইবে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—"নবীনচন্দ্র হইতে কাব্যের ক্ষেত্রে অধিক সংযম, ভাষা ও ছন্দের অধিক নৈপুণ্য আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি,—কিন্তু সেই স্পন্দনময় উন্মাদ প্রাণদেবতার জীবন্ত বিগ্রহ নবীনচন্দ্র আজও আমাদের বরেণ্য।"[১৪] সেই 'বরেণ্য' নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতির পুনর্মূল্যায়ন (revaluation) এবং তাঁহার ভিত্তিচ্যুত কবিখ্যাতির পুনর্বাসন (rehabilitation) আজ একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিলুপ্ত-গৌরব বায়রণকেও এখন আবার ইংরেজী সাহিত্যে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস চলিয়াছে।—We are beginning to-day to get the right perspective of this strange compound of greatness and littleness. He was undoubtedly a powerful force in English letters."[১৫] নবীনচন্দ্রও নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে powerful force, তাই তাঁহার মধ্যে strange compound

of greatness and littlenessকেও আজ যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের এই পুনর্মূল্যায়ন-প্রয়াসে আমাদের মানদণ্ড কি হওয়া উচিত—তাহা সম্ভবতঃ এখন আমরা পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতামতের আলোকে স্থির করিয়া লইতে পারি। 'রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে', রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ যেমন যথাসম্ভব মানিতে হইবে, তেমনি একথাও বুঝিতে হইবে যে, রসবিচার-পদ্ধতির আত্যন্তিক প্রয়োগে সেকালের অনেক রচনাই হয়ত বা টিকিবে না, তবু তাহাদের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতির মূল্যনিরূপণ এবং রসাস্বাদনে যে রচনাত্মক (constructive) পদ্ধতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন মনে হয়। তাঁহার মতে—"পরিকল্পনার ত্রুটি ও গঠন-পারিপাট্যের অভাব আখ্যানকাব্যের অপকর্ষের হেতু তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাই কি কাব্যবিচারে একমাত্র নিয়ামক নীতি? নাটকের নিবিড় ঐক্য ও ঘটনাবিন্যাস-কুশলতার আদর্শ আখ্যানকাব্য ও উপন্যাসে ঠিক প্রযোজ্য নহে। ইংরেজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিসমূহ প্রায় কেহই এই জাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।... সমালোচক ইহাদের আঙ্গিক শিথিলতার কথা দুই একটি মন্তব্যেই শেষ করিয়া ইহাদের সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আবেদনের স্বরূপটির উপরেই তাঁহার দৃষ্টি ন্যস্ত করেন। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও আমাদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বনই বিধেয়। ...আলোচনার ধারা উপরি-উক্ত প্রণালীতে প্রবাহিত হইলে কবির কাব্যোৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।"[১৬]

এই পদ্ধতির সমালোচনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। কেননা "যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা।"[১৭] ইহারই প্রসাদে সমালোচকের রসগ্রাহী চিত্ত এবং কবির সৃষ্টি-তন্ময় চিত্ত অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ভরিয়া উঠে।" আবার "To reach the best in literature, as in life, sympathy is a preliminary condition."[১৮] সুতরাং এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির স্বচ্ছ আলোকে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—নবীনচন্দ্রে মধুসূদনের উত্তরাধিকার কতটুকু বর্তিয়াছে, যুগাদর্শের কবিরূপে যুগের আকাঙ্ক্ষা-বেদনা-ব্যাকুলতাকে তিনি কতটুকু ভাষা দিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার

স্বদেশ-চিন্তা ও মানবমুখিতার বৈশিষ্ট্য কি, তাঁহার গীতি-প্রাণতার স্বরূপ কি এবং তাহা সামান্যভাবেও রবীন্দ্রযুগকে আভাসিত করিতে পারিয়াছিল কিনা, প্রকৃতির বিশাল গভীর রূপরহস্য তাঁহাকে কি ভাবে অনুপ্রাণিত-করিয়াছিল, অধ্যাত্ম জীবন-দর্শন তাঁহার কাব্যে কতটুকু প্রতিফলিত হইয়া-ছিল, তাঁহার কাহিনীগ্রহণ চরিত্রচিত্রণ ও কাব্যের গঠনে কোন্ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, সর্বোপরি তাঁহার সাফল্য ও ব্যর্থতার নিগূঢ় রহস্য কি! এই উদ্দেশ্যে নবীনচন্দ্রের রচনাবলী আর একবার গভীর আগ্রহে পাঠ করিতে হইবে, শ্রদ্ধায় উৎকর্ণ হইয়া কবি-হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে হইবে।

বিভিন্ন অধ্যায়-নিবদ্ধ এই আলোচনা শ্রদ্ধা এবং বিচারের সমন্বয়ে নবীন-চন্দ্রের কবি-কৃতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়াস। নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তি ও কাব্যসমূহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাঁহারাই উল্লেখযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্বসূরীরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মতামত যথাস্থানে সাধ্যমত বিচারের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সূত্র নির্দেশ

১। ‘পুরানো বই’—পরিশেষ, রবীন্দ্রনাথ।

২। বঙ্গবাণী, ১ম খণ্ড—শশাঙ্কমোহন সেন, ১২২-২৩ পৃঃ।

৩। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার, ৭১ পৃঃ।

৪। ‘কবির মন্তব্য’—কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ, নূতন সং।

৫। চিত্রচরিত্র—প্রমথনাথ বিশী, ৯৬ পৃঃ।

৬। প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কাব্যবিতানের’ ভূমিকা।

৭। ‘সাহিত্যরূপ’—সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩শ সংখ্যা, ৪৯৪।

৮। ‘নবীনচন্দ্র সেন’—আধুনিক বাংলা কাব্য, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ১৯০-২৩৭ পৃঃ।

৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মজুমদার, ৭ পৃঃ।

১০। ২১শে মে, ১৯৪৭, তারিখে লিখিত পত্র।

১১। English Literature—G. H. Mair, P. 63.

১২। ‘At home Byron's glory has declined and the reasons are intricate.’—A Survey of English Literature, Vol. II, by Oliver Elton, P. 181.

১৩। Byron—Poetry & Prose: Introduction, by A. Q. Cuch, P. X-XI.

১৪। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৯-২০০ পৃঃ।

১৫। A History of English Literature—A. Compton Rickett, P. 335.

১৬। তারাপদ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘আধুনিক বাংলা কাব্যের’ ভূমিকা, ১৫-১৬ পৃঃ।

১৭। ‘কবির অভিভাষণ’, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩শ সংখ্যা, ৪৮৮ পৃঃ।

১৮। An Introduction to the Study of Literature—Hudson, P, 26.

জীবনায়ন

'কবিরে পাবেনা তাহার জীবন চরিতে''—রবীন্দ্রনাথের এই তাৎপর্যমণ্ডিত উক্তিটি মনে হয় অনেকটা সত্য। কাব্যসৃষ্টিতেই তো কবির মর্মজীবন লীলাময় ভঙ্গীতে প্রকাশিত, তাহার বাহিরে কবির দেহধর্মপালনের ইতিবৃত্ত জানিয়া লাভ কি? কবিরা ব্যক্তিগতভাবে কোন্ জীবনের জন্য কৌতূহলী? কবিজীবন নিশ্চয়ই। তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনী লিখেন নাই, লিখিয়াছেন জীবনস্মৃতি, অর্থাৎ উন্মেষমুখী কবিজীবনের আলোছায়াপথে স্মৃতিচারণের উপভোগ-চিত্র। তৎসত্ত্বেও কোন কবির বাস্তবজীবনযাপন-কাহিনী জানা যে কবিকে বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজন, তাহা কবি Auden সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—"The study of a poet's biography or psychology or social status cannot explain why he writes well, but it can help us to understand why his poetry is of a particular kind, why he succeeds at one thing and fails at another."[২] এইকারণে আমরা নবীনচন্দ্রের কাব্যমূল্যায়নের পূর্বে জীবনায়ন আরম্ভ করিলাম।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-অবদান সংখ্যায় আয়তনে গুরুত্বে স্বল্প নহে, এবং উহার মধ্য হইতেই তাঁহার কবিমর্মের প্রকৃতি নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য নহে। বিশেষতঃ কাব্যে নবীনচন্দ্রের বক্তব্য এত স্পষ্ট ও সুউচ্চারিত ছিল যে তাহা জানিবার জন্য হয়ত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের নিকট নিজ কর্মী-জীবনের মূল্য এবং মায়া কিছু কম নহে; তাই তিনি নিজ জীবনের কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, শুধু সবিস্তারে নয়, সগৌরবে। উহা জীবন-"স্মৃতি" নহে, আমার 'জীবন'; প্রথমটির গুরুত্ব স্মৃতির উপর, দ্বিতীয়টির জীবনের উপর। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে' কবি-জীবনের কথা যতটুকু, তাহার চাইতে অনেক বেশী কর্মী-জীবনের ব্যাখ্যান। সুতরাং 'কবিরে পাবেনা তাহার জীবনচরিতে', নবীনচন্দ্রের কবি-স্বরূপের পরিচয় তাহাতে স্বল্প। "উহা জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র, জীবনগঠনের বা দর্শনের নহে।"[৩] উহার মুখবন্ধে নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—"আমার

জীবন তিনটি মহাঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব।" তবে কি কাব্য-সৃষ্টি তাঁহার নিকট মহাঘটনা নহে? হয়ত বা সেই মহাঘটনার কবি-নায়ককে আমরা কাব্য হইতেই খুঁজিয়া বাহির করিব—ইহাই নবীনচন্দ্রের প্রত্যাশা ছিল। তাঁহার আত্মজীবনী রচনার উদ্দেশ্য—"সমাজের ও সংসারের যে সকল বিশ্বাসঘাতক বালুকাচর ও গহ্বর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনেক শিক্ষা, অনেক সতর্কতা লাভ করিতে পারিব; এবং মেঘাবৃত প্রাবৃট-চন্দ্রমার ন্যায় কদাচিৎ যে সুখের শান্তির ও স্নেহের মুখ দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব।"[৪] সত্যই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ একটি জীবন নবীনচন্দ্র সুখে দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কাব্যপাঠের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

নবীনচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত কেহ লিখিয়া যান নাই। তাহার কারণও এই মনে হয় যে, তিনি নিজেই নিজ জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত তথ্যই পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, অন্যের জন্য কিছু বাকী রাখেন নাই। তাই তাঁহার 'আমার জীবন' এবং কাব্যসমূহ মিলাইয়া আমাদের কবি-পরিচয় সম্পূর্ণ করিতে হইবে। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আত্মজীবনীতে ব্যক্ত নানা মন্তব্য এবং তথ্যও আমরা কাব্যবিশ্লেষণকালে প্রয়োজনমত গ্রহণ করিব।

১৮৪৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী নবীনচন্দ্রের জন্ম হয়। জীবনীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় জন্মস্থান, কুলশীল প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের মুখেই শোনা যাক্। "১৭৬৮ শকাব্দায়...... 'বহুতর শুভযোগে' আমার 'শুভজন্ম'। পিতা স্বর্গীয় গোপীমোহন রায়। মাতা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী। চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্তরায় বংশে আমার জন্ম। আমি জাতিতে বৈদ্য।... ..কুলজীর শীর্ষস্থানীয় নাম বৌদ্ধসেন, তাঁহার সপ্তম স্থানে রাজারাম রায়। সম্ভবতঃ ইনিই চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।[৫] ইনি ঢাকার নবাবের একজন কার্যকারক ছিলেন। ইঁহার কার্যদক্ষতার পারিতোষিক-স্বরূপ নবাব ইঁহাকে 'রায়' উপাধি দেন......রায় সম্মানসূচক উপাধি বলিয়া আমরা কেহ কেহ নিজ পক্ষে তাহা ব্যবহার না করিয়া আপনাদের জাতীয় উপাধি 'সেন' ব্যবহার করিতেছি।"[৬]

পাঁচ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। কিছুকাল গ্রামে গুরু-মহাশয়ের কাছে, পরে আট বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম সহরে পিতার তত্ত্বাবধানে

স্কুলে তাঁহার অধ্যয়ন সুরু হয়। তাঁহার পিতা তখন চট্টগ্রামের জজ্ আদালতের পেস্কার, পরে আইন পড়িয়া তিনি মুন্সেফ ও উকিল হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের শৈশবপ্রকৃতি তাঁহার একটি উক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে। "আমার চরিত্র এত অশান্ত যে, বিদ্যালয়ে সর্বসম্মতিক্রমে আমি wicked the great—'দুষ্টশিরোমণি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"[৭] তাঁহার সম-প্রকৃতির কবি বায়রণও ছিলেন তাই। "At Harrow, he was irregular and turbulent, but of generous character: he showed no aptitude for verbal scholarship."[৮] কিন্তু মেধাবী অথচ অমনোযোগী ছাত্র নবীনচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। আবার অন্যদিকে এই সময়েই দূর আত্মীয়া-কন্যা বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করিয়া কিশোর নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে যে প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার আবেগ ও ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। 'অবকাশরঞ্জিনীর' প্রেমের কবিতাসমূহে এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্টআর্টস ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে কবিতা রচনাসূত্রে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্যারীচরণ সরকারের স্নেহলাভে সমর্থ হন। এফ-এ পরীক্ষার একমাস পূর্বে উনিশ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীকামিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীতে এফ-এ পাশ করেন। বৃত্তি না পাওয়ায় তাঁহাকে জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হইতে হয় এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এ পাশ করেন। তাহার কিছু পূর্ব হইতেই নবীনচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে দুর্ভাগ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসে। বি-এ পরীক্ষার মাত্র তিন মাস পূর্বে (১৮৬৭) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মুক্তহস্ততা ও দানশীলতার দরুণ প্রভূত উপার্জন করিয়াও তাঁহার পিতা শেষ পর্যন্ত অধ্যয়নরত পুত্রের জন্য প্রচুর ঋণ ও অসহায় বিরাট পরিবার রাখিয়া যান। সেই সঙ্গে পিতৃব্য ও অন্যান্য জ্ঞাতি-আত্মীয়ের নির্মম ষড়যন্ত্র নবীনচন্দ্রকে আরও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সঙ্কটকালে নবীনচন্দ্রকে প্রভূত সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া রক্ষা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—অসহায় বাঙ্গালী কবিদের সঙ্কটে মধুসূদন। ছাত্র পড়াইয়া এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থসাহায্যে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পোষ্যবর্গের এবং কলিকাতায়

নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। সাময়িকভাবে এক মাস হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর গভীর আত্মপ্রত্যয়ী নবীনচন্দ্র সাহস সহকারে লেঃ গভর্ণরের সেক্রেটারী ষ্টাঙ্গফিল্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পারিবারিক দুঃখ বর্ণনায় তাঁহার চিত্ত দ্রব করিলেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার মনোনয়ন লাভে সক্ষম হইলেন। যথাকালে সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণও হইলেন।

১৭ই জুলাই ১৮৬৮ হইতে ১লা জুলাই ১৯০৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে দক্ষতাসহকারে শাসনকার্য নির্বাহ করেন। যেমন বেকার জীবনে, তেমনি কর্মজীবনেও নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গুণসমূহ সদা বিদ্যমান ছিল—তাহা তাঁহার নির্ভীকতা, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা কালে নানা স্থানে বহু জনহিতকর কর্মে ও সংস্কার কর্মে যেমন তিনি অগ্রণী ছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার দৃঢ়তা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য বহু নিগ্রহও ভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণেই নবীনচন্দ্র আত্মধিকার সহকারে বলিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনের অন্যতম মহাঘটনা 'দাসত্ব'। শেষজীবনে রচিত একটি কবিতায় নবীনচন্দ্র এই দাসত্ব-মুক্তি সম্পর্কে রামপ্রসাদী ভঙ্গিতে আন্তরিক কথাই বলিয়াছিলেন—

মন বল আর কি ভাবনা ?
তোর ফুরাল সাহেব ভজনা।
চাকরি ছেড়ে যেতে কি মন
তোর এত মন বেদনা ?"

'আমার জীবনের' প্রথমভাগ ব্যতীত অপর চারি ভাগই একরূপ এই দাস-জীবনের সুবিস্তৃত ইতিহাস, এবং সেই জীবনে আবদ্ধ এক মুক্তপ্রাণ পুরুষের কাতরোক্তি,—উহাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত অভিমান এবং আত্মাদরও যেন সেই বেদনাকে সহনীয় করিবার প্রয়াস মাত্র। পরিশিষ্টে (খ) নবীনচন্দ্রের চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান দেওয়া হইল।

নবীনচন্দ্র সুগৌর কান্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ও আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ে কমনীয়তা অপেক্ষা পৌরুষ ও আভিজাত্যই অধিক ব্যঞ্জিত হইত। সেইযুগে বিলাতের Literature পত্রিকায় বাঙ্গালী লেখকদের যে আকৃতির বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নবীনচন্দ্র সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে—

"He has the slim, oval face, the bright dark eyes, gracious and proudly submissive manners of an Italian or Spaniard of good family."[১০] কবিতা ও সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ ছিল বংশগত। বংশীবাদনেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি যেমন গভীর ও অকৃত্রিম ছিল, তেমনি জন্মভূমি চট্টগ্রামের প্রতি আকর্ষণও ছিল প্রগাঢ়। ব্যক্তিগত জীবনে নবীনচন্দ্র আত্মাদরপরায়ণ অভিমানী ব্যক্তি হইলেও পরোপকারী ও করুণাকাতর ছিলেন। তাঁহার পত্নীপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্য ছিল গভীর। আবার পরিহাসচতুর, আমোদপ্রিয়, সদালাপী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্বদেশবৎসল ছিলেন বলিয়া নবীনচন্দ্র সে কালের প্রায় সকল মনীষী ব্যক্তির নিকট সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিতে শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরুষদের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল, 'আমার জীবনে' তাহার সুনিপুণ বর্ণনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্পর্ক যে কত গভীর ও হৃদ্য ছিল, তাহা নবীনচন্দ্রের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী[১১] হইতে জানা যায়। বন্ধুবৎসল নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে বন্ধুদের ধারণাও ছিল অত্যন্ত উন্নত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন—"তাঁহার হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা ছিলনা, দ্বেষ ছিলনা, অভিমান ছিলনা,······এমন সরল উদারভাবে বন্ধুকে বুঝি আর কোন কবি ভালবাসেন নাই।"[১২] গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন—"সংসারে মুক্ত পুরুষ, প্রেমই তাঁহার জীবন। হিংসাদ্বেষ, ঘৃণা উপেক্ষা,—তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে স্থান পাইতনা।"[১৩] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন—"নবীনচন্দ্র সহৃদয় কবি, অনুরক্ত বন্ধু, কৃতজ্ঞ; ভক্ত, বিহ্বল ভাবুক ছিলেন।"[১৪]

নবীনচন্দ্রের হৃদয় অত্যন্ত স্নেহকাতর ও মায়াশীল ছিল বলিয়াই বুঝি যে কোন শোকে মুহ্যমান না হইয়া পারিত না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রথম পুত্রের (নীরেন্দ্র) বিয়োগ-বেদনায় তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি 'আমার জীবনের' নানা অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। আবার 'অবকাশরঞ্জিনীর' কতিপয় গীতিকবিতায় যেমন তাহা সুব্যক্ত, তেমনি আখ্যায়িকা-কাব্য 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' এবং জীবনীকাব্য 'অমৃতাভে'ও প্রসঙ্গক্রমে এই বেদনাদীর্ণ ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ লক্ষণীয়। কাব্যে

নবীনচন্দ্রের এই আত্ম-উদ্‌ঘাটন তাঁহার অত্যাগসহন কোমল প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

দশ-এগার বৎসর বয়স হইতে কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়া প্রায় ষাট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত সরকারী শাসনকর্মের নিত্যব্যস্ততা এবং বিচিত্র বাধার মধ্যেও নবীনচন্দ্র সারস্বত-সাধনা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার রচনা সংখ্যায় ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে যে উল্লেখযোগ্য, পরিশিষ্টে (ক) প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমরা এই গ্রন্থে তাঁহার প্রত্যেকটি রচনার বিশ্লেষণাত্মক বিস্তৃত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

সাহিত্যের পোষকতায়ও নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নহে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যথার্থ প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি উহার বিশিষ্ট সদস্য হন এবং ১৩০১—১৩০৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত উহার সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই সময়ে পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া উহাকে বিতর্ক সভা হইতে কার্য-করী সভায় পরিণত করিতে তিনি প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছিলেন।[১৫] মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নবীনচন্দ্রের সুগভীর অনুরাগ আরও সুন্দর-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার তীর্থঙ্কর-রূপে বাঙ্গালীর 'সাহিত্য তীর্থদর্শন' অভিলাষে। রাণাঘাটে কর্মরত অবস্থায় তিনি ফুলিয়া, কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহরে যথাক্রমে কৃত্তিবাস, ঈশ্বরগুপ্ত ও রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা প্রদক্ষিণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সম্ভবক্ষেত্রে তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার প্রয়াসও পাইয়াছিলেন। বর্তমানে নানাস্থানে বঙ্গের প্রাচীন কীর্তি-মান কবিদের স্মৃতিরক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা যদিও হইয়াছে, তথাপি অর্ধ শতাব্দী পূর্বে স্মৃতিরক্ষার যে জাতীয় রীতিসম্মত প্রস্তাব নবীনচন্দ্র গভীর আন্তরিকতার সহিত উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আজিও শ্রদ্ধার সহিত বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি এ সকল সভা ও বক্তৃতাকারীরা ইহাদের ও বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের জন্মস্থানগুলি রক্ষা করিয়া তথায় বৎসর বৎসর সাহিত্যসেবীরা সমবেত হইয়া একটি দেবপূজার উৎসবের মত উৎসব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়, এবং সম্মিলনের কার্যও হয়। বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও উন্নতি সাধিত হয়।"[১৬]

পুত্র নির্মলচন্দ্রকে[১৭] শোকসাগরে ভাসাইয়া ২৩শে জানুয়ারী, ১৯০৯ (১০ মাঘ, ১৩১৫) তারিখে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহারই সমপ্রকৃতির কবি বায়রণের শেষ উক্তি—'It is time for me to sleep'[১৮] হইতে নবীনচন্দ্রের অন্তিম উক্তি—'আজ বিজয়া',[১৯] অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটিতে ক্লান্তি, দ্বিতীয়টিতে তৃপ্তির ভাব; উহা নিদ্রা নহে, বিদায় নহে, নির্বাণ নহে—উহা 'বিজয়া'। উহা বিসর্জনের, সর্বসমর্পণের দিন; আবার সাধনাসিদ্ধ বিজয়ীপুরুষের অমৃতলোকে বিজয়-যাত্রার দিন। স্বাধীনচিত্ত কবির মহাযাত্রা ওই মহাবিজয়েরই সূচক। শশাঙ্কমোহন সেন সুন্দর বলিয়াছেন—"মনীষী কবি গেটের শেষ উক্তি 'আলোক আরো আলোক!' সৌন্দর্যের উপাসক কবি কীট্‌সের শেষ উক্তি 'সুন্দর, অতি সুন্দর!' বীরধর্মী ভাবুককবি নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—'আজ বিজয়া।' ইঁহাদের প্রত্যেকের শেষ উক্তিতে চিরজীবনের অনুসৃত হৃদয়-ধর্ম প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"[২০] শেষ জীবনে রচিত 'অন্তিম আশা' কবিতায়ও নবীনচন্দ্রের চরিত্রের সেই পৌরুষধর্ম ও শান্তি ব্যাকুলতা যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে—

> না চাহি সমাধি উচ্চ মর্মর গৌরব
> প্রতিকৃতি প্রতিমূর্তি নগর-প্রাসাদে,
> কিংবা রাজপথ পার্শ্বে—বায়স বিভব।
> দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠে গোরাচাঁদ কাঁধে।
> ……নরহন্তা, পরস্ব-হারক
> দুর্বল দলনকারী, পাদুকাবাহক
> সবলের, দেশদ্রোহী প্রবঞ্চক
> সারমেয়গণ তরে বিশ্বাসঘাতক।
> মা! তোর সঙ্কীর্ণ কুঞ্জে যথা পিকগণ
> ভারতের গাইতেছে অমৃত ধারায়
> সুশীতল, বহিতেছে শান্তি সমীরণ,
> তাহার শ্যামল তৃণে নিভৃত কোণায়
> দরিদ্র নবীন কবি ক্ষুদ্র স্থান চায়।[২১]

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র জন্মভূমি চট্টগ্রাম তাঁহার জন্য বাসনানুরূপ চিরবিশ্রাম-নীড় রচনা করিয়া রাখিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধুর তিরোধানে সহৃদয় নবীনচন্দ্র শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন; নবীনচন্দ্রের বিয়োগে কোন কবি অনুরূপ গাথা রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমরা নিম্নে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিলাম :—

(ক) নবীনচন্দ্র—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; নব্যভারত, মাঘ, ১৩১৫

(খ) কবিবর নবীনচন্দ্র—কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত ; ঐ

(গ) স্মরণে—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ; বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১৩১৫

(ঘ) মহাপ্রস্থান—মৃণীন্দ্রনাথ ঘোষ ; সাহিত্য, চৈত্র, ১৩১৫

সূত্র নির্দেশ

১। উৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ, ২১ সংখ্যক কবিতা।

২। Introduction on Byron—by W. H. Auden in 'Eight Poets'.

৩। বঙ্গবাণী, ২য় খণ্ড—শশাঙ্কমোহন সেন, ৪৪ পৃঃ।

৪। আমার জীবন, ১ম ভাগ,—২ পৃঃ।

৫। 'খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাঢ়ভঙ্গের সময় শ্রীযুক্ত রায় নামক জনৈক ব্যক্তি হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোন পল্লী হইতে সুদূর চট্টগ্রামে যাইয়া বসবাস করেন।' —শ্রীকমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রভাস' গ্রন্থে শ্রীসুধীরকুমার মিত্র লিখিত কবি-জীবনী দ্রঃ।

৬। আমার জীবন, ১ম ভাগ- ৩-৪ পৃঃ।

৭। ঐ, —২২ পৃঃ।

৮। The Poetical Works of Lord Byron—Introduction by W. M. Rossetti.

৯। প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী, ৪র্থ খণ্ড—ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত, ৬ পৃঃ।

১০। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১১। সুবোধরঞ্জন রায় কর্তৃক সংগৃহীত এবং বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩, সংখ্যায় প্রকাশিত।

১২। সাহিত্য, মাঘ—১৩১৫।

১৩। ঐ

১৪। সাহিত্য, বৈশাখ—১৩১৬।

১৫। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ৭১-৯৮ পৃঃ।

১৬। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ, ৪৫৫-৫৬ পৃঃ।

১৭। স্বর্গত নির্মলচন্দ্র সেন রেঙ্গুন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন।

১৮। Byron—Poetry & Prose: Introduction by A. Quiller-couch, P. XI.

১৯। বঙ্গবাণী, ২য় খণ্ড—শশাঙ্কমোহন সেন, ৩২ পৃঃ।

২০। ঐ, ৩৫ পৃঃ।

২১। প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ৮ পৃঃ।

দেশ, কাল ও মন

সাহিত্যের দর্পণে দেশ ও কালের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, আবার দেশে ও কালে সেই সাহিত্যের ভাবধারা অলক্ষ্যে কাজ করিয়া যায়—ইহাই নিয়ম। কোন সাহিত্যিক একেবারে দেশকাল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন না। দেশ তাঁহাকে গড়ে শুধু শস্য দিয়া নয়,—ঐতিহ্য, ভাবকল্পনা ও রসদৃষ্টি দিয়া; তিনিও দেশকে গড়িয়া তোলেন ধ্যান, অনুভূতি ও সৃষ্টিসম্পদ দিয়া। একথা আরও সত্য তাঁহাদের ক্ষেত্রে—যাঁহাদের সাহিত্য-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ Objective বা বস্তুনির্ভর। আমরা মহাকাব্য, বর্ণনাত্মক আখ্যায়িকাকাব্য, নাটক, গল্প-উপন্যাস রচয়িতাদের কথাই বলিতেছি। Subjective বা আত্মনির্ভর মন্ময় কবিতা-রচয়িতারা বিশেষ দেশে-কালে বর্তমান থাকিলেও অনেক সময় [illegible]। ভাবকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন। তাহাতে প্রায় সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের উপলব্ধ সত্য, অনুভূত হর্ষবেদনা গুঞ্জিত হইয়া উঠে।

বাঙ্গালা দেশে মধ্যযুগে, অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের দিকে রাজনৈতিক সামাজিক আলোড়ন কম হয় নাই; দেশের ভাগ্য তাহাতে বিচলিত হইয়াছে, ধ্যান ধারণাও অবিচ্ছিন্ন থাকে নাই। তবু সে যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীতে তাহার স্পর্শ কোথায়? চিরন্তন বিরহ-মিলনের সেই তো এক অপূর্ব সুর—"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেলি"। কিন্তু সেই ষোড়শ শতাব্দীতেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেশকালের ছবি সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে; অনিশ্চিত শাসন, বিচলিত আর্থিক ভারসাম্য, দৃঢ়মূল সামাজিক সংস্কার, আলো-অন্ধকারময় গৃহজীবন—সমস্তই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থাও অনুরূপ। জীর্ণ শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নূতন শাসনের ভিত্তি নেপথ্যে রচিত হইতেছে, দেশের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান এই দ্বিধা-দুর্বলতায় অবনমিত,—ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই অবস্থার ছবি ধরা পড়িয়াছে। আবার বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল কী এক মহাজাগরণের, আত্মানুসন্ধানের, আত্মপ্রকাশের যুগ; কিন্তু সেই কলমুখরতার মধ্যেও তো আত্মমগ্ন বিহারীলালকে বলিতে শুনি—

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে
গান গান সহাস আসনে!'

আবার অন্যদিকে এই উনবিংশ শতাব্দীর সর্বব্যাপী জাগরণের ভিত্তি-ভূমি বহুপূর্ব হইতে রচনা করিতেছিলেন বিরাট শক্তিধর পুরুষ রামমোহন। গদ্যে যুক্তিপন্থায় তাঁহাকে অনুসরণ করেন প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র; পদ্যে সমুচ্চ ভাবকল্পনায় তাঁহাকে ব্যক্ত করেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—

কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক। (কুরুক্ষেত্র—৯ম সর্গ)

একথা তাঁহাদের তিনজনের পক্ষে খুবই সার্থক। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র কালের সাক্ষীমাত্র, কালের দ্বারা অভিভূত হইয়া সেই কালকেই তাঁহারা চিত্রিত করিয়াছেন, উহাকে ভাঙিতে বা গড়িতে পারেন নাই, ভবিষ্যৎ 'কাল' বা 'ভাব' তাঁহাদের কাব্যে আভাসিত হয় নাই। সেই হিসাবে মধু-হেম-নবীন শুধু কালের সাক্ষী নহেন, কালের শিক্ষকও। তাঁহারা কালের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবৃত্তিকে সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, দেশের সঙ্গে বহির্দেশকে বুঝিতে চাহিয়াছেন, চিরন্তন জীবনাদর্শের সঙ্গে নূতন কালের ভাবাদর্শকে মিলাইবার সাধনা করিয়াছেন। যুগধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় তাঁহাদের মন বিচলিত হইয়াছে, সৃষ্টির আবেগে মাতিয়া উঠিয়াছে। দেশ-কালের এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নবীনচন্দ্রের মনোবিকাশ ও আত্মস্ফূর্তির স্বরূপ লক্ষ্য করিব।

নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির শঙ্খধ্বনিতে উদ্বোধিত বাংলা সাহিত্যের এক প্রবলধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। সে ধারা মহাকাব্যের তথা মহাজীবনবোধের, সে ধারায় আত্মপ্রত্যয়ের উল্লাস ও সমষ্টি-মুক্তির প্রয়াস মিলিয়া গিয়াছিল। প্রতিভাদীপ্ত বাঙ্গালায় বিগত শতকের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। সাহিত্যে ধর্মে রাষ্ট্রগঠনে সমাজ-সংস্কারে জীবন-সাধনায় এই উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয়। ইহাকেই বাঙ্গালার রেনেসাঁস্ বা নবজাগরণের যুগ বলা হয়। এই নবজাগরণের কারণ, লক্ষণ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ পূর্বে

একাধিক সুধী ব্যক্তি করিয়াছেন।[৫] সুতরাং অযথা পুনরুক্তি না করিয়া আমরা আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহার কতিপয় প্রধান ভাব-তরঙ্গের কথামাত্র এখানে বলিব, নবীনচন্দ্রের চিত্ততটে যাহার আঘাত লাগিয়াছিল গভীরভাবে। রেনেসাঁসের সূচনা ইটালীতে, তৎপর ইউরোপের অন্যান্য দেশে; তাই তাহার মূল লক্ষণ ও প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সুন্দর নির্ণয় করিয়াছেন—"The word Renaissance signifies the rebirth of the freedom-loving, adventurous thought of men, which during the Middle Ages had been fettered and imprisoned."[৬] রেনেসাঁসের প্রভাবও সামান্য নহে।—"The Renaissance affected man in all his ideas and relations of life; it altered his status in family and in society, that it revolutionised his views of the state."[৭] এই মুক্তি-ব্যাকুলতা, গভীর জীবন-ভাবনা এবং সমাজ-চেতনায় বৈপ্লবিক রূপান্তর আমাদের নবজাগরণেরও সুস্পষ্ট লক্ষণ। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই তাহা জয়ের উল্লাস ও প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, এমন নহে; পরাজয় এবং ব্যর্থতার গ্লানিও সেখানে ছিল সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, আমাদের এই জাগরণ বহুলভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সঞ্জাত। প্রবল প্রাণশক্তি ও স্বীকরণ-ক্ষমতা জাতির চিত্তে ছিল বলিয়াই "বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র মদিরাও বাঙ্গালীর মনের পক্ষে রসায়নের কাজ করিয়াছিল। সংস্কারের মোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মদমনের শাস্ত্রবিধি ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের পৌরুষ-পাঞ্চজন্য, তাহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল; বাহিরে যাহার সহিত সন্ধি করিতে না পারিয়া সে একটি ঘূর্ণীর মধ্যে ঘুরিতেছিল, অন্তরে সে তাহার সহিত আরও স্বাধীনভাবে বোঝাপড়া করিবার সাধনা করিয়াছিল।"[৮] এই দ্বন্দ্বসংকুল সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীর একত্র সমাবেশে ও দুশ্চর সাধনায় তখন জাতীয় মুক্তি অন্তরে ও বাহিরে ত্বরান্বিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই শতাব্দীর কোন ভাবুক বা কর্মীকেই যুগ-নিরপেক্ষরূপে গ্রহণ করা চলে না। নবীনচন্দ্র এবং তাঁহার সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকগণ ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ-সমন্বয় সূত্রে রচিত যে ভাবভিত্তিভূমিতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ববর্তী যুগে তাহা সম্ভব ছিল না। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর

ভাবদৈন্য, কল্পনাশৈথিল্য ও অলঙ্কার-সর্বস্বতার পরে উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পাইলাম বন্দী মানুষের বেদনা-বিষাদ ও মুক্তি-উল্লাস—কাব্যে নাটকে উপন্যাসে কখনো স্পষ্ট কখনো স্তিমিতভাবে সেই সুর বাজিয়া উঠিল। তাহার প্রকাশ হয়ত বা অনেকক্ষেত্রে স্থূল, শিল্পসমৃদ্ধি ও রস-দ্যুতিহীন, তবু তাহা নিরর্থক নহে। মনে রাখিতে হইবে—সেই যুগের কাব্যসাধনা হইল জীবননিষ্ঠা ধর্মচেতনা ও রাষ্ট্র-ভাবনারই অংশবিশেষ; বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের সাধনা ততটা নহে, যতটা মহত্তর জাতীয় ভাবের সাধনা।

এই গৌরবোজ্জ্বল যুগে বাঙ্গালী ভাবসাধক পাশ্চাত্ত্য মানবিক সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে, দেবমাহাত্ম্যে আর তাহার আগ্রহ নাই, লোকোত্তরপ্রতিভাসম্পন্ন নরদেহধারীর মধ্যে দেবচরিত্রের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া তাঁহাদের স্তুতি গাহিয়াই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে চাহিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শনেও তখন এই Humanism বা মানবতাবাদ এবং Positivism বা ধ্রুববাদের প্রভাব প্রবল। ধ্রুববাদীদের মতেও 'Humanity is our highest concept.'* আমাদের সাহিত্যে এবং জীবনেও এই মানবশ্রেষ্ঠতাবোধ এবং ধ্রুবযুক্তিনিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে রামমোহনের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন স্বকীয় মানবতা-বোধ এবং জাগ্রত বুদ্ধিতে ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলেন মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের মহিমা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি ও বিচারের ভিত্তিতে ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকেই মানব-আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিলেন। হেমচন্দ্র লোক-কল্যাণার্থে মুনি দধীচির আত্মোৎসর্গকে দেবতার অধিক মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন। আর সেই যুগ-সন্তান নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষে এক ধর্মরাজ্যস্থাপনকারী মহানায়ক নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ে নূতন করিয়া 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচনা করিলেন। আবার অন্যদিকে ধর্মসাধনারও ঊর্ধ্বে মানবসেবাকে স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমানুষের মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল। এই মানবমহিমা-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। 'খৃষ্ট' কাব্যে যীশুখৃষ্টের প্রেমময় জীবনলীলা, 'অমিতাভে' গৌতম বুদ্ধের পূত জীবনগাথা এবং তাহারও পরে শেষ কাব্য 'অমৃতাভে' শ্রীচৈতন্যদেবের

মধুর জীবনলীলা বিবৃত করিয়া নানা যুগের সর্বস্বীকৃত মহামানবদের জয়গানে সমগ্র জাতির হৃত মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কাব্যত্রয়ীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মুখেই নবীনচন্দ্র নিজ মানবমহিমা অনুধ্যানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্ধ জড় প্রকৃতিতে দেব-কল্পনা আর মানুষ মানিতে পারে না, যেহেতু সে এখন স্বে-মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত।

মানব! চেতনাযুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট, যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চালিত এই বিশ্ব-চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে তাহার।
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর! (রৈবতক—১ম সর্গ)

এখানে সূর্য জড় কিনা—এই প্রশ্ন অবান্তর, মানবমহিমার উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপই লক্ষণীয়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের 'নমিব মানব আমি চরণে কাহার!' এই প্রশ্নের উত্তরে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ—

মানব! মানব তুমি!—তুমিও মানব!
দেবতার উর্ধ্বে তবে মানবের স্থান। (কুরুক্ষেত্র—৯ম সর্গ)

ইহাতে মহাভারতের শান্তিপর্বের ভীষ্মবাক্য—'ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' কথাটির ছায়া থাকিলেও মনে হয়, উহা পূর্বোক্ত যুগ-প্রবুদ্ধ মানব-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যানেরই অংশবিশেষ। পূর্ণতার পথে অগ্রসরমান মানবজাতির উন্নতিতে সুদৃঢ় বিশ্বাসও এ যুগেরই ধর্ম। "There goes with this limitation of terrestrial affairs, a readiness to believe in progress as a universal law. This readiness characterised the nineteenth century.' এদেশে মনীষী কেশবচন্দ্রও ১৮৬২ সালে বলিয়াছিলেন—"This progress must be of the whole life; We must seek the development of the whole man,... Our progress must also be ceaseless and constant."[৮] নবীনচন্দ্রও মহর্ষি ব্যাসের মুখে উন্নতি-পথাভিসারী মানুষের কথাই বলিয়াছেন—

ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।

* * *

মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব,
নাহি হয় উন্নতির তিলার্ধ লাঘব।

* * *

চারিদিকে উন্নতির বিবর্ত্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া,
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া! (কুরুক্ষেত্র—১৬শ সর্গ)

নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রীতির মূলেও সেই যুগাদর্শ প্রবলভাবে কাজ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণের অন্যতম দান স্বদেশপ্রেম। সাহিত্যে এই দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার প্রকাশ ইউরোপেও খুব পুরাতন নহে। সমালোচকের মতে—"The 'love of liberty' in the fullest meaning which those words convey to us, is a sentiment of comparatively recent date......Not until the second half of the eighteenth century...did there arise that intense passion for liberty, in all its manifold aspects which has been the chief inspiration of the modern democratic movement."*

ব্রিটিশশাসন এবং ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে পরবশ্যতার বেদনা ও স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। বিজিত জাতির মনে বিদেশী সভ্যতার অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া যে প্রতিরোধরূপেই আসিয়া থাকে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য।[১১] ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ব্রিটিশ-পূর্ব সভ্যতা-সংঘাতের প্রকৃতি ছিল বৃটিশ-সভ্যতা-সংঘর্ষের প্রকৃতি হইতে ভিন্নতর। পূর্বেও ভারতবর্ষ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিজেতারাও সর্বতোভাবে ভারতেরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের জীবনের ভিত্তিভূমি অন্যত্র, সাধারণ ভারতীয় এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশাল ও দুরপনেয়। সেই যুগের সাময়িক পত্রিকার মন্তব্যেও ব্রিটিশ-শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এইভাবে—"The people and government here are two distinct bodies, their interest clash, their aims and scope differ and the

result is a continual struggle between them for prerogatives and privileges. The difference of their position, is indeed, so wide that our government cannot further the interest of the people without injuring its own interests directly or indirectly."[১১] নবীনচন্দ্রও 'পলাশির যুদ্ধে' (১৮৭৫) মুসলমান ও ইংরেজ শাসন-সভ্যতার অনুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্ধ-পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।

* * *

অন্যতরে—ইংরেজরা নব্যপরিচিত,
ইহাদের রীতিনীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি।

* * *

বাণিজ্যের তরে
আসিয়া ভারতে এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিকে। (১ম সর্গ)

উক্ত উধৃতির শেষাংশটুকুর অনুরূপ ইঙ্গিত নবীনচন্দ্রের প্রায় তের বৎসর পূর্বে রঙ্গলালও দিয়াছিলেন—

এরূপ বাণিজ্যছলে কত জাতি এসে,
করিলেক প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে।[১২]

কাজেই ইহা অত্যন্ত সত্য যে বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াই ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল।[১৩] পলাশির যুদ্ধের পর হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত যেমন ভারতের নানাস্থানে ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়াছিল, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণের বিচিত্র কর্ম ও ভাবান্দোলনে স্বদেশ-প্রেম একদিকে নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করিয়াছিল, অন্যদিকে সাহিত্যে সদ্য-অনুভূত পরাধীনতার বেদনাকে

ভাষা দিয়াছিল। নবীনচন্দ্রে যদিও সেই ভাষা উচ্চনাদী, অগ্নিবর্ষী; তবু তাঁহার পূর্ববর্তীরাও যে সেই সুর বেশ উচ্চগ্রামেই ধরিয়াছিলেন তাহা একটু বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্ত আবেগগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"যে মনুষ্য স্বদেশের স্বাধীনতাস্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহিত না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।......অপিচ মনুষ্য তাহাকেই বলি, যিনি জাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের জন্য প্রযত্ন করেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"[১৪] তখনও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রণোদিত জাতীয়তাবোধের জন্ম হয় নাই। তাঁহার অকপট স্বদেশ-মমতায় যে সাজাত্যাভিমান এবং স্বজনপ্রীতি পরিস্ফুট হইয়াছিল, আজ তাহা সংকীর্ণ বিবেচিত হইবে জানি; তবু সেই স্বদেশীয় ঐতিহ্যে বিপুল শ্রদ্ধা এবং জাতীয় দৈন্যে দুঃসহ বেদনাবোধই পরিশোধিত পরিমার্জিত হইয়া রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনায় প্রেরণাসঞ্চারক প্রাণদ শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়াছিল।

জাতীয়তার উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্বে আমাদের ইংরেজ-বিমুখিতাকে 'জাতিবৈর' আখ্যা দিয়াছিলেন, এবং উহা যে পাশ্চাত্ত্য Nationalism এর মত অন্যের প্রতি বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহাও বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহা নবজাগ্রত জাতির অভ্যুন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেননা—"যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক-কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি।"[১৫] অথচ জাতিবৈর বা স্বদেশপ্রীতি হইতে লোকপ্রীতি যে শ্রেয়ঃ, এই সুস্থ চেতনাও বঙ্কিমের ছিল। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"আজিকালি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি।...... ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।...দেশপ্রীতি ও সর্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।"[১৬] সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে জাতিবৈর উদার দেশাত্মবোধেরই পরিপোষক। মনে রাখিতে হইবে—এই দেশাত্মবোধই ঈশ্বর গুপ্ত হইতে বিভিন্ন কবির ভাবনান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে বিশ্ববোধে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন—"আশ্চর্যের বিষয় এই, যে স্বদেশপ্রেম, অধীনতা ও দেশাচারের কঠোর পীড়ন হেম-নবীনের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং পরবর্তী প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, মধুসূদনে তাহার লেশমাত্রও দেখিতে পাই না।"[১৭] উক্তিটি সর্বথা সত্য নহে। শ্রেষ্ঠ যুগপ্রতিভূ মধুসূদনের স্বদেশবাৎসল্য রাবণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে যেমন সুপ্রকট—

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি,
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন?[১৮]

তেমনি বহুপূর্বে তাঁহার কৈশোরের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ইংরেজী কবিতায় স্বাধীনতা-স্পৃহা ও দেশের হৃতগৌরবের জন্য শোচনা আরও সুস্পষ্ট—

And where art thou—Fair Freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo round her brow
Shone radiant, and she rose sublime ;
* * *
That glory hath now flitted by !
The crown that once did deck thy brow
Is trampled down—and thou sunk low :
Thy pearl, thy diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine ।[১৯]

আবার বিহারীলালের কবি-প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যদিও বলিয়াছেন—"বিহারীলাল তখনকার ইংরেজীভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না,......তিনি নিভৃতে নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন,"[২০] তথাপি দেখা যায়—এই আত্মনিষ্ঠ কবিও যুগচেতনার প্রভাবে পরাধীন স্বদেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। সমুদ্রের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিতে অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল দেশ-গ্লানির মর্মন্তুদ চিত্র—

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা !
কপটে অক্লেশে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।
হা হা মাতঃ আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা !
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না !'[১]

রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় দেশাত্মবোধের প্রকাশ এত সুস্পষ্ট এবং সর্বজন-পরিজ্ঞাত যে, উহার উল্লেখমাত্রই এখানে যথেষ্ট মনে হইবে। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যানের' 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' কবিতাংশটুকু ইংরেজ কবি Moore-এর 'From life without freedom' কবিতার অনুসরণে রচিত হইলেও উদ্দীপক রাগিনীর জন্য সুপরিচিত; 'পদ্মিনী' 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য রাজপুত-শৌর্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইলেও মুখ্যতঃ রঙ্গলালের স্বদেশ-গৌরব-কল্পনারই চিত্র—কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর, যুগবাসনা প্রকাশের ব্যাকুলতায় প্রোজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বদেশের অন্তর্গূঢ় মুক্তিসাধনাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের রূপকাবরণে সিপাহী-বিদ্রোহের অনির্বাণ স্মৃতি উদ্‌ভাসিত হয় নাই, একথা বলা যায় না। আর পরাধীনতার বেদনায় বিদীর্ণ-চিত্ত 'কমলাকান্তের' তো—"বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল।"[২২] হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্যে' দেশপ্রীতির ছাপ সুস্পষ্ট; কিন্তু তাঁহার খণ্ড-কবিতাসমূহে প্রকাশিত বেদনার্তিই অধিকতর আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। তাঁহার তূর্যনিনাদ 'ভারত সঙ্গীত' মুমূর্ষু জাতির পক্ষে সঞ্জীবনী মন্ত্রস্বরূপ। য়ুরোপেও এই সময়ে জাতীয়তা-বোধের অনুরূপ স্ফূর্তি দৃষ্ট হয়।[২৩] এবং এই জাতীয়তাবোধের বিচিত্র ফলপ্রসূ প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন দেশে। যেমন—"In Germany as in Italy, ...nationalism had made considerable headway in the realm of ideas. It became part of every liberal man's outlook, tinged with the romanticism which coloured the intellectual revival of the time......It was the man of letters, the poets,

and the professors who made Pan-Germanism articulate."[২৩] আমাদের দেশেও শুধু যে সাহিত্যে বা ভাবসাধনায় এই দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ যজ্ঞাগ্নির মত জ্বলিতেছিল তাহা নহে,—বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র-নাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ সমাজ-সেবায়, ধর্মসংস্কারে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে প্রতি হৃদয়ে দেশপ্রেম দৃঢ়মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিতেছিলেন। সেই যুগের সমাজ-কল্যাণকর (বিশেষতঃ 'ন্যাশন্যাল'-নাম ভূষিত) নানা প্রতিষ্ঠান এই দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞের পরিচয় বহন করিতেছে; সকল প্রয়াসেরই এক উদ্দেশ্য—পরবশ্যতা মোচন এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন।

যুগসন্তান নবীনচন্দ্রও পরাধীনতার জ্বালাময় উষ্ণ ধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া একই সময়েই আত্মগ্লানিতে আর্তনাদ করিয়াছিলেন—

এই নহে আর্যাবর্ত
আমরাও নহি সেই আর্যের কুমার—
* * *
তেজোহীন, বীর্যহীন,
ততোধিক পরাধীন,
আমাদের—হায়! কোন্ পাপের এ ফল;
করে ভিক্ষাপাত্র—কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।

('আর্যদর্শন'—অবকাশরঞ্জিনী)

তাঁহার 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নতর, খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিবার অপূর্ব পরিকল্পনা তাহার বৈশিষ্ট্য; কিন্তু মহাভারতীয় ঘটনাস্রোতকে পটভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবির ঐশ্বর্যময় কল্পনা সেখানে সমসাময়িক পরদলিত নানাভাবে বিভক্ত ভারতবর্ষকেই চিত্রিত করিয়াছে। ভারতবাসীকে সর্বতোভাবে পীড়ন ও শোষণ করিয়া যে ইংরেজ-জাতি এদেশে শান্তি সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মহিমায় কলকণ্ঠ ছিল, 'রৈবতকের' আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের রূপকে স্বাধীনচেতা কবি তাহারই নির্মোক উন্মোচন করিয়াছেন—

একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী ভিক্ষা ব্যবসায়ী,
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—

সাধু তারা! আর যেই জাতি বিদলিত,
আপনার রাজ্যে চাহে সুবিচার যদি,—
তস্কর তাহারা।

যে 'পলাশির যুদ্ধ' রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র সেইদিন জাতীয় কবির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাব্যমূল্য হয়ত অধিক নহে। কিন্তু বাঙালীর স্বাধীনতা স্পৃহা ও অন্তর্বেদনার যে উদাত্ত অথচ করুণগাথা কবি তাহাতে বিরচিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি মধুসূদনের প্রাণপৌরুষের উত্তরসাধক হইবার যোগ্যতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বীরধর্ম আরও কিছুকাল বাঙালী যদি দেহে মনে আচরণ করিতে পারিত, তবে তাহার নির্জীবতার গ্লানি বুঝিবা অপনোদিত হইত। মোহনলালের অন্তিম খেদোক্তিতে যে অপরাজিত আত্মার বাণী শুনিতে পাই—

পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস।

তাহা এই কবি-হৃদয়েরই প্রদীপ্ত ভাষা, বাঙালীর নবচেতনালব্ধ সত্যের বেদনাময় উপলব্ধি। 'অবকাশরঞ্জিনীর' খণ্ড-কবিতাসমূহের বিচিত্র চিন্তা-ধারায় এবং 'রঙ্গমতীর' কাহিনী-সূত্রে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য কবির অন্তর-মথিত বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাতেই তাই স্বদেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম কবি-প্রতিভার উদ্দীপন-বিভাব।

আবার এই স্বদেশ-চেতনা নবীনচন্দ্রকে কেবলমাত্র দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; একই সঙ্গে বিশ্বচেতনাও তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে দেখিতে পাই—যে দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী কালে আরও ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বিশ্ব-মানবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই যুগেই নবীনচন্দ্রের দৃষ্টি প্রাচীন ভারতগৌরব হইতে বর্তমান যুগসমস্যা ও ভবিষ্যৎ মানব-অভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। জগতের বিশালতা এবং কর্ম-ক্ষেত্রের প্রসারতা সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট ধারণা শ্রীকৃষ্ণের মুখেই প্রকাশিত—

ভারত জগৎ নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা! অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্যচয় অনন্ত বিস্তার।

মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী। (প্রভাস—৮ম সর্গ)

তাই ভারত-ঐতিহ্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস সুস্থমনা নবীনচন্দ্রকে একেবারে অন্ধ বা পশ্চাৎমুখী করিয়া দেয় নাই। পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের যে শুভঙ্কর রূপ তিনি 'রুড়কি' পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পর্কে 'প্রবাসের পত্রে' সুন্দর মন্তব্য রহিয়াছে—"ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশ সিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।......তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত, তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুল পূজাই বটে।" 'জাতি-বৈর' যে আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিকে ক্রমেই স্বচ্ছ ও উদার করিয়া তুলিতেছে, ইহাই তাহার নিদর্শন।

Altruism বা মানবহিতবাদ তখন পূর্বোক্ত Humanism এর সাধর্ম্য-সূত্রে জড়িত হইয়া সেই যুগমানসে ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। রামমোহনের বলিষ্ঠ চিন্তায় ও কর্মে তাহার প্রথম প্রতিফলন। তাঁহারও আদর্শ ছিল—'the service of man is the service of God.'[২৫] বঙ্কিমচন্দ্রের "মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না"[২৬]—এই আকাঙ্ক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'[২৭] এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সেই 'মানবহিতবাদে'রই অভিব্যক্তি। নবীনচন্দ্রের উপর যুগধর্মপ্রসূত সেই মানবহিতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লোক-কল্যাণের প্রতিমূর্তি সুভদ্রার নারীধর্ম-বিবৃতি ও কৃষ্ণ-ধর্ম ব্যাখ্যায় নবীনচন্দ্রের নিজ উপলব্ধিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—"এ মহাধর্মের ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্বভূতহিত।" (কুরুক্ষেত্র—১৩শ সর্গ) অবশ্য এই সঙ্গে গীতার 'লোকসংগ্রহ' বা 'লোকশ্রেয়'-উপলব্ধিও আমাদের তৎকালীন ভাবুক ও কর্মীসম্প্রদায়কে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল মনে হয়। কেননা, সে যুগে নূতন করিয়া গীতার জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের তাৎপর্য অনুধাবন এবং জাতিচিত্তগঠনে উহা প্রয়োগের প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। মনীষী কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে যুগনায়ক এবং গীতাকে জীবনবেদরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন—"নবীনচন্দ্র খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ বিরুদ্ধে হিন্দু-আদর্শের পুনরুত্থানের কবি।"[২৮] কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত।

Neo-Hinduism বা হিন্দু-আদর্শের পুনরুত্থান বস্তুতঃ সূচিত হয় ১২৯১ সাল হইতে, 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর দ্বারা। উহাতেই প্রথম হিন্দু-আদর্শের ভিত্তিতে জাতির বুদ্ধি ও বোধির জাগরণ-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নবীনচন্দ্র এ ক্ষেত্রে আন্তরিক-ভাবে প্রবল ভাবোন্মাদনা ও বিশ্বাস লইয়াই বঙ্কিমের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র কি সত্যই খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী হইয়াছিলেন? তাঁহার 'খৃষ্টের' ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই।" 'খৃষ্ট' রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি বলিয়াছেন—"আমার উদ্দেশ্য, সমস্ত অবতারদের লীলা একবার ধ্যান করিয়া বুঝিতে এবং যেরূপ নিজে বুঝি তাহা বুঝাইয়া পরস্পর ধর্মদ্বেষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।"[২৯] এই মনোভাব বিরুদ্ধতার পোষক নহে। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র-সম্পর্কে নবীনচন্দ্র তাঁহার কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় গঠিত বিরূপ ধারণা যদিও আমার জীবনে (১ম ভাগ) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপরিণত মনোভাবপ্রসূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কেননা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ে জীবন ও ধর্মের যে উদার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মহানেতৃত্ব যে ভাবে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়া জাতিকে অগ্রসর করিতে চাহিয়াছে, এবং অবশেষে মানবপ্রেম ও বৈষ্ণবীয় ভক্তির বন্যায় তাহাকে উদ্বেল করিয়াছে, তাহার উপর কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'-আদর্শের ছাপ একেবারে পড়ে নাই, একথা বলা চলে না। জাতীয় ধর্মের সহিত একটি বিশ্বজনীন ধর্ম-কল্পনা কেশবচন্দ্রেরও ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন—(i) A National Religion (ii) A Universal Religion (iii) An Apostolical Religion. তাঁহার মতে নববিধান scientific, emotional, poetical. 'খৃষ্টের' প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত অংশটুকুতে প্রকাশিত মনোভাবের সহিত কেশবচন্দ্রের সমন্বয়াত্মক ধারণা সুন্দর মিলিয়া যায়। তাঁহার নববিধানও 'Recognises in all the prophets and saints a harmony, in all scriptures a unity.'[৩০] সর্বোপরি 'The new faith is absolutely synthetical. Its life is in unity.'[৩১] কেশবচন্দ্রের উদার ধর্মচেতনা, সমন্বয়-দৃষ্টি ও ভক্তি-আবেগ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নবীনচন্দ্রকে কিয়ৎপরিমাণে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল মনে হয়। নবীনচন্দ্রেরও আদর্শ—

এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূতহিত ;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ং ! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম-রাজ্য 'মহাভারত' স্থাপিত। (রৈবতক-১৭শ সর্গ)

কেশবচন্দ্রের উদার চেতনা ও দৃষ্টি নবীনচন্দ্রকে কিয়ৎপরিমাণে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল মনে হয়। সুতরাং নবীনচন্দ্রকে 'খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের বিরুদ্ধে হিন্দু আদর্শের পুনরুত্থানের কবি' না বলিয়া 'সমন্বয়মূলক জীবনাদর্শের কবি' বলাই সঙ্গত।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে সমন্বয়ের আদর্শ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও যুগ-প্রবৃত্তির অনুকূল। রামমোহনের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও সংগঠন-প্রতিভায় সমাজ এবং জাতির যে লক্ষণীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রবাহ কখনো কখনো রুদ্ধ হইয়াছে রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ সমাজ-নেতাদের প্রতিরোধে ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টায়। আবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই দেখি—বিচলিত যুগচেতনা ক্রমে সুস্থির হইয়া এই দুই বিরুদ্ধ কোটির মধ্যে সমন্বয়-সূত্র খুঁজিতেছে। একদিকে অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্ম-দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাস-সংশয়ের অতীত এক পরম সত্যোপলব্ধির সন্ধান দিলেন ; অন্যদিকে সাহিত্য-চিন্তার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনে যে সমন্বয়ের রূপ তুলিয়া ধরিলেন, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রাচ্য জীবনাদর্শের সহিত মিলিয়া নির্বিরোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। যুগসন্তান নবীনচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্র মুখ্যতঃ ভক্তি ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে কাব্যে ও নাটকে ধর্ম ও জাতীয়তার বিচিত্র দ্বন্দ্বকে সমন্বয়সূত্রে বিধৃত করিবার প্রয়াস পাইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংশয়-সংক্ষোভ এবং দ্বিতীয়ার্ধে সমন্বয়-প্রয়াস ; আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্র-মনীষায় সেই সমন্বয়ের সার্থক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় চেতনা ও বিশ্বচেতনার উপলব্ধি তখন প্রায় নির্দ্বন্দ্ব সুস্থির।

বিগত যুগে মহাকাব্য রচনা-প্রয়াসেও যুগাদর্শের প্রভাব দেখিতে পাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—প্রত্যেকেই তাঁহাদের যুগের মানবতা-আদর্শকে স্বকীয় কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিচিত্র বর্ণক্ষেপে অনুরঞ্জিত করিয়া পৌরাণিক চরিত্রাদি অঙ্কন করিয়াছেন, প্রাচীন কাহিনীকে নূতনরূপে উপস্থাপিত

করিয়াছেন। আবার এই তিনজনের মধ্যে নবীনচন্দ্রেই বিচিত্র যুগসমস্তার প্রতিফলন অধিক দৃষ্ট হয়। পরাধীনতা, ধর্মসংশয়, সাম্যমৈত্রীবোধ, দাসজীবন, অসবর্ণ-বিবাহ, স্বাধীন প্রেম, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, অদৃষ্টবাদ, পুরুষকার প্রভৃতি নানা জটিল সমস্তা নবীনচন্দ্রের কাব্যে কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রকাশ্য ভাবে দেখা দিয়াছে। অন্যদিকে মহাকাব্যধারার পাশে পাশেই চিরবহমান গীতিকাব্যধারাকে যখন বিহারীলাল নূতন আবেগে ভরিয়া তুলিতেছেন, তখন নবীনচন্দ্রের কবি-প্রাণেও তাহার স্পর্শ লাগা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কারণ বাহ্যতঃ বস্তুনিষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও আত্মনিষ্ঠ কবি-ধর্মের অনুকূল গীতিরস-প্রবণতাই নবীনচন্দ্রের সর্ববিধ কাব্যে স্বতঃপ্রকাশিত। আবার উহা সেই যুগের অন্যতর কাব্যধর্ম বলিয়া কোন প্রভাবের অপেক্ষা রাখেনা। ঐ ধরণের কবিকে স্বভাবতই অভিভূত করে।

কবি-মহিমা-কীর্তন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন—

> কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক,
> কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর। (কুরুক্ষেত্র-১ম সর্গ)

এখানে আমরা নবীনচন্দ্রকে 'কালের সাক্ষী' এবং 'কালের শিক্ষক' রূপে দেখিবার প্রয়াস পাইলাম। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা নবীনচন্দ্রের 'কবিতা-অমৃত' আস্বাদনের চেষ্টা করিব। তৎপূর্বে বলিয়া রাখি—এবারে সুদীর্ঘ ও বিচিত্র আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নবীনচন্দ্রের রচনা হইতে বহু উদ্ধৃতির আশ্রয় লইব; তাহাতে একদিকে এই গদ্য-সন্দর্ভ যেমন কাব্য-সুরভিময় হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করি, তেমনি এই সুযোগে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর নানা অংশের রসমাধুর্য উপভোগ করিয়া সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আনন্দিত হইবেন বলিয়াও ভরসা রাখি।

সূত্র নির্দেশ

১। 'উপহার'—বঙ্গসুন্দরী, বিহারীলাল।

২। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, নবযুগের বাঙ্গালা—বিপিনচন্দ্র পাল, History of Bengali Literature in the 19th century—Dr. S.K. De, স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন, সাহিত্যসাধক চরিতমালা (নয়টি খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার নবযুগ —মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তিন খণ্ড)—বিনয় ঘোষ, জাতি-বৈর—যোগেশচন্দ্র বাগল, Notes on Bengal Renaissance—Amit Sen, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাঙলা সাহিত্য—ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ—ডাঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৩। The Beginning of Modern Times—Davies, P. 384.

৪। A General History, Pt. II—Thatcher & Schwill, P. 240.

৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার, ১ পৃঃ।

৬। A Students' History of Philosophy—A.K. Rogers, P. 437-38.

৭। History of Western Philosophy—Bertrand Russell, P. 816.

৮। Lectures in India—K. C. Sen.

৯। Song of Freedom—Introduction by H. S. Salt, P. XVI.

১০। 'No wonder that the victim's normal attitude towards an intrusive alien culture is a half-defeating attitude of opposition and hostility.' :—The World and the West—Toynbee, P. 81-82.

১১। Amrita Bazar Patrika, 1st January, 1874.

১২। কর্মদেবী, (১৮৬২)—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। Civil disturbances during the British rule in India—Dr. S. B. Chowdhury, P. XVI.

১৪। 'স্বরূপাভিপ্রায় প্রকাশ'—সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৫ ; ১২ এপ্রিল, ১৮৪৮।

১৫। সাধারণী, ১১ই কার্তিক, ১৮৮০।

১৬। ধর্মতত্ত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র, ২১শ ও ২৪শ অধ্যায়।

১৭। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন, ১০৪ পৃঃ।

১৮। মেঘনাদবধকাব্য, ১ম সর্গ—মধুসূদন।

১৯। 'King Porus—A Legend of Old' কবিতা ; মধুসূদনের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২০। 'বিহারীলাল'—আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

২১। 'সমুদ্রদর্শন'—নিসর্গ-সন্দর্শন, বিহারীলাল।

২২। 'ছল'—উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ।

২৩। 'In the first half of the nineteenth century, nationalism was the most vigorous of revolutionary principles, and most romantics ardently favoured it.'—History of Western Philosophy, Bertrand Russell, P. 703.

২৪। A History of Modern Times—D. M. Ketelbey, P. 175.

২৫। History of Brahmo Samaj—Sibnath Sastri, Vol. I, P. 79.

২৬। 'একা'—কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিমচন্দ্র।

২৭। 'সখার প্রতি'—বীরবাণী, বিবেকানন্দ।

২৮। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন, ১১৯ পৃঃ।

২৯। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ৩২ পৃঃ।

৩০। The life and teachings of Keshab Ch. Sen.—P. C. Majumder, P. 223, 295 & 350.

৩১। Lectures in India—K. C. Sen, P. 426.

শৈশব-পরিবেশ ও কাব্যসাধনার সূচনা

যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রাম ও কপোতাক্ষ নদ যেমন কিশোর মধুসূদনের কবিমর্মের লালনে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল,[১] তেমনি চট্টগ্রামের স্বাভাবিক নিসর্গ-সৌন্দর্যও নবীনচন্দ্রের চিত্তধাতুকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। কপোতাক্ষ নদের পরিবেশ-প্রভাব মধুসূদনের মধ্যে অন্তর্গূঢ় রূপ লইয়াছিল মনে হয়, কেননা, মহাকাব্যের তরঙ্গ-নির্ঘোষের মধ্যে 'কপোতের' মৃদুগুঞ্জন শ্রুত হয় নাই; শুধুমাত্র "চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে" 'কপোতাক্ষনদ' নামক কবিতায় তিনি শৈশবলীলাক্ষেত্রকে আবেগভরে স্মরণ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে দেখি, নবীনচন্দ্র জন্ম ও কৈশোর-পরিবেশের কথা নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বারে বারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। পর্বত, নদী এবং সমুদ্র যেমন কিশোর নবীনচন্দ্রের অস্পষ্ট চেতনা ও অব্যক্ত উপলব্ধির সহিত বিজড়িত ছিল, তেমনি পরিণত বয়সেও এই পরিবেশ তাঁহার চিত্ত ও কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতিকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। নিসর্গ-ধাত্রীর স্তন্যরসধারায় তাঁহার দেহমনের পরিপুষ্টি, কবি স্কটের মত তাঁহার জন্মভূমিও যেন—

> Meet nurse for a poetical child !
> Land of brown heath and shaggy wood,
> Land of mountain and of flood.[২]

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ছিল গিরিকন্দর-সমুৎসারিত মুক্তগতি নির্ঝরিণীর ন্যায়। দূরপ্রসারী কল্পনা ও অপ্রতিরোধ্য আবেগ যে কবির চিন্তা ও মননে প্রতিফলিত, পর্বতের বিশালতা ও গাম্ভীর্য এবং সমুদ্রের দুর্বার গতিবেগ ও তরঙ্গোচ্ছ্বাস যে কবির চিত্তধাতুকে গঠিত করিয়া অপরূপ বাণীমূর্তিতে প্রকটিত করিয়াছে, তাঁহার উপর জন্মভূমি চট্টগ্রামের আবেষ্টনী-প্রভাব একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য খুবই সার্থক— "পর্বতের প্রভাব রহিয়াছে তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান-ভাগের নির্বাচনে—প্রধান প্রধান চরিত্র নির্বাচনে; ইহাদের ভিতরে সাধারণতঃ রহিয়াছে পর্বতসুলভ বিরাটত্ব এবং বলিষ্ঠ উচ্চতা। সমুদ্রের প্রভাব তাঁহার রচনা-রীতিতে— কল্পনার প্রসারতায়—বর্ণনার বিস্তারে—তাহার দুর্বার বেগে—অসংযত চাঞ্চল্যে —পদে পদে স্খলন-পতন-ত্রুটিতে"[৩] চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরে পরে বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন অঞ্চলবাসীদেরও আকৃষ্ট করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

হাসির গানে চট্টগ্রামের প্লীহা ও ম্যালেরিয়ার প্রতি বিভীষিকা জাগাইয়াছিলেন সত্য,[৪] কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'সিন্ধুমেখলা ভূধরস্তনী রম্যানগরী চট্টলা'[৫] বলিয়া আবার তাহারই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম 'কর্ণফুলী' নদীকে[৬] কেন্দ্র করিয়া পুরাণ-ইতিহাস-বিজড়িত রোমাঞ্চময় গাথা সৃষ্টি করিয়াছেন। অধুনা জরাসন্ধ 'লৌহকপাটে' প্রসঙ্গক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য-সৌন্দর্যের অপূর্ব সংক্ষিপ্ত এক বর্ণনা দিয়াছেন।[৭] যাহা হোক, Scott সম্পর্কে সমালোচকের নিম্নোক্ত উক্তিটি নবীনচন্দ্রের উপরও স্বচ্ছন্দে আরোপ করা চলে। "He loved his country's soil as a child loves, for its association. . . . . Yet a beautiful landscape to him meant little without the human touch in it."[৮] জন্মভূমির প্রতি নবীনচন্দ্রের অনুরক্তিও ছিল তেমনি প্রগাঢ়, তাঁহার উপলব্ধিতে চট্টগ্রামের অরণ্য-প্রকৃতি ছিল চিন্ময়ী, প্রাণচঞ্চলা। তাহারই শ্যামল ক্রোড়ে এই প্রতিভাশিশুর উদ্দাম শৈশবলীলা চলিয়াছে, দুই চক্ষুর অঞ্জলি ভরিয়া কবি নিসর্গ-সৌন্দর্যরস আহরণ করিয়াছেন, সেই রসমুগ্ধ চিত্তের প্রকাশই তাঁহাকে কবি-প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। 'অবকাশরঞ্জিনীর' ছন্দোবন্ধে জন্মভূমির সেই বিশিষ্টরূপ দেদীপ্যমান,—

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধুপ্রান্তে সুসজ্জিত জলদমালায়
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্তি প্রায়।
তেমতি শ্যামল-শোভা-মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থিরভাবে প্রবাহ খেলিয়া
উর্মির উপরে যেন উর্মি সাজাইয়া।
নিম্নস্তরে সাগরোর্মি সুনীল বরণ,
উচ্চস্তরে শেখরোর্মি শ্যাম সুদর্শন।
ভরিল হৃদয় ধীরে ভিজিল নয়ন
জননী-প্রতিম-মূর্তি করি দরশন। ('বন্ধুতা ও বিদায়')

যৌবনের স্মৃতিচারণেও যেমন জন্মভূমির চিত্র পরিস্ফুট—

দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণরেখা প্রায়। ('একটি চিন্তা')

তেমনি পরিণত বয়সে প্রবাস হইতে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তনের সময়ও তিনি জন্মভূমির পর্বতমালা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া স্বরচিত সঙ্গীত আপন মনে গাহিতেন—

মা! মা! মা!—কতকাল পরে
ডাকিলাম মাগো পরাণ ভরে।
শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা,
সরিৎমালিনী দেখিলাম তোরে।"

আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তুঙ্গ পর্বতমালাই 'রঙ্গমতী'র পটভূমি রচনা করিয়াছিল। পিতা, পিতৃব্য, এমন কি তদীয় বংশটিতে কাব্যানুরাগ ও কাব্যসৃষ্টিস্পৃহা সহজাতভাবেই ছিল; সুতরাং প্রাকৃতিক ও পারিবারিক প্রভাব হৃদয়বান কবিকে যে কত সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহা নবীনচন্দ্র নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।—"আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনযাতার দিগন্তব্যাপী পর্বতমালায় কবিতা তরঙ্গিত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝর-কণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধুগর্ভের তরঙ্গ-ভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদনদীস্রোতে রজতধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে।·········যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে, কল্পনার অস্ফুট হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি?······ ···কবিতানুরাগ আমার রক্তে, মাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।"[১০] নিজের সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের এই বিবৃতি অতিশয়োক্তিপূর্ণ মনে হইলেও যে সর্বৈব মিথ্যা নহে, তাহা চট্টগ্রামের নিসর্গ-সৌন্দর্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শৈশবে এই পরিবেশেই নবীনচন্দ্রের কবিতারচনার সূচনা হয়। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম। বলা বাহুল্য, সে কবিতায় ছন্দোবন্ধ কিছুই থাকিত না। সে যেন বিহঙ্গ শিশুর প্রথম কাকলি।"[১১] বিহঙ্গ শিশুর এই প্রথম কাকলিই কিছুকাল পরে সপ্তস্বরে অপূর্ব মূর্ছনায় মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে সেই সুর-সাধনার নেপথ্য-ইতিহাসটুকু বিবৃত করা প্রয়োজন। বালক বয়সে গুপ্তজার অনুকরণে

রচিত কবিতাসমূহ কবির নিজেরই ভাষায়,—"কলিকাতার ভাড়াটে গাড়ীর অপূর্ব ঘোটকদ্বয়ের মত পয়ারের এক চরণ আর এক চরণ হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইত।......আমি সেই বয়সেই অনেক কবিতা লিখিতাম। বঙ্গ-সাহিত্যের অদৃষ্ট ভাল যে তাহার ছায়াও নাই। বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক সভায় প্রায় প্রত্যেক শনিবার আমি একটি করিয়া কবিতা প্রসব করিয়া ফেলিতাম। কলিকাতায় আসিয়াও কবিতা সম্পর্কে আমার করকণ্ডুয়ন ঘুচিল না।"[১২] এই কাব্যসৃষ্টির প্রকাশ বন্ধুমহলে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ধীরে ধীরে 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং তিনি নবীনচন্দ্রকে 'গেজেটে' লিখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।[১৩] 'গেজেটে' প্রকাশিত 'বিধবা কামিনী'ই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

যাহা হোক, কার্যব্যপদেশে যশোহরে আসিবার সময়ে নবীনচন্দ্র 'পিতৃহীন যুবক' কবিতাটি 'এডুকেশন গেজেটে' ছাপিবার জন্য প্যারীবাবুকে দিয়া আসেন। উহা প্রকাশিত হইলে পর সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তৎপর যশোহরে এবং অন্যান্য স্থানে ১৮৬৮ সাল হইতে বহু কবিতা রচিত হয়। এই সময়ে রচিত কবিতাসমূহ 'অবকাশরঞ্জিনী' নামক প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৬ পৃঃ।

২। The Lay of the Last Minstral—W. Scott, canto VI.

৩। বাংলা-সাহিত্যের নবযুগ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৭১ পৃঃ।

৪। 'আর তো চাটগায় যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়'—দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী, (কাব্য) সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ৫৮৫ পৃঃ।

৫। 'চট্টলা'—অভ্রআবীর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬। 'কর্ণফুলী'—চক্রবাক, নজরুল ইসলাম।

৭। লৌহকপাট, ২য় ভাগ, জরাসন্ধ, ১৫১-৫৩ পৃঃ।

৮। A History of English Literature—Compton Rickett, P. 324.

৯। আমার জীবন, ৪র্থ, ১৯১ পৃঃ।

১০। ঐ , ১ম, ১২৯ পৃঃ।

১১। ঐ , ১ম, ১৩০ পৃঃ।

১২। ঐ , ১ম, ১৩৬ পৃঃ।

১৩। ঐ , ১ম, ১৪২ পৃঃ।

অবকাশরঞ্জিনী

'অবকাশরঞ্জিনী' নবীনচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। উহাতে কবির নামোল্লেখ ছিল না, শুধু লিখা ছিল 'শ্রীনঃ'। প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই কবির আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত।' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে, অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট কতিপয় কবিতাসহ উহার পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। খণ্ড গীতিকবিতা লইয়া নবীনচন্দ্রের কবিজীবনের এই সূচনা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা, পূর্বাপর এই গীতিকাব্যরসপ্রবণতা তাঁহার কবি-মর্মের মূল প্রবৃত্তি। যাহা হোক, এই কবিতাসমূহ সম্পর্কে কবির বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।—"অবকাশরঞ্জিনী সম্বন্ধে দু'টি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড-কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনায়' খণ্ড-কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' স্মরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র পথপ্রদর্শক 'প্রভাকর'। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু স্মরণ হয়, তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই।......যাহা হউক, অবকাশরঞ্জিনী বোধ হয়, বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ড কাব্য। দ্বিতীয়তঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাঙ্গালার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 'ভারতসঙ্গীত' আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়।...... এ স্বদেশপ্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোহরে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। বোধ হয় শিশিরবাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি।"[২]

নবীনচন্দ্রের উক্ত বক্তব্য বিচারসাপেক্ষ। তিনি নিজেই 'প্রভাকরের' ঈশ্বর-গুপ্তকে খণ্ড-কবিতার পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কাব্য-গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হইলেও গুপ্ত-কবির কবিতা ছিল বহু পরিচিত। মধুসূদনের

'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২) Dramatic Monologue হইলেও গীতিরসে সমৃদ্ধ, ভাববস্তু মূলতঃ এক হইলেও নারীহৃদয়ের স্বতন্ত্র সত্তার অকুণ্ঠ ঘোষণা এবং প্রণয়-ব্যাকুলতা, ঈর্ষা-অসূয়া ও শক্তিবীর্যের বিচিত্র প্রকাশে প্রায় প্রতিটি পত্র ভিন্ন ভিন্ন রসের দ্যোতক হইয়াছে। আবার বৈষ্ণব কবিতাসমূহ যদি একই রসবস্তু অবলম্বনে রচিত হইয়াও বিচিত্র সুরের এবং বিভিন্ন ভাব-মুহূর্তের রূপায়ন হিসাবে খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার মর্যাদা পাইতে পারে, তবে উহাদেরই আদর্শে রচিত মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যও (১৮৬১) অবশ্যই খণ্ড-কবিতা-সংগ্রহ। তাহার বিষয়বস্তু 'রাধাবিরহ' হইলেও বিচিত্র সুরে ছন্দে ভঙ্গিতে বিরহিণী-হৃদয়ের বিভিন্ন গোপন কক্ষদ্বার সেখানে অনর্গলিত হইয়াছে। বিহারীলালের 'সঙ্গীত-শতকে'ও (১৮৬২) বিরহ-মিলনলীলার সুর নানাভঙ্গিতে বাজিয়া উঠিয়াছে, সুরতালের নির্দেশ সত্ত্বেও উহার সবগুলিই 'গান' নহে, কিন্তু নিঃসন্দেহ খণ্ড গীতিকবিতা। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বিষয়বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একই ছন্দে, একই কায়াগঠনরীতিতে রচিত। উহার একটি কবিতা 'কবি-মাতৃভাষা' ১৮৬০ সালে রচিত হইলেও উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে। নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা 'বিধবা কামিনী' তাঁহার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ ক্লাসে অধ্যয়নকালে 'এডুকেশন গেজেটে' (নবীনচন্দ্রের উক্তিতে তখন প্যারীচরণ সরকার উহার সম্পাদক*) প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা সত্য যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নবীনচন্দ্রের অন্ততঃ কতিপয় খণ্ড-কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬৪ সালে প্যারীচরণ সরকার গেজেটের সম্পাদক ছিলেন না, তখন সম্পাদক ছিলেন ও' ব্রায়ান্ স্মিথ। সরকার মহাশয় উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে।' তখন নবীনচন্দ্র জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন-এ বি-এ ক্লাসের ছাত্র। কাজেই 'বিধবা কামিনী' কবিতাটি গেজেটে প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব, তাঁহার সম্পাদনা কাল তখন নয়। যাহা হোক, একথা ঠিক যে, নবীনবাবুর খণ্ড-কবিতা হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতা প্রকাশের অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্ব হইতেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতেছিল। কেননা, প্যারীচরণের পরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। উহার ১৭ই মাঘ, ১২৭৫, সংখ্যায় হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড কবিতা 'হতাশের আক্ষেপ'

প্রকাশিত হয়।[৫] অবশ্য গ্রন্থাকারে নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র (১৮৭০) একবৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায়, 'অবকাশরঞ্জিনী' বঙ্গভাষায় 'এরূপভাবের প্রথম কাব্য' না হইলেও বিষয়বৈচিত্র্য, ভাবাবেগের প্রাবল্য, এবং সংখ্যাবহুলতার জন্ম খণ্ডগীতি-কবিতা-সংকলন রূপে সেযুগে উহার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নবীনচন্দ্রের 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলা কবিতায় ছিল না—একথাও সর্বৈব সত্য নহে। পূর্বে 'দেশ-কাল ও মন' অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি—নবীনচন্দ্রের পূর্বেও সাহিত্যে স্বদেশ প্রেমের ধারা কিভাবে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবির মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলায় গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলি সব ভারত সন্তান'ও এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। সুতরাং ততদিনের মধ্যে নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-মমতাবোধক একাধিক কবিতা অবশ্যই রচিত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হোক, নবীনচন্দ্রের 'স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণের' দাবী তেমন না টিকিলেও স্বদেশপ্রীতিব্যঞ্জক কবিতার স্বল্পসংখ্যক কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম, এবং এই সুর তাঁহার প্রায় সমস্ত কাব্যেই অত্যন্ত স্পষ্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন দেখি—কিশোর নবীনচন্দ্র স্বভাব-চঞ্চল, আবেগ-প্রবণ, করুণাকাতর ও প্রণয়-উন্মুখ; তেমনি কবিজীবন তথা কাব্যসাধনার সূচনাতেও তাঁহার যে মনোবৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাহা লিরিক-উচ্ছ্বাসধর্মী। মধ্যজীবনে রচিত কাব্যত্রয়ে মহাভারতীয় ঘটনাস্রোতের ঊর্মিমুখরতায়ও কানে বাজে সেই সুর, আবার কবিজীবনের অন্ত্যপর্বে রচিত চৈতন্যলীলার ভক্তিময় ব্যাখ্যানেও কবির ব্যক্তি-সম্পর্কের উষ্ণস্পর্শ লাগিয়াছে, বিচ্ছেদ-বিলাপ সঙ্গীত হইয়া ফুটিয়াছে। কবিমানসের এই পূর্ণবৃত্ত রূপ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়—আদর্শ (Model) এবং রূপকল্প (Pattern) হিসাবে সেই যুগে প্রচলিত মহাকাব্য এবং আখ্যায়িকা-কাব্যের অবয়বকে আশ্রয় করিলেও আত্মতন্ময় নবীনচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কিন্তু সর্বত্রই স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত লিরিক অংশসমূহে। তাহার আধিক্যে পরিমিতিবোধের অভাব সূচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কবিপ্রকৃতির মৌল-প্রবৃত্তির পরিচয় পাইতে অসুবিধা হয় না। 'অবকাশরঞ্জিনী' হইতেই কবির বীণার ষড়জের তারটি যে সুরে বাঁধা হইয়া গেল, তাহা গীতিসুর।[৬] স্বকীয় উপলব্ধি-রসে সিঞ্চিত ক্ষণস্থায়ী

ভাবমুহূর্তগুলিকে খণ্ড ও নাতিদীর্ঘ কবিতায় তিনি ইহাতে বিধৃত করিয়াছেন ; স্বতন্ত্রভাবে তাহারা সম্পূর্ণ, অথচ এক ভাব-পরিমণ্ডলে তাহারা খণ্ডিত নহে। হর্ষ, বিষাদ, প্রণয়, বিরহ, দেশানুরাগ প্রভৃতি নানাভাব নবীনচন্দ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে, সুতরাং সেই সেই মুহূর্তে জাত কবিতাসমূহের ব্যক্তিলীনতা ও স্বাভাবিক হৃদ্যসুর উপভোগ্য। মহাকাব্য এবং আখ্যায়িকা-কাব্যের আলোকোজ্জ্বল আসর ও ঐকতানিক উচ্চ সুরের পাশে পাশে মধুর বীণাতন্ত্রীতে এই অন্তরঙ্গ গীতিমূর্চ্ছনাই বিহারীলাল বহুপূর্ব হইতে ধ্বনিয়া তুলিতেছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে কোথাও উল্লেখ না থাকিলেও নবীনচন্দ্রে সেই ভাব ও সুরের স্পর্শ লাগা অসম্ভব নহে, আবার তাঁহার কবিপ্রকৃতির গীতিপ্রবণতার দরুণ এই সুর-সাদৃশ্য একান্ত স্বাভাবিকও হইতে পারে।

প্রথম বিচিত্রবিষয়ক খণ্ড-কবিতার রচয়িতারূপে নবীনচন্দ্রের দাবী না টিকিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে,—এ বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্যদের অন্যতম। তাঁহার রচনা গুণগত ও সংখ্যাগতভাবে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। বিহারীলালের আত্মলীন গীতিকবিতাসমূহের মূল প্রবৃত্তির সহিত হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতার তুলনা হয় না—বিহারীলালের সেই ধ্যান, সেই স্বপ্নবাসনা, সেই সুরসম্মোহ তাঁহার নিজের মুখেই শোনা যাক্,—

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।
করি' সে সঙ্গীতসুধা পান
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আশে পাশে,
সমুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।'

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করিয়া বিহারীলালের অনুরূপ স্বপ্নলোকে বিহার করিতে পারেন নাই—কেননা, তাঁহাদের কবি-প্রকৃতিই ভিন্ন, তাই বিহারীলালের এবং তাঁহাদের কবি-ভাষার মধ্যেও সুস্পষ্ট

পার্থক্য রহিয়াছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতার বিষয়বস্তুতে সাদৃশ্য আছে—হতাশাপূর্ণ প্রেম, স্বদেশের গৌরব ও দুঃখে হর্ষ-বেদনা, সামাজিক অবিচারে ক্ষোভ, নিসর্গের প্রতি আকর্ষণ, সমসাময়িক ঘটনার চিত্রায়ণ। নবীনচন্দ্রের প্রণয়কবিতাসমূহে আন্তরিক ব্যাকুলতার সুর হেমচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশী বাজিয়াছে; কারণ প্রণয়াবেগ হেমচন্দ্রের কবিপ্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, নবীনচন্দ্রে তাহা জীবনোপলব্ধির সহিত জড়িত। স্বদেশভাবনার কবিতায় উভয়ে প্রায় তুল্য দক্ষতা দাবী করিতে পারেন, কিন্তু সমাজ ও সাময়িক ঘটনাবিষয়ক কবিতায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব সমধিক। তবু উভয়ের—বিশেষতঃ নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতার কবি-কর্মে বহু ত্রুটি সাধারণ পাঠকেরও চোখে পড়িবে। বাহুল্যপূর্ণ উক্তি, অহেতুক উচ্ছ্বাস, অসংযত হৃদয়াবেগ, প্রতি কবিতার ভাব-পরিমণ্ডলে ঐক্যের (unity of atmosphere) অভাব এই খণ্ড-কবিতাসমূহকে সার্থক সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে নাই। আবার অতিস্পষ্টতা—অর্থাৎ বক্তব্য ভাবকে নিঃশেষে ব্যক্ত করার দরুণ কবিতাগুলি সার্থক গীতিকবিতার ব্যঞ্জনাময়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ "It will also be found that the pure lyric, having for its purpose the expression of some single mood or feeling commonly gain much in emotional power by brevity and condensation, and that over-elaboration is almost certain to entail loss in effectiveness."[৮] তবু নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-হৃদয়টি বুঝিবার পক্ষে খণ্ড কবিতাগুলি যেমন মূল্যবান, তেমনি গীতিরসের বিচারেও তাহারা একেবারে মূল্যহীন নহে।

নবীনচন্দ্রের মতে 'বিধবা কামিনী' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ইহার রচনার উপলক্ষ্যও নবীনচন্দ্র জানাইয়াছেন,—ছাত্রাবস্থায় তাঁহার কোন ব্রাহ্মবন্ধু তাহার ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া এক বিধবা চাকরাণী দেখিয়াছে। দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে দেশাচার-রাক্ষস হইতে হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছে। নবীনচন্দ্র এই বিষয় শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া উক্ত কবিতা রচনা করেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর হাত দিয়া উহা 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের কাছে পৌঁছায়। তিনি উহা গেজেটে প্রকাশিত করেন।[৯] লক্ষ্য করিবার বিষয়—কবিতাটি লিখিবার পূর্বে নবীনচন্দ্রের মনে ঘটনাটি সম্পর্কে যে কৌতুকোজ্জ্বল ভাব বিদ্যমান

ছিল, রচনায় কিন্তু তাহা উবিয়া গিয়া বরং করুণ গাম্ভীর্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। কবিতাটিতে যেন হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র অস্পষ্ট একটু ছাপ আছে। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কলেজে নবীনচন্দ্রের পাঠ্য ছিল। তবে হেমচন্দ্রের কবিতায় প্রকাশিত গভীর নৈরাশ্য নায়কের অন্তঃপ্রকৃতিগত, সমাজের তথা জগতের প্রতি বিরূপতাসঞ্জাত, তাহার উপলব্ধি—

ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।

* * *

সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।

আর তাহার হতাশার কারণ—

দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের 'বিধবা কামিনী'র করুণাকাতর নায়ক মুখ্যতঃ প্রণয়-ব্যাকুল, তাহার সংকল্প যদিও—

একাকী যুজিব আমি ত্যজিব না রণ,
যদবধি হইবে না হত দেশাচার।

তবু তাহার সমস্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস একটি রোমাঞ্চময় ব্যর্থতার বেদনায় কেন্দ্রীভূত—

তবে অয়ি অনাথিনী। সতৃষ্ণনয়নে
কৃতঘ্নের পানে মিছে চাহিও না আর;
পরস্পর রাখিও না, রাখিব না মনে,
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।

অতি স্বাভাবিকভাবেই এই করুণাসঞ্জাত প্রণয়ের স্পর্শে অনাথিনী বিধবার চিত্র কবিত্ব-রসে সজীব হইয়া উঠিয়াছে—

অশ্রুজলে ছলছল নয়নের তারা,—
অকালে শিশিরে কেন সিক্ত কমলিনী?
নীলোৎপল হতে ঝরে মুকুতার ধারা,
কাহার লাগিয়া আহা দিবস-যামিনী?

নবীনচন্দ্রের প্রথম তিনটি কবিতাই দীর্ঘ রচনা। তন্মধ্যে 'পিতৃহীন যুবকে'র কথা পরে আলোচিত হইবে। 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'র যে পূর্বকথা নবীনচন্দ্র কবিতার সূচনায় জানাইয়াছেন, তাহা প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন,—"এই যুবতী কোন এক পার্বতীয় প্রদেশের ভাগ্যবানের দুহিতা।

তাহার শৈশবকালে জনক-জননী অসভ্য জাতির অত্যাচার-ভয়ে পলায়ন সময়ে অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায় তৃতীয়-বর্ষীয়া বালিকাকে অর্থপ্রলোভনসহ একজন কৃষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।……এই হতভাগিনী কৃষকগৃহে পালিতা। একদিন এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, এবং সেই সূত্রে পরস্পরের চিত্ত-বিনিময় হয়। যুবক কৃষকের কাছে সবিশেষ অবগত হইয়া জানিতে পারিলেন, এই যুবতী তাঁহার পিতার পরমবন্ধুর কন্যা। পিতৃসমক্ষে তিনি আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উভয়ের পরিণয় বিধান করিলেন।"—অতঃপর বারাঙ্গনার মোহে আবদ্ধ পতি-কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া এই যুবতী আত্মহত্যা করে। তাহারই স্বগতোক্তিতে কবিতাটি বর্ণিত। পূর্বকাহিনীটুকু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, এই প্রণয় ও পরিণয়কে একটি সমাজগ্রাহ্য রূপ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ট্রাজেডি ঘটিয়াছে যুবকের চারিত্রিক স্খলন হইতে, এবং সেই ত্রুটিও তখনকার নব্য-শিক্ষিত সমাজে অবিরল ছিল। বিহারীলালও এইরূপ এক 'অভাগিনী' 'পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নারীর' হৃদয়বেদনা করুণ গীতিকবিতায়[১০] প্রকাশ করিয়াছেন।

'দুঃখিনী কামিনী' কবিতাটি নবীনচন্দ্রের বর্ণনকুশল কবিপ্রতিভার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা জাগায়। নিম্নের উদ্ধৃতিটুকুতে পতি-প্রবঞ্চিতার যে করুণ ধিক্কার দু'টি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সত্যই উপভোগ্য। সরলা বিশ্বাসমুগ্ধা প্রণয়দুর্বলা এই যুবতীর সহিত কুরঙ্গিণী ও কপোতীর পার্থক্য কোথায়?

ছিল যেই কুরঙ্গিণী নির্জ্জন কাননে,
আপন মনের সুখে শীতল ছায়ায়;
জল-আশা দিয়ে এনে মৃগতৃষ্ণিকায়,
কেন অকারণে তারে বধিলে জীবনে?
কানন-কপোতী ছিল বসি তরুডালে;
দুর্লঙ্ঘ্য প্রণয় ফাঁদে বাঁধি বিহগীরে,
সোনার পিঞ্জরে রাখি এ যৌবনকালে
ভুজঙ্গের দন্তে কেন সঁপিলে তাহারে?

ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণে কবি-জীবনের সূচনা হইলেও নবীনচন্দ্রের মধ্যে তাঁহার প্রভাব কিছুই নাই, বরং মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের অনুসরণেই তিনি

উল্লাস বোধ করিয়াছেন বেশী। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' চতুর্থ সর্গে ('অশোকবন') করি-ভাষায় যে গীতি-নির্ঝর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দ-বেদনায় সীতার মুখ হইতে ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই যেন নবীনচন্দ্রেরও 'দুঃখিনী কামিনী'র মুখে ভাষা যোগাইয়াছে। সেই দাম্পত্য সুখস্মৃতির সুমধুর স্মরণ, প্রকৃতির উন্মুক্ত উৎসঙ্গে সৌন্দর্যসম্ভোগ—সবই যেন নবীনচন্দ্রেরও হাতে লীলাময় হইয়া উঠিয়াছে—

বিদ্যুৎপ্রতিম আমি নিবিড় কাননে
পশিতাম, ভ্রমিতাম নাচিয়া নাচিয়া,
(কাননদুহিতাপ্রায়, উল্লাসে মাতিয়া)
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে প্রাণেশের সনে।
দেখিতাম প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা
ঈষদচঞ্চল মরি সুমন্দ অনিলে,
দূরে স্বচ্ছ নির্ঝরিণী শব্দ মনোলোভা,
সুকোমল কলরবে জাগাত কোকিলে।

* * *

মনসুখে পতিপাশে বসি তরুতলে,
গাইয়া পঞ্চম স্বরে কোকিলার সনে
মোহিতাম বনরাজি ; প্রভাত-গগনে
বিরাজিত সেই স্বর ; নির্ঝরিণীজলে
কল্লোলিত ; মর্মরিত শ্যাম-পত্রদলে।
কুসুমসৌরভ সহ বহিত পবন ;
গাইতেন বনদেবী প্রতিধ্বনিচ্ছলে
কুরঙ্গ ভাঙ্গিত নৃত্য করিয়া শ্রবণ।

মধুসূদনের ভাষার শব্দস্পন্দ ও নাটকীয় দ্যুতি, অমিত্রাক্ষরের অভাবনীয় চমক নবীনচন্দ্র আয়ত্ত করেন নাই ; কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গীতিরসাত্মক প্রবহমান দীর্ঘ বর্ণনার উপযোগী যে ভাষার উদ্বোধন নবীনচন্দ্র এই কবিতাটিতে করিয়াছেন, তাহার মাধুর্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অতঃপর এই ভাষাভঙ্গিই নবীনচন্দ্র প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা যেমন একদিকে তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, তেমনি অপরদিকে বর্ণনাত্মক বাংলা পয়ারের

স্বরূপও নির্দেশক। নিম্নের উদ্ধৃতিটুকুতে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপে' দেবযানীর স্মৃতিচারণাত্মক আবেগ-মন্থর ভাষার পূর্বাভাষ সূচিত হয় নাই কী? বিষয়বস্তুও তো উভয়তই প্রায় এক!

পড়ে কি হে মনে,
সেই দিনে? একদিন নির্ঝরিণীপাশে,
যথায় নির্গত বারি তৃষিতে সন্তাষে
ভাসায়ে প্রণালী-শিলা স্ফটিক জীবনে,
বসিয়াছিলাম নাথ! শীতল ছায়ায়;
মধ্যাহ্ন রবির করে, সলিলশীকর
পতিত হইতেছিল ইন্দ্রধনু প্রায়,
বিকাশি কিরণচ্ছটা, মরি, কি সুন্দর!
প্রখর ভানুর করে তাপিত অবনী।
মণ্ডিত আতপতাপে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অদূরে জ্বলিতেছিল বাঁধিয়া নয়ন,
বিহঙ্গ বসিয়া ডালে নীরব অমনি,
কেবল বায়সগণ কখন কখন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্নস্বরে;
গাভীগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত-কলেবরে।

* * *

কেমনে না জানি হায়! বিধির বিধান,
কোথা হতে আচম্বিতে পান্থ একজন,
বলিল মধুর স্বরে, মোহিয়া শ্রবণ
"সুন্দরি! তৃষিত পান্থে কর জল দান।"
চমকি, চমকে যথা সুপ্ত কুরঙ্গিণী
শুনিয়া, শিয়রে ব্যাধ-বংশীর সঙ্গীত,
চাহিনু কুক্ষণে হায়! আমি অভাগিনী,
পথিক নয়নপথে হইল পতিত।
কে সে পান্থ, প্রাণনাথ! পড়ে কি হে মনে?
পড়ে কি হে মনে সেই নবীনা রমণী?

তথাপি অতিকথন দোষে এই সুন্দর করুণ রসমণ্ডিত কবিতাটিও শেষ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিচিত্র-মিল আটচরণের স্তবকবিশিষ্ট (ক খ খ ক, গ ঘ গ ঘ) পয়ারসমূহ যে আবহটুকু রচনা করিয়াছিল, মধ্যে যোজিত বৈষ্ণব-কবিতার ভাব ও প্রকাশভঙ্গির অনুকরণে লঘু ত্রিপদীর এক অপ্রয়োজনীয় বিলাপ তাহা ছিন্ন করিয়া দিল। তা ছাড়া, শেষাংশে স্বপ্নে পতি-দত্ত ছুরিকায় আত্মহত্যা প্রভৃতিতে অতি নাটকীয়তার ছাপ পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।

উদ্ভিন্নযৌবন নবীন গীতিকবির পক্ষে কাব্যে অস্পষ্ট উচ্ছ্বাসময়তা ও কুহেলিকা-জাল সৃষ্টি বড় প্রয়োজন। জীবন সম্পর্কে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ সুস্পষ্ট উপলব্ধির অভাব এবং তজ্জনিত নৈরাশ্য—এই অনির্দেশ্য ভাবমত্তদশা তাহারই লক্ষণ। নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতায় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা-ভাবনার স্পর্শ নিবিড়। বিশেষতঃ তাঁহার প্রেমের কবিতা তো খুবই ব্যক্তিগত বা personal—এই দিক হইতে বায়রণের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য খুবই লক্ষণীয়। বায়রণের প্রেমের কবিতায় তীব্র অনুভূতির মূলও ব্যক্তিসম্পর্ক। সমালোচক বলেন—"In his lyrics there is no brooding vision or evanescent imagery, but a kind of passoinate thinking."[১১] তেমনি নবীনচন্দ্রের স্বদেশচেতনাত্মক কবিতা-গুলিতেও বায়রণের আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ 'অগ্নিশিখাবৎ' ভাবরাশির নির্গলিত উচ্ছ্বাস যেন কতকটা সঞ্চারিত হইয়াছে, বায়রণের ভাষায় যাহাকে বলা চলে—

> But mine was like the lava flood
> That boils in Etna's breast of flame.[১২]

বলাবাহুল্য, এই কাব্যগ্রন্থের 'অবকাশরঞ্জিনী' নামও বায়রণের Hours of Idleness নামক খণ্ড-কবিতাগ্রন্থের অনুকরণজাত। নবীনচন্দ্রের কাব্যে বায়রণের বিপুল শক্তির উদ্দামতাও যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি বায়রণের কবিকল্পনার অসংযমও যেন তাঁহাতে সংক্রামিত।

বলিতেছিলাম,—বায়রণের মত নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ প্রেম-কবিতাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 'passionate feeling' এ পূর্ণ। নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে পূর্বরাগসঞ্চার ও প্রণয়ভঙ্গের যে আবেগময় কাহিনী পাই, তাহা কবিতায়ও ভাষা পাইয়াছে। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় দেখি—প্রণয়-ব্যর্থতার মধ্যেও কেবল-

মাত্র প্রথম দর্শনের স্মৃতি-রোমন্থনে প্রণয়িনীর রূপসৌন্দর্য প্রণয়ীর মনে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই স্মৃতি বেদনাকে করিতেছে আরও উদ্দীপ্ত—

সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার
মানস সরসে মম দিতেছে সাঁতার।

*　　　*　　　*

দুলিছে সৌন্দর্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার-গায়।
কিন্তু আহা! সে সকল করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন?

বায়রণও বলেন—

Remembrance only can remain—
But that will make us weep more.[১৩]

'প্রতিমা-বিসর্জন' কবিতার বিষয়বস্তুর সহিত পূর্বালোচিত 'বিধবা কামিনীর' সাদৃশ্য আছে। এখানেও অভিযোগ—'দেশাচার হায় তাকে নিল কি কাড়িয়া'? তাই নৈরাশ্য—'হবেনা আমার তুমি, হবনা তোমার'। স্বল্লায়তন এই কবিতাটিতে ব্যর্থতার বেদনা অনেকটা ঘনীভূত রূপ লাভ করিয়াছে; শেষের উক্তিটুকুর সুন্দর উপমার মধ্যেই তাহা প্রকাশিত—

কল্পনা-বিমল-জলে
প্রতিবিম্বে প্রতি পলে,
যেই তারা দেখিতাম হায়!
বিস্মৃতির অন্ধকারে　　কেমনে লুকাই তারে,
অনুতাপ সহন না যায়।

প্রণয়িনীর অন্যত্র পরিণয়-আয়োজনে প্রেমিকের আশাহত অবস্থা প্রণয়িনী নিজ মুখে সখির নিকট ব্যক্ত করিতেছে—ইহাই 'নিরাশ প্রণয়' কবিতাটির বক্তব্য। বৈষ্ণব-কবিতার নায়িকার মত এখানেও রসোদ্‌গারের বর্ণনায় উল্লাস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কবিতার প্রারম্ভে নায়িকার কুণ্ঠার ভাবটি ব্যঞ্জিত হইয়াছে সুন্দর ইঙ্গিতে—

হৃদয়ের ভাব কথায় কেমনে
প্রকাশিব বল স্বজনী-সকাশে?

খেলে যে লহরী জলধি জীবনে,
সন্ন্যাসী সে লীলা কেমনে প্রকাশে ?

কিন্তু সর্বশেষে প্রণয়ব্যর্থতার শোকে নায়িকার সন্ন্যাসিনী হওয়া যেন কতকটা অতিনাটকীয়।

'হৃদয় উচ্ছ্বাস' কবিতাটি মূল ভাবে ও গঠনে হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতার সহিত তুলনায় আলোচ্য। হেমচন্দ্রের কবিতায় হতাশার ভাব চন্দ্রোদয়ের অনুষঙ্গেও কেমন যেন গন্তময় হইয়া রহিয়াছে; তাহা আক্ষেপোক্তি বটে, কিন্তু বেদনার্ত হৃদয়ের উষ্ণস্পর্শহীন। নবীনচন্দ্রের কবিতায়ও হতাশাজনিত আক্ষেপ আছে, তবে বিচ্ছেদকাতর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সেখানে অসহন দাহ সৃষ্টি করিয়াছে, ফলে তাহার প্রকাশ কিছুটা বাহুল্যপূর্ণ হইলেও লালিত্যময়—

যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে,
যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে;
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া জীবনে,—

মনে হয়, এই হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সহিত মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যের' নায়িকা বিরহিণী রাধার আক্ষেপোক্তির যেন সুন্দর ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে।

'কি লিখিব' কবিতাটি অন্যত্র-বিবাহিতা প্রণয়িনী পূর্বপ্রণয় স্মরণ করিয়া প্রণয়ীকে যে পত্র লিখিয়াছে, তাহারই উত্তর। বাগ্‌বাহুল্য সত্ত্বেও এই কবিতায় প্রেমের এক মহত্তর স্বরূপ (যে 'নিকষিত হেম' প্রেমকে বলা হয় Platonic) নায়কের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। নবীনচন্দ্রের প্রগাঢ় বাসনা-বিহ্বল ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রেমকবিতাসমূহের মধ্যে এই ভাবের কবিতা বিরল।

যে মনে তোমায় ভালবাসিয়াছি আমি,
নিরমল পাপশূন্য, পাপ আকাঙ্ক্ষায়
নহে কলুষিত তাহা, তুমি কি জান না আহা!
ভালবাসা তরে ভালবেসেছি তোমায়!

এমন সে ভালবাসা—প্রতিদান তার
চাহি নাহি, চাহিব না নিকটে তোমার!

নিজ মনে নিজে সুখী, কি বলিব শশিমুখি !
অবিচল প্রেম প্রিয়ে! অন্তরে আমার।

'ভালবাসা তরে ভালবেসেছি তোমায়'—এই love for love's sake—নবীনচন্দ্রে এক অভিনব উপলব্ধি ; উহাই কি পরে বৈষ্ণবীয় 'অকৈতব কান্তা-প্রেমের' সহিত যুক্ত হইয়া অর্জুনের প্রতি শৈলজার প্রেমকে ('কাব্যত্রয়ী'তে) গড়িয়া তুলিয়াছিল ?

'প্রেমোন্মাদিনী' কবিতায় প্রেমের রহস্য ও গভীরতা উপলব্ধি করিতে গিয়া নায়িকা সংশয়াচ্ছন্ন। অস্তিত্বের সহিত অভিন্ন যে প্রেম, যাহা অনাদ্যন্ত, অবিরাম, প্রকাশ যাহার কখনও প্রশান্ত কখনও উদ্দাম—তাহা দুর্বোধ্য বৈ কি। পূর্বালোচিত কবিতাটির 'ভালবাসার' স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস যেন এই কবিতাটিতে রহিয়াছে।

বুঝি নাই—
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে,
হৃদয়-শোণিত সহ হৃদয়ে সঞ্চরে,
আদি নাই, অন্ত নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই,
মানব-হৃদয়-গঙ্গা, সুধা প্রবাহিনী
শান্তভাবে, বিলোড়নে বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।

'সখের গোলাপ' কবিতাটি গীতিসুরের মূর্চ্ছনায় সর্বাধিক সার্থক। ইহা যেন 'রৈবতকের' পঞ্চম সর্গে বিধবা সুলোচনার মুখে প্রদত্ত অপূর্বসুন্দর "ফুলের প্রণয়ভাষা মরি কি মধুর রে' গীতটির অগ্রজস্বরূপ।

সখের গোলাপ মম বরিষার জলে,
দেখ ছিন্ন ভিন্ন করে, সুকুমার দল ঝরে
দেখ, আহা, ক্রমে ক্রমে পড়িছে ভূতলে।

* * *

ওই গোলাপের মত এই প্রেম শত শত
খণ্ড হয়ে পড়িয়াছে বিচ্ছেদের ঘায়।

গোলাপের অনুষঙ্গে প্রেমের কোমলতা যেন আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই গোলাপের ঈষদ্ রক্তাভ শুভ্র দলগুলির বিশুষ্ক বিগত-সৌরভ পাণ্ডুরতা যেন প্রেমের বিবর্ণ মৃত্যুই সূচিত করে; তখন বড় হতাশায় প্রণয়ীকে বলিতে হয়—

এই ফুল ছিল মম জীবনের মূল,
শীতল মিলন-জল বর্ষিতাম অবিরল,
নিঃশ্বাস পবনে মন নাচিত কেবল।
আনন্দে প্রণয়াবেশে, কোমল দলেতে বসে
করিতাম পান সুখে সুধা অবিরল,
কেমনে সে ফুল মম হইল নির্মূল?

কেন যে ফুল শুকায়; মিলনের ঔজ্জ্বল্য বিরহের অন্ধকারে ঢাকিয়া আসে, প্রেম বারে বারে ব্যর্থ হয়—অনাদি কাল ধরিয়া প্রণয়ী-প্রণয়িনীর উদ্গত-অশ্রু নয়নে এই উত্তরহীন ব্যাকুল প্রশ্নই ফুটিয়া উঠে! অবশেষে 'উত্তর' কবিতায় এই গভীর সংশয় নিরসনের জন্য যে অবস্থা কাম্য বলিয়া মনে হয়, তাহা—

উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে
অস্ত যাক শেষ-তারা
হক সব অন্ধকার।

তবু উত্তর বুঝি মিলিল না, প্রশ্ন থাকিয়াই গেল। ব্যর্থতাই যদি প্রেমের চিরন্তন পরিণাম, অশ্রুজলই যদি শেষ সম্বল,—তবে মানুষ ভালবাসে কেন? 'কেন ভালবাসি' কবিতায় তাহার যে উত্তর পাই, তাহা যেন শুধু (পূর্বোক্ত 'কি লিখিব' কবিতার) "ভালবাসা তরে ভালবেসেছি তোমায়" নহে, এ রহস্য পারস্পরিক অনুরাগের দুর্গম অতলতায়, দুটি হৃদয়ের স্তম্ভিত মৌনতায়, আর আত্মরতির নিগূঢ় সম্ভোগে,—

কেন ভালবাসি প্রিয়ে বলিব কেমনে,
কোথা আমি কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি।

সত্যই তো এই পারস্পরিক বিরহের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমির দুস্তর ব্যবধান, Matthew Arnold বুঝি ইহাকেই বিশ্বব্যাপী মানবাত্মার বিরহরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন সমুদ্রের উপমায়—

Yes! in the sea of life enisl'd,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.''

নবীনচন্দ্রের চোখে 'আমি' ও 'তুমির' মধ্যকার এই মরুভূমি হইল বাস্তব সংসার—

নির্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর !

এই নিগূঢ় কথাই তো পরে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে—

সমাজ সংসার মিছে সব,

*   *   *

হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব ॥[১৫]

'স্বপ্ন উন্মত্ততা' কবিতাটিকে fantastic বলা যাইতে পারে। কবি স্বপ্নে এক পরমা সুন্দরী নায়িকার আবির্ভাব ও তৎসহ মিলন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণয়াবেগে উন্মত্ত ; এবং সেই সঙ্গে সমগ্র কবিতাটিও প্রায় অসংলগ্ন অবান্তর প্রলাপে পরিপূরিত, ভাবকেন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত। তবু তাহাতে সুপ্তিলীনা নারীসৌন্দর্যের বর্ণনাটুকু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়—

মুক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা-উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,
অস্তগামী পূর্ণশশী সিন্ধু-নীলিমায়।

'কি করি' কবিতাটিতে প্রণয়-ব্যর্থতা থাকিলেও প্রণয়িনীকে উপলব্ধি করিবার এবং একদা-সার্থক প্রেমের মূল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হইবার মত সুস্থিরতা দেখা দিয়াছে, তাই প্রেমের জন্য গৌরববোধও এখানে স্বাভাবিক—

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার,
যা দিয়াছি অতি ক্ষুদ্র ;
যা পেয়েছি সে সমুদ্র ;
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ, প্রেয়সী আমার
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার।

'কেন দেখিলাম' কবিতাটিতে যৌবন-উন্মত্ততাপ্রসূত মিলন বাস্তবতার স্থূলরূপে পর্যবসিত হইয়াছে ; কিন্তু 'যাই' কবিতায় প্রণয়িনীর নিকট হইতে প্রণয়ীর বিদায়গ্রহণকালে যে মিলনের সুখস্মৃতি অন্তর মথিত করিতেছে তাহাতে

সম্ভোগের কথা থাকিলেও বাসনার প্রগাঢ়তার প্রকাশ অনেকটা শোভন ও সংযত,—

সেই সুখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,
থেকে থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর,
মদালস চারি চক্ষু স্থির সম্মিলন,
নয়নে নয়নে কথা,—সঙ্গীত সুন্দর।

'প্রত্যাখ্যান' কবিতাটির রচনা দুর্বল, মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর পয়ারে মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। তবু এই একটিমাত্র কবিতায় বায়রণের অনুরূপ নারীপ্রেমে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। প্রণয়িনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর চকিত জীবনাবসান অতি-নাটকীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমলীলাক্ষেত্র নদীকূলে তাহার সমাধির উপর—

মুদ্রিত রয়েছে বক্ষে কঠিন প্রস্তরে—
'রমণী প্রণয় লেখে জলের উপরে।'

এই যে ছলনাময়ী নারীর অস্থির চঞ্চল প্রেম—ইহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ ইঙ্গিত পাই বায়রণের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায়, নবীনচন্দ্রে তাহার প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে—

Fondly we hope 't will last for aye,
When, lo! she changes in a day.
This record will for ever stand,
"Woman, thy vows are traced in sand".

'একদিন' নামক ভিন্ন ধরণের সুন্দর কবিতাটির কথা বলিয়া প্রেম-কবিতার প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইহা দাম্পত্য-প্রণয়ের বিজয় সঙ্গীত। মনে হয়, নবীনচন্দ্রের নিজেরই পরিতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের সুখচ্ছবি যেন এখানে গাঁথা হইয়া আছে। ক্ষুদ্র-পরিসর জীবননাট্যের নায়ক বাঙ্গালী কর্মচারী দিবাবসানে গৃহপ্রত্যাগত হইয়া প্রতীক্ষমানা প্রেমব্যাকুলিতা পত্নীর যে স্নেহ-পরিচর্যায় অভিষিক্ত হয়, গ্লানিময় জীবনে তাহার তুলনা কোথায়?

হায়! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর
কত বাঙ্গালির সুখ, মূর্তিমান চিরদুঃখ,
দেখে সদা, মসিজীবী হতভাগা নর
সারাদিন খেটে যবে ফিরে আসে ঘর।

তুমুল ঝটিকাশেষে কূলে আগমন,
শান্তি সমরের শেষ, শ্রমশেষে নিদ্রাবেশ
নহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন
দুঃখী বঙ্গবাসীদের প্রিয়া-সংমিলন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' (১৩০০ সাল) কবিতার বর্তমানে বর্জিত যে অংশে "কেরানী-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা"[১], তাহার সহিত নবীনচন্দ্রের এই 'একদিন' কবিতার তুলনা করা চলে।

নবীনচন্দ্রের প্রেমকবিতাসমূহের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করিতে গেলে বলিতে হয়—প্রায় সমস্ত কবিতাই উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে পরিপূরিত ; সংযমের অভাব নবীনচন্দ্রের কবিতার স্বাভাবিক ধর্ম হইলেও গীতিরসকল্পনায় তাহারা যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই আলোচনার উদ্ধৃতি-সমূহ হইতেই বোঝা যাইবে। ব্যর্থপ্রেমের হতাশা প্রায় প্রতি কবিতায় তীব্রভাবে ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার মূলও নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের প্রণয়-ঘটনার মধ্যে প্রোথিত বলিয়া মনে হয় ; অকারণ রোমান্টিক হইবার আগ্রহ যদি উহার পশ্চাতে থাকিত তবে কৃত্রিমতা অবশ্যই ফুটিয়া উঠিত। নবীনচন্দ্রের কবিতায় ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু আন্তরিকতাও বিদ্যমান। বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যক্তি-উদ্দিষ্ট প্রেম-কবিতার বিরলতার মধ্যে তাঁহার কবিতা সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রিয়-সচেতন (sensuous) কবিতা পরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতির হাতে অপূর্ব গীতিসুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিলেও নবীনচন্দ্রে তাহার প্রথম প্রকাশরূপ প্রশংসনীয়।

প্রেমের কবিতায় যেমন নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতি ও বাসনার প্রগাঢ়তা অতি স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যও কতকগুলি কবিতায় ভাষা পাইয়াছে। এমন কি, এই ব্যক্তি-সম্পর্কের স্পর্শ বহু পরে তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'অমৃতাভ' কাব্যেও লাগিয়াছে, উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবি উহা গোপন করিতে পারেন নাই। কাজেই গীতিকবিতার মন্ময়রূপে তাহা স্বচ্ছন্দেই ব্যক্ত হইবার কথা।

প্রথম কবিতা-প্রকাশের কালে লেখা 'পিতৃহীন যুবক' নামক করুণ-রসাত্মক সুদীর্ঘ কবিতাটির নায়ক নবীনচন্দ্র নিজে। "আমিই সেই পিতৃহীন

যুবক, এবং আমার হৃদয়ের রক্তে ও নয়নের অশ্রুতে…উহা লিখিত হইয়াছিল।"[১৮] নবীনচন্দ্রের পিতৃমাতৃভক্তি ছিল অত্যন্ত গভীর, পিতার মহানুভবতা ও উন্নত চরিত্রের কথা তিনি আত্মজীবনীতে শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাই এই কবিতায় পিতৃবিয়োগে ব্যক্তিগত দুঃখ, মাতা-ভ্রাতা-পত্নীর অসহায়তা—সমস্তই অকপটে করুণ গম্ভীর সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র দুইটি চরণে পিতৃশোকের প্রগাঢ়তার ছবি ফুটিয়াছে বড় সুন্দর—

তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধি-মন্দির।

একদিকে দুঃখে হতাশায় কিশোর বালক মুহ্যমান, স্বাভাবিকভাবেই তখন দুর্বল মুহূর্তে আত্মহত্যার সংকল্প জাগে; আবার অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসে শক্তিমান বালক মাথা তুলিয়া জানায়—

নাহি কি ধৈর্যের অস্ত্র হৃদয় ভাণ্ডারে?
যুজিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুণ কবিতাটিতে আন্তরিকতার স্পর্শ লাগিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে নবীনচন্দ্র এইরূপ সংগ্রাম করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাই কবিতার শেষে উক্ত আত্মপ্রত্যয় কবিচিত্তের বলিষ্ঠতাই সূচিত করে। তথাপি অহেতুক দৈর্ঘ্যের দরুণ অবান্তর নাটকীয়তার অনুপ্রবেশে শেষ পর্যন্ত কবিতাটির অন্তর্নিহিত আবেদনটুকু যেন কতকটা তরল হইয়া গিয়াছে। দীনবন্ধু মিত্র সত্যই বলিয়াছিলেন—"কল্পনা যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছে, ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিলে একটি অপূর্ব কবিতা হইবে।"[১৯] 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনীর' ন্যায় এই কবিতার ভাষা-ছন্দও মধুসূদনের অনুসারী।

দুঃখের সহিত সংগ্রাম-সংকল্প তখনও যে দ্বিধা-দুর্বলতায় বারে বারে বিচলিত হইতেছে, তাহার প্রমাণ 'হতাশ' কবিতাটি। ইহাই তখন সহায়-সম্বলহীন যুবকের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, কেননা পরিপূর্ণ সুস্থিরতার জন্য সময়ের পরীক্ষা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে আশা-নৈরাশ্যের আলোছায়ালীলা তো চলিবেই।

বিষাদ-জলদরাশি আসি আচম্বিতে
ঢাকিয়াছে আশা যত দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়,
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে?

'ভগ্নাশ বিদেশী' কবিতায়—'জননী-বিরহে যার দহিছে হৃদয়', সেই অভাগার কাতর ক্রন্দন। 'শশাঙ্ক-দূত' কবিতায়ও সেই অভাগার দীর্ঘশ্বাস, যাহার—

পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ সুখস্বর্গ অবনীর
ঘুচেছে জন্মের মত।

'একটি চিন্তা' কবিতায়ও দেখি—এমনি দুঃখের দিনে বাল্য-কৈশোরের সুখস্মৃতি গভীর বেদনা পুঞ্জ পুঞ্জ বহিয়া আনিয়া কবির মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'আর কি দেখিব' কবিতায়ও স্বপ্নে সুখস্মৃতি দর্শন—যে স্মৃতি পিতা-মাতা-ভ্রাতা-পত্নী সকলকে জড়াইয়া অস্তিত্বের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। এই স্মৃতি-সূত্রে গ্রথিত কবিতাগুলির মধ্যে 'একটি চিন্তাই' বরং কিছুটা কাব্যরসসিক্ত, অন্যান্য সব মূলতঃ দুঃখের বিবৃতি মাত্র। 'একটি চিন্তার' স্মৃতিচারণে প্রকৃতির শোভাময় রূপই মুখ্য। কবির একান্ত অভিলাষ—'নিরখি প্রকৃতিমূর্তি মনের নয়নে।' কিন্তু তাহা তো সম্ভব নয়, কেননা—'শোকবাষ্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন'। সেই অশ্রুসজল দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিতেছে বাল্যলীলা-স্বপ্নরঞ্জিত জন্মভূমি—

দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণরেখা প্রায়।

* * *

নৈশ আকাশের মূর্তি অমল সলিলে
দেখিতাম কাঁপিতেছে মলয়-অনিলে।
কত শত পূর্ণশশী এলো-থেলো হয়ে
বিরাজিত সুনীলাম্বু-সরিত-হৃদয়ে।

* * *

এবে কাঁদিতেছি বসি দুঃখনদীকূলে।

পিতৃমাতৃস্নেহবঞ্চিত জন্মভূমি-ক্রোড়বিচ্যুত সন্তানের এই ক্রন্দন মর্মস্পর্শী

'নবজীবন' কবিতায় সেই পিতৃমাতৃহীন সন্তান বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিয়া অবশেষে উপলব্ধি করিল—

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার
জনকজননী মম
জাহ্নবী-যমুনা সম

এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন,
এখানে অনন্ত সহ হইল মিলন।

কবির প্রকৃতিগত ভক্তিপ্রবণতায় সহিত চিরন্তন সংস্কার মিলিয়া এই কবিতাটিকে এক ভিন্নতর রস-সার্থকতা দান করিয়াছে, তাই শুধু কাব্যরস অন্বেষণ এক্ষেত্রে অনুচিত। এই 'মহাতীর্থ' দ্বিধাদুর্বল সন্তানকে সর্বদুঃখজয়ী করিয়া তুলিয়াছে, তাই তাহার প্রার্থনা, 'পিতৃদেব—শিখাও আমায় নব জীবনের গান',—বিশ্বাসনিষ্ঠ জীবনে একান্ত সঙ্গত।

'মেঘনা' কবিতাটি সম্পর্কে নবীনচন্দ্র বলেন—"এই কবিতাটি মেঘনা-তীরস্থিত শিবিরে বসিয়া মেঘনার বাসন্তী-শান্ত বিস্তৃত অনন্ত শোভা দেখিয়া লিখিয়াছিলাম। উভয় কবিতাই (অপরটি 'কীর্তিনাশা') পুত্রশোকাতুরের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত।"[২১] নবীনচন্দ্রের বিবৃতিতেই সুস্পষ্ট,—মেঘনার শোভা সন্দর্শন এখানে উপলক্ষ্য মাত্র; লক্ষ্য মানবজীবনের দুঃখময়তা, বিশেষতঃ স্নেহাসক্ত প্রৌঢ় কবির সংগ্রামরত জীবনের বেদনা-ক্ষতের তীব্র জ্বালা মেঘনার স্রোতধারায় প্রশমিত করিবার বাসনা,—

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার,
জানু পাতি মেঘ্‌না তীরে ডাকি আমি অশ্রুনীরে,
এবে দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন,
দেও দিনেকের শান্তি,—মেঘনা মতন।

এখানে সংগ্রাম-বিক্ষত ব্যর্থ জীবনের সমস্ত হতাশা যেন মুহূর্তে গভীর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

'কীর্তিনাশা' সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—"যাঁহার কীর্তিকলাপ নাশ করিয়া 'ভীষণং ভীষণসং' এই স্রোতস্বতীর নাম 'কীর্তিনাশা' হইয়াছে, রাজবল্লভের সেই রাজনগরে শিবিরে বসিয়া 'কীর্তিনাশা' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম।"[২২] কীর্তিনাশা যেন মহাকালস্রোত, নির্মম নিয়তির মত দুর্বার নিষ্ঠুর, শক্তিসম্পদ-গর্বী প্রতিষ্ঠালিপ্সুদের নিকট যেন 'কীর্তিনাশা ভীষণ শিক্ষক'। কবির সতর্ক সাবধানবাণী কীর্তিনাশার ভীষণ প্রকৃতিকে আরো ভীষণতর করিয়া তোলে—

লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্তির শ্মশানে,

দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে
তাহার অদৃষ্টলিপি ;

কিন্তু পুণ্যব্রত কীর্তিময়ের প্রকৃত কীর্তি লোপ করা কীর্তিনাশার সাধ্যাতীত। পার্থিব কীর্তির নশ্বরতা এবং অমরতার গভীর তত্ত্ব এই কবিতায় প্রগাঢ় আবেগে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল বক্তব্য আরও গভীরে, কবির বেদনাদীর্ণ অন্তরে; কেননা পূর্বেই বলিয়াছি—এই 'কীর্তিনাশা' কবিতাও 'পুত্রশোকাতুরের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত।' 'মেঘনা' কবিতার শেষে যে হতাশা ও ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই কবিতায় কিন্তু তাহা মিলে না। এখানে সর্বরিক্ততার সজ্ঞান অনুভূতি যেমন আছে, তেমনি পূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণও আছে ;—

আমি কীর্তিহীন নর ; না ডরি তোমায়,
তব সংহারক মূর্তি ধর কীর্তিনাশা!
তব ভগ্নতীরে ওই মূল-শূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহার ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম,
নিষ্ফল জীবন মম,............
দয়া করি কীর্তিহীনে নেও ভাসাইয়া।

এই একটিমাত্র কবিতা ব্যক্তি-বেদনার সহিত জড়িত থাকিয়াও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশরূপ লাভ করিয়াছে; কেননা এখানে নশ্বরতার ধারণাও যেমন সর্বজনের উপলব্ধিগোচর, তেমনি অকিঞ্চনতার বেদনাও বিশ্বব্যাপী। পুত্র-শোকাতুর কবি যেন প্রচ্ছন্ন, কীর্তিমান ও কীর্তিহীন মানবই এখানে নিয়তিলীলার ক্রীড়নক।

যাহা হোক, ব্যক্তি-সম্পর্কিত এই কবিতাগুলিতে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব আশা করা যায় না। ইহারা তো এক হিসাবে বেদনাবিক্ষত হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং বিবৃতির আন্তরিকতাই এখানে বিবেচ্য। আর সেই সূত্রে যে বিশেষ ব্যক্তিটির হৃদয়-কপাট আমাদের কাছে খুলিয়া গেল, তাহার অন্তরঙ্গ সঙ্গলাভই এই কবিতাবলী পাঠের সার্থকতা।

ব্যক্তিগত কবিতাসমূহে জীবনের প্রতি যে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও এই আশা-নৈরাশ্যে দোলায়িত ভাবাবেগই সব সময় গীতিকবিতার উপজীব্য

হইয়া আছে। সুস্থির কবি অবশ্য তাহাকে শান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিতে পারেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রে সেই স্থৈর্যের অভাব ছিল, আবার এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ের অবস্থাও বিবেচ্য।

কিন্তু এই সময়ে কবির মনোজগতে শুধু যে নৈরাশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল, তাহা নহে,—জন্মভূমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-কল্পনায় কবির আনন্দ-উন্মাদনা এবার উৎসারিত হইতে লাগিল, তাঁহার অনন্ত আশাবাদ হইতে। 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য' কবিতায় স্বদেশের কৃতী সন্তানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কবির উক্তি লক্ষণীয়—

ঈশ্বরের পুত্র তোরা কারে তবে ডর,

* * *

উঠুক সত্যের ধ্বজা গগন উপর।
এ হেন সংগ্রামে যদি হারাও জীবন,
পূর্ণ আলোকেতে সখে! পশিবে তখন।

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের অন্যতম উদ্গাতা নবীনচন্দ্র 'অবকাশ-রঞ্জিনীতেই' স্বদেশের দুরবস্থার জন্য যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, তাহার উচ্ছ্বাস-ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। যে-কোন ঘটনা বা চিন্তার সূত্রে নির্বিচারে দেশের হীনতার জন্য বেদনা ও বিলাপ পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক' কবিতাটি উল্লেখ্য। কবিতাটির পরিকল্পনায় (স্বদেশ ও সমাজের হীনতায় এক দরদী যুবকের জীবন-ত্যাগ যাহার বিষয়বস্তু) হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' ছাপ আছে। তবে 'চিন্তা-তরঙ্গিণীর' নায়কের চিন্তাপ্রবাহ অসংবদ্ধ, উহা কিছুটা তাহার দুঃখবাদী মনের সৃষ্টি; তাই তাহার আত্মত্যাগ-সংকল্পেও সমস্যার গভীরতা সুস্পষ্ট হয় নাই। নবীনচন্দ্রের এই কবিতায় দেখি—মুমূর্ষুর চিন্তা মূলতঃ যুবক নবীনচন্দ্রেরই অধ্যাত্ম-সমস্যা। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস ও ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণ তাঁহাকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতেছে, আবার 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর যতেক যন্ত্রণা'—তন্মধ্যে প্রধান 'প্রাণে নাহি সয় অধীনতা', ও 'স্বজাতির হীনাবস্থাও' তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে, এই সমাজ-সচেতন মনোভাব লইয়া যে যুবক গভীর বিষাদে উপলব্ধি করিতে পারে—

জান না কি বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল,
খুলিবে আমার আজি স্বাধীনতা-দ্বার।

সে মুখ্যতঃ নবীনচন্দ্রই, কিন্তু তখনও সমস্যাবোধ আছে, সমাধান উপায় জানা নাই; তাই নৈরাশ্য। নৈরাশ্যের এই অপরিণত অভিব্যক্তি হেম-নবীন উভয়েরই কবিতাদ্বয়কে অতি নাটকীয় করিয়াছে।

'সায়ংচিন্তা' কবিতায় বাস্তববোধহীন আনন্দমুখর শৈশবসুখের অবসানে যৌবনের যে অনিবার্য দুঃখপরিণতির কথা বলা হইয়াছে, সে দুঃখ কবির মতে পরবশ্যতাসঞ্জাত, নবপ্রবর্তিত বিদ্যা এদেশে শুধু দাসই সৃষ্টি করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য-চেতনা এই দাসত্ববোধ সম্পর্কে আমাদের চিত্তে এক দুঃসহ জ্বালাও ধরাইয়া দিয়াছে, সেই বেদনা-সংক্ষোভে আমরা আত্মধিক্কারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। নবীনচন্দ্র তাহাকে ভাষা দিয়াছেন—

ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম, আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়; আর্যবংশ-কীর্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

এই কবিতাটির সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল' কবিতার ভাব ও ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির সাধারণ প্রভাব থাকিতেও পারে। তবে হেমচন্দ্রের কবিতায় পদ্মের মৃণালের আন্দোলনের সহিত বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশসমূহের উত্থান-পতন যুক্ত করিয়া সেই সূত্রে ভারতের পতনের জন্য আক্ষেপ করা হইয়াছে। তাই কবির 'ভারত-রোদনের' সঙ্গেই শুনি—'তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।' কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই ইতিহাস-সচেতনতায়, যদিও কবির ভারত-বিবেক উত্তাপহীন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিতায় শুধু মাত্র ভারত-গৌরব লাঘবের জন্য বিলাপের একমুখীপ্রবাহে যে আবেগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার তীব্রতা অধিক, জ্বালা দুর্বিষহ; তাই কঠোর আত্মধিক্কার—'শুকের কোটরে যত সালিকের দল?' কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস তখনও প্রবল নহে বলিয়াই হয়ত কবি আবেদন-নিবেদনই দুঃখমোচনের পথ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—

রাণী যিনি, কহ তাঁরে এসব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত-রোদনে।

'ডিউক অব এডিনবরার প্রতি' কবিতায়ও যুবরাজের নিকট প্রায় অনুরূপ প্রার্থনা। তবে কি কবির স্বদেশচিন্তায় কোন দ্বিধা বা দুর্বলতা ছিল? অস্থির বেদনা-উচ্ছ্বাসে কবি কি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন—অন্তরের গোমুখী হইতে উৎসারিত শক্তিই হীনবীর্য ব্যক্তিকে বাহিরের ও ভিতরের বন্ধনমোচনে ব্রতী করে, অপরের আশ্রয়-ভিক্ষা তাহাকে আত্মদৈন্যে ধিকৃত করে মাত্র? বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা দেখিব—নবীনচন্দ্রের মানসপ্রকৃতি মূলতঃ আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, বীরধর্মে দীক্ষিত। কিন্তু সে যুগের স্বদেশ-চেতনায় কখনো কখনো প্রতিবাদ-আন্দোলনের ঢেউ উঠিলেও বিদেশী-শাসক সম্পর্কে এবং আমাদের পরবশ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে একটা দ্বিধার ভাব যেন বরাবর চলিয়া আসিতে-ছিল। তখনকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও ইংরেজশাসনের তাৎপর্য সম্পর্কে মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই দেখি—১৮৬৮ সালে বেথুন সোসাইটির সভায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যখন মনে করেন যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ না করিলে ভারতের কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই; তখন নবগোপাল মিত্রের মত এই যে, ভারতবাসীকে জাগ্রত করার জন্য ইংরেজ শক্তির অবস্থান কিছুকালের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।[২২] জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) বহুকাল পরেও আবেদন-নিবেদন এবং প্রতিরোধ সমান তালে চলিতেছিল। সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে সাহিত্যে জাতীয়-চেতনার প্রধান উদ্যোক্তা বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—সকলেই কিয়ৎপরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভাষায়—"তখন বাঙ্গালী মেয়ের 'ধুঁয়ার ছলনা করি' কাঁদার মত বাঙ্গালী কবি দেশাত্ম-বোধের কথা বলিতেছেন—তবে সে ছদ্মবেশ পরাইয়া ও রাখিয়া ঢাকিয়া।"[২৩] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'এডিনবরার প্রতি'-র মত দ্বিধা-মনোভাবযুক্ত কবিতায়ও নবীনচন্দ্র স্বদেশ ও স্বজাতির যুগনিরুদ্ধ মর্মবেদনা প্রকাশ না করিয়া স্বস্তিবোধ করেন নাই। রাজভক্তিস্রোতে প্রবাহিত এই দেশের অন্তরে অন্তরে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হইতেছে তাহার সত্যস্বরূপ তো এই—

> আমার এমন কিন্তু অদৃষ্টের ফল,
> হিমাদ্রি মাথায়, পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

নিম্নের বর্ণনা যে কবিত্বহীন বিবৃতিমাত্র, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সমগ্র দেশের বেদনা-বিদীর্ণ হৃদয়ের ছবি কি তাহার মধ্যে নগ্নরূপে ফুটিয়া উঠে নাই?

হয়েছে কঙ্কাল শেষ যাতনা বিষম।
শূন্য মম রাজকোষ ; দীন প্রজাগণ,
কর-করাঘাতে প্রায় কণ্ঠস্থ জীবন ;
কি দেখিতে ভ্রাতৃবর আসিলে এখন ?
ছিল যে ভারতভূমি কুবের-ভাণ্ডার,
এখন দুর্ভিক্ষ বিনা কথা নাহি আর।

ভারতরাজ্যের তত্ত্ব, ভারত সন্তান
পুঙ্খ অনুপুঙ্খভাবে বুঝিবে যেমন,
বিদেশী বুঝিবে কি সে সেই পরিমাণ ?
তথাপি মায়ের আহা ! বিচার এমন,
তাহাদের করে মম অদৃষ্ট অর্পণ—
শার্দূলের ইচ্ছামত মেষের শাসন।

বলা প্রয়োজন, উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের,[২৪] এবং উচ্চতর শাসনকার্যে ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের[২৫] সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বঙ্গীয় কবিদের অনেকে প্রশস্তি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।[২৬] তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের 'ভারত-ভিক্ষা' এবং নবীনচন্দ্রের 'ভারত-উচ্ছ্বাস' উল্লেখযোগ্য। উহা রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।[২৭]

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উক্ত কবিতাদ্বয় তুলনায় আলোচ্য। হেমচন্দ্রের কবিতাটি পূর্বে রচিত। স্তবক বিভাগে ব্যতিক্রম ব্যতীত উভয় কবিতার ছন্দসাদৃশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। অতি দৈর্ঘ্যের জন্য হেমচন্দ্রের কবিতাটি শ্লথবদ্ধ, পুনরুক্তিবহুল এবং কাব্যোৎকর্ষে খর্ব হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাতে ভারতবাসীর পরবশ্যতাজনিত দুঃখ যদিও নিম্নোদ্ধৃত স্তবকে শ্লেষোক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,

আহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পুজি সবারে।

তথাপি কবিতাটির 'ভারত-ভিক্ষা' নামকরণের সহিত উহার মূল সুরের যেন সঙ্গতি রহিয়াছে,—এবং সে মূল সুর হইল স্তুতি, অভিভূত ভারতবর্ষের দৈন্যসূচক প্রার্থনা—

আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

কবিতাটির মধ্যে পূর্বোক্ত দ্বিধা-দুর্বলতা যেন স্বতঃ প্রকাশিত। সম্ভবতঃ এই কারণেই ডাঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন—" 'ভারত সঙ্গীত' লিখিয়া হেমচন্দ্র দেশের রাজশক্তির কাছে যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা 'ভারতভিক্ষা' লিখিয়া ক্ষালন করিতে হইল।"[১৮]

নবীনচন্দ্রের কবিতাটি 'ভিক্ষা' নহে, 'উচ্ছ্বাস'। নামকরণেই তাহার উদ্গীর্ণ অন্তর্জ্বালা পরিস্ফুট। পরিমিত দৈর্ঘ্যের আবেগময় এই কবিতাটিতেও আনন্দোচ্ছ্বাস আছে, হেমচন্দ্রের কবিতার মত ঐতিহ্যগৌরবও আছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর ভিতর হইতেই পুঞ্জিত ক্ষোভ যেন গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের কথা যেমন নিম্নোদ্ধৃত স্তবকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে –

তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা! কি রয়েছে আর!
ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে 'মেন্‌চেষ্টার';
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে 'লিবরপুলে' লবণ তাহার।

তেমনি বৃটিশ-শক্তিছায়াতলে থাকিয়া ভারতের শক্তিহীনতার গ্লানিও মর্মান্তিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে অপর অংশে—

হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?

হেমচন্দ্রের কবিতায় অতীতের জন্য শোচনা প্রাচীন হিন্দু-ঐতিহ্যকেন্দ্রিক, কিন্তু নবীনচন্দ্র বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন নাতিদূরবর্তী অতীত-শৌর্যের কথা, মহারাষ্ট্র-শিখ বীরত্বের কথা।

'সায়ংচিন্তা' কবিতায় ঐতিহ্য-সচেতনতাপ্রসূত দাসত্বগ্লানিবোধ যে ক্ষুব্ধভাষায় প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি, 'আর্যদর্শন'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'আর্যদর্শন' কবিতাটিতে সেই আত্মধিক্কার আরও কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে—ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিবৃন্দের গবেষণায় সে যুগে আর্যসভ্যতার যে সর্বাঙ্গীণ গৌরব কীর্তিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের জাতীয় চেতনায় নূতন শক্তি ও মনোবল সঞ্চারে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। যদিও সে গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া বর্তমান হীনতাকে ভুলিয়া থাকিবার মত শম্বুকবৃত্তি আমাদের মধ্যে কিছুটা দেখা দিয়াছিল—যে মনোভাব 'আর্যামি' বলিয়া নিন্দিত—নবীনচন্দ্র সেই শূন্যগর্ভ আর্য-অভিমানের আড়ালে আশ্রয় লইতে চাহেন নাই; বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার উপযোগিতাও বুঝিতে চাহিয়াছেন।—

এই নহে আর্যাবর্ত;
আমরাও নহি সেই আর্যের কুমার;
তাহাদের বীর্যবল
ছিল যেন দাবানল;
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার;

* * *

তেজোহীন, বীর্যহীন,
ততোধিক পরাধীন;
আমাদের—হায়! কোন্ পাপের এ ফল?
করে ভিক্ষা-পাত্র—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

আবার কেবলমাত্র এইরূপ তীব্র আত্মধিক্কারেই নবীনচন্দ্র সমস্ত অন্তর্বাষ্প নিঃশেষ করেন নাই; নবজাগ্রত জাতির মধ্যে যুগের নূতন শক্তির

উদ্বোধনও প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'চিহ্নিত সুহৃদ' (Covenanted friend) কবিতায় বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতী বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহচর্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!

এই তিরস্কারের মধ্য দিয়া শক্তিবীর্যের জন্য যে ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তীব্রতা অনন্যসাধারণ, এবং উহাই আবার প্রচণ্ড আশাবাদে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে পরবর্তী অংশে। এইখানে জাতীয় গৌরবের পুনরুজ্জীবন-স্বপ্নে বিভোর কবি যেন বহুকাল পূর্বেই পরাধীন ভারতের বীরসন্তান চিরঞ্জীব সুভাষচন্দ্রের ভাবী অক্ষয়কীর্তি ভাবনেত্রে দ্রষ্টার ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

হবে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত-তনয়
শিখি রণনীতি, করি বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয়?
সেই দিন যেই জয়-জয়-ধ্বনি
তুলিবে ভারত, আনন্দে বিহ্বল,
শুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
হিমাদ্রি চঞ্চল, সমুদ্র অচল।

সুভাষচন্দ্রের উচ্চারিত 'জয়হিন্দ্' মন্ত্র কি করিয়া অন্ততঃ সত্তর বৎসর পূর্বের জাতীয়-কবির 'জয়-জয়-ধ্বনি তুলিবে ভারত' বাণীর সহিত এমন সুন্দর মিলিয়া গেল?

এইজন্যই পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি—নবীনচন্দ্রের মানস-প্রকৃতি মূলতঃ আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ, বীরধর্মে দীক্ষিত। এই বীরাচারী কবির চারণ-সঙ্গীতের

ব্যর্থতার কথা যেমন গভীর বেদনায় প্রকাশিত হইয়াছে 'আমার সঙ্গীত' কবিতায়:

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর সঙ্গীত আমার?
কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর?

তেমনি আবার সেই কণ্ঠ হতাশায় স্তব্ধ না হইয়া এই সুপ্ত জাতিকে ভস্মশয্যা হইতে ফিনিক্স পাখীর মত পুনর্জীবিত করিবার জন্য আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখি—'শবসাধনা' কবিতায় তান্ত্রিক শক্তিপূজার আদর্শকে দেশমাতৃকাপূজায় রূপান্তরিত করিবার মত কল্পনাশক্তি ও অন্তর্বল একমাত্র নবীনচন্দ্রেরই আছে। এই মাভৈঃ মন্ত্রের শক্তিদীপ্ত আহ্বান তাঁহারই কণ্ঠনিঃসৃত:

ভারত-সন্তান! দেখনা মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার
সদ্য উষ্ণরক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

অতঃপর 'অশোকবনে সীতা' নামক সুন্দর কবিতাটির কথা উল্লেখ করিয়া দেশপ্রীতিমূলক কবিতার প্রসঙ্গ শেষ করিব। কবিতাটি নবীনচন্দ্রের নবপুরাণ সৃষ্টির (New myth-making) নিদর্শন। ধারণাটি মূলতঃ মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ হইতে গৃহীত, উক্ত কাব্যের ভাষা এবং ছন্দও এখানে সুন্দরভাবে অনুসৃত। কিন্তু দেশপ্রেমোদ্দীপক অন্যান্য কবিতায় যে প্রচারাত্মক স্পষ্টোক্তি আছে, তাহা এখানে এক প্রচ্ছন্ন রূপকে আত্মগোপন করিয়াছে, তাই কাব্যগৌরবে এই কবিতাটি সমৃদ্ধ। প্রারম্ভে রাত্রি-বর্ণনায় চমৎকারিত্ব আছে:

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম-মালায়

উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির-নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব-চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।

চিন্তাপ্রবণ কবির যেন মনে হইল :

এমন সময়ে সুপ্ত কনক-লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিলা অশোকবনে সীতা অভাগিনী।

ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রামগ্ন কবি স্বপ্নে যেন দেখিলেন—'রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ-লঙ্কা জিনি' তাঁহার মাতৃভূমি, শোভায়-সম্পদে গরীয়সী। কিন্তু সেই লঙ্কাসদৃশ পুরীর 'অমৃত-ফল বানরের করে হইল নিঃশেষ।' চারিদিকে আনন্দময় শান্তির স্তব্ধতা ; তবু তাহার মধ্যে দেখা যায় :

অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী
একটি রমণীমূর্তি করিছে রোদন।
কতকাল রমণীর নয়নের জল
ঝরিয়াছে, কে বলিবে ?

গভীর দুঃখে কবি সেই নির্যাতিতা রোরুদ্যমানা বিষাদমূর্তির পরিচয় লাভ করিলেন :

'দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী।'

দেশ-জননীর এই বন্ধনজর্জরিত বেদনা-ক্লিষ্ট রূপ করুণার রসে হৃদয় ভরিয়া দেয়। এখানে উত্তেজনার উত্তাপ নাই, উপলব্ধির স্নিগ্ধ গভীরতা আছে।

নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতিমূলক কবিতাসমূহ সম্পর্কে একটি কথা সুস্পষ্ট বলিতেই হয় যে, তাহাতে. যথার্থ কবিত্বের স্পর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাগে নাই। একথা হেমচন্দ্রের অনুরূপ কবিতাসমূহ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাহার কারণ উহাদের রচনা কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক ; সুতরাং উচ্চকণ্ঠ প্রচারণা তাহাতে যতটা উত্তাপ সঞ্চার করিয়াছে, ততটা ঔজ্জ্বল্য আনিয়া দিতে পারে নাই। আবার সেই জাতীয়-জাগরণের মুহূর্তে সুস্থির কাব্যকলা প্রকাশ হইতেও বড় লক্ষ্য ছিল—অন্তর্বেদনার উদ্গিরণ, দেশবাসীর স্তিমিত চিত্তে স্বদেশাভিমান ও মুক্তি-কামনার উদ্বোধন। এই উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে

সিদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ—উক্ত কবিতাসমূহের তৎকালীন সমাদর। উচ্চ রাজকর্মচারী হইয়াও নবীনচন্দ্র যে সেই আলোড়নের কালে জাতির ভাব-নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার বন্ধন-অসহিষ্ণু চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা-বিশ্লেষণকালে সেই উদ্বেগের প্রচণ্ডতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'ভারত-সঙ্গীত' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি ব্যতীত হেমচন্দ্রের অন্য কোন কবিতায় এই অন্তর্দাহের দুঃসহ বহ্নি দীপ্যমান হইয়া উঠে নাই। তাহার কারণও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষায় বলিতে হয়: "হেমচন্দ্রের দেশভক্তি কখন রৌদ্ররসে ফুলিয়া উঠে নাই। সেই দেশভক্তি শান্ত, করুণ—বীররসে মাখান।"[১] নবীনচন্দ্রের এই উদ্দাম আবেগের সহিত একালের নজরুল ইসলামের উদ্দীপনাময় কবিতাসমূহের তুলনা করা চলে। তাহারাও উচ্চকণ্ঠ, অনলোদ্গারী, পৌরুষপ্রদীপ্ত এবং সেইসঙ্গে কাব্য-সৌন্দর্যে ন্যূন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক কবিতাতেই কাব্যমহিমা এবং স্বদেশ-গরিমার অপূর্ব-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, অস্থির অন্তর্জ্বালা সেখানে সুস্থির মর্মোপলব্ধিতে সমাহিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবও জাতীয় জীবনে নিগূঢ়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে জাতীয় চেতনাও যেমন গভীর অন্তর্মুখী এবং স্থিরলক্ষ্য হইয়া আসিয়াছে, তেমনি তাঁহার ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে স্বদেশও বহুপ্রসারিত এবং মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কালে জাতীয় ভাবদৃষ্টিও যেমন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী হইয়া উঠে নাই, তেমনি 'অবকাশরঞ্জিনী'র খণ্ডকবিতার রচয়িতা নবীনচন্দ্রও ছিলেন ভাবাবেগোচ্ছল মুক্তিপ্রবণ অস্থির যুবক কবি। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই নবীনচন্দ্রের উক্ত কবিতাসমূহের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। 'অবকাশরঞ্জিনী'র বিক্ষিপ্ত স্বদেশোন্মাদনাই পরে ইতিহাস ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ়মূল হইয়াছে 'পলাশির যুদ্ধে' এবং 'রঙ্গমতীতে'।

এই মুক্তপ্রাণের উন্মাদনাই কবিচিত্তে মানুষ ও তাহার সভ্যতার কৃত্রিমতা সম্পর্কে বিরূপতা জাগাইয়া দিয়াছে। কবি মানুষের সৌহার্দ্যে হাসিয়া কাঁদিয়া কখনো একাকার, কখনো বা সমাজ-সংসার হইতে প্রাপ্ত নিন্দা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় মর্মপীড়িত। তখন তাঁহার ক্রোধাবিষ্ট নয়ন হইতে অনল বর্ষিত হয়, সরল আনন্দবিহ্বল কবি তখন ক্ষমাহীন, আপন চিত্তের দৃঢ়তায় তখন তিনি হিমালয়ের মত অটল। 'বন্ধুতা ও বিদায়' কবিতায় রাজকর্মচারী ডেপুটির মুখে তখন দৃপ্তবাণী ঝলকিয়া উঠে:

যারা গৌরাঙ্গের কৃপা-কটাক্ষের তরে
বিশ্বাস, বন্ধুতা সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে মাতা বলিও নিশ্চয়,
এখনও বিপদ তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।
উচ্চতর রক্তস্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।

'গৌরাঙ্গ' কথাটির প্রয়োগই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে শ্বেতদ্বীপ-বাসীরা গ্রহবৈগুণ্যে আমাদের প্রভু হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভে ধন্য হইবার বাসনা এবং তজ্জন্য যে-কোন হীনতা স্বীকারের প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও কম প্রবল ছিল না। কিন্তু সেই যুগে নবীনচন্দ্র তাহাকেই ধিকৃত করিয়াছেন। এই জ্বালাময় শ্লেষোক্তির সহিত বায়রণের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশের সুন্দর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বায়রণও মানুষ এবং সংসারের কাছ হইতে প্রাপ্ত আঘাতে-অপমানে সংক্ষুব্ধ :

Dear Beacher, you tell me to mix with mankind ;
I cannot deny such precept is wise ;

* * *

Yet why should I mingle in Fashion's full hard ?
Why crouch to her leaders, or cringe to her rules ?
Why bend to the proud, or applaud the absurd ?
Why search for delight in the friendship of fools ?

* * *

I have found that a friend may profess, yet deceive.**

উক্ত শেষ চরণে প্রকাশিত প্রতারণার কথা নবীনচন্দ্রের আলোচ্য কবিতায়ও দেখিতে পাই :

বন্ধুত্বে বিপদ তব, প্রণয় নিরাশ,

* * *

হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর উপকার,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদানে তার।

নূতন শিক্ষা-সভ্যতার উপযোগিতা সম্পর্কে সজ্ঞান থাকিয়াও নবীনচন্দ্রের সরলতাপ্রিয় মার্জিত হৃদয় সেই সভ্যতারই নয়ন-বিমোহন আলোকে

কুটিলতার কলুষ ছায়া এবং স্বার্থপরতার ঘৃণ্য রূপ দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ। বাস্তব সংসারের রূঢ়তম আঘাতে জর্জরিত কবির এই ধিক্কার তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক :

বর্তমান সভ্যতার স্বার্থই ঈশ্বর।
প্রাচীনের সরলতা,
তরল সহৃদয়তা,
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
কাঁদি হাসি যাহা করি,
দান ধর্ম দয়া—হরি,
সকলই আমাদের স্বার্থে সপঙ্কিল।

মানুষের এই স্বার্থসর্বস্ব কপট প্রকৃতিতে কবি বিহারীলালও ছিলেন অনুরূপ বিতৃষ্ণ। নবীনচন্দ্রে যাহা শ্লেষোক্তিতে প্রকাশিত, বিহারীলালে তাহাই গভীর বেদনায় ব্যক্ত :

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে।
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা!
কত আরে থাকিবি ধরিয়ে ?[৩১]

সভ্য সমাজের এই কৃত্রিম রূপের সহিত তুলনায় চট্টগ্রামের অসভ্য পার্বত্য মগজাতি জুমিয়ারাও যে কত সরল ও উদার, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে নবীন-চন্দ্রের 'জুমিয়া জীবন' কবিতায়। জুমিয়ারা প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান, তাই প্রকৃতি-তন্ময় হৃদয়ধর্মের কবি নবীনচন্দ্র তাহাদের জীবনে অবাধ মুক্ততা ও আনন্দ অনুভব করিয়া মুগ্ধ ;—তাহাদের বিদ্যার ও বুদ্ধির অহমিকা নাই, ভবিষ্যতের উদ্বেগ নাই, অর্থে অতৃপ্ত লালসা নাই। তাহাদের—

সরল মধুর হাসি,
সরল সৌন্দর্য রাশি,
অকৃত্রিম সরলতাপূরিত জীবন।

জীবনের এই মধুর সারল্যে মুগ্ধ কবি তাই সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে তিরস্কার করিতেছেন :

পশ্চিম সভ্যতা-স্রোত! থাক দাঁড়াইয়া!

* * *

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে,
কলুষিত করি এই গহন কানন,
নাহি কাজ সভ্যতায়
কে বল সভ্যতা চায়,
অসভ্যতা যদি আহা, সুখের এমন!

সভ্যতার কৃত্রিমতা সম্পর্কে অনুরূপ বীতরাগ বায়রণের কবিতায়ও লক্ষ্য করি :

Fortune ! take back these cultured lands,
Take back this names of splendid sound !
I hate the touch of servile hands,
I hate the slaves that cringe around.
Place me among the rocks I love,
Which sound to ocean's wildest roar.[৩২]

'Ocean's wildest roar'-এর আকর্ষণ না হইলেও নির্জন অরণ্য-প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর আশ্রয় ও আশ্বাস আছে, তাহার আকর্ষণ কৃত্রিমতায় বিতৃষ্ণ নবীনচন্দ্রের মত কবি বিহারীলালও অনুভব করিয়াছিলেন :

যা দেখি, সে সমুদয়
শান্তিময়, তৃপ্তিময় ;
অপূর্ব আনন্দোদয়
হয় প্রতিক্ষণে!
ক্ষমতার অত্যাচার,
ঐশ্বর্যের অহঙ্কার,
মিত্রতার কপটতা
নাই এই স্থানে![৩৩]

জীবনদর্শনের এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র—উভয় গীতি-প্রবণ কবির সাদৃশ্য একান্ত স্বাভাবিক। ইহাও এক ধরণের রোমাণ্টিক অনুভব, অপরিচিত অনভ্যস্ত জীবনের মুগ্ধকরী দিকটুকু দর্শনে রোমাঞ্চ-সঞ্চারের রোমান্স, বায়রণেও তাহাই দেখিলাম।

নানা সাময়িক ঘটনা-বিষয়ক কবিতাও নবীনচন্দ্র কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। "নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখায়।......ঈশ্বরগুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর।"[৩১] কবি হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের এই রীতির অনুসরণে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। এই ধরণের কবিতা রচনাক্ষেত্রে তুলনা করিতে গেলে দেখা যায়—সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং উৎকর্ষে নবীনচন্দ্র হইতে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব সমধিক।

বিচিত্রবিষয়ক কবিতাসমূহের মধ্যে 'কে তুমি' কবিতায় 'বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণীর' নিরুদ্ধ হৃদয়-বেদনা সহানুভূতিপ্রবণ কবি নবীনচন্দ্র গভীর কারুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'অবলাবান্ধব' কবিতাটি উক্ত নামধেয় মহিলা মুখপত্রের প্রশস্তি (নারীসমাজের অবস্থা ও উন্নতি আলোচনার জন্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়)। নারী-সমস্যা সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের সচেতনতার পরিচয় উক্ত কবিতায় আছে। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'ও প্রশস্তি কবিতা। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভুবন-মোহিনী দেবী ছদ্মনামে 'সাধারণী' পত্রিকায় যে দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ লিখিতেন, তাহা 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' নামে কাব্যাকারে প্রকাশিত হইলে (১ম ভাগ-১৮৭৫ খৃঃ, ২য় ভাগ-১৮৭৭ খৃঃ) পাঠকসমাজে খুব সাড়া পড়িয়াছিল। সকলেই উহা স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।[৩২] নবীনচন্দ্র সেনও উহা মহিলা-কবির রচিত ভাবিয়া কবিতাসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি ও দীপ্তির জন্য রচয়িত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তিনি কবিতাটির পাদটীকায় বলিয়াছেন: "শুনিয়াছি 'ভুবনমোহিনী' জাল; হউক, আজ বঙ্গদেশে ভুবনমোহিনীপ্রতিভার অভাব নাই।" নারীপ্রশস্তিতে নবীনচন্দ্রের আগ্রহ এখানে পরিস্ফুট।

নবীনচন্দ্রের তিনটি শোকগাথা (elegy) আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার পরিচয়রূপে উল্লেখযোগ্য। যে বিদ্যাসাগরের সহায়তা কিশোর-জীবনের সঙ্কট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাঁহার তিরোধানে রচিত 'মানব-ঈশ্বর' কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন:

বিদ্যার সাগর তুমি,
বিপ্লবের বেলাভূমি,

সংসার-মরুতে তুমি দয়ার সাগর—
দক্ষিণ করের দান
কভু নাহি জানে বাম,
নিজে দীনহীন, পরদুঃখেতে কাতর।

যদিও ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের অনুসারী, তবু মধুসূদনের সহিত তাঁহার একদিনমাত্র সাক্ষাৎকারে পরিচয় ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আলোচনা কিছুই হয় নাই[৩৬]। কিন্তু মধু-কবির প্রতিভা যে নবীনচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক উচ্ছ্বাসময় কবিতাটি। মধু-জীবনের শোচনীয় অবসান এবং মধু-কীর্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন :

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড় মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।

দীনবন্ধু মিত্রের তিরোধানে রচিত 'অনন্ত দুঃখ' কবিতাটি ততোধিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ, দীনবন্ধুর স্নেহসান্নিধ্যের স্মৃতিই তাহার কারণ। দীনবন্ধুর কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের জয়গানের পর কবিতার শেষাংশে ব্যক্তিগত বেদনার যে কোমল স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহাতেই সমস্ত কারুণ্য যেন উপছিয়া পড়িয়াছে :

দীনবন্ধু! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি',
কিন্তু যতদিন চিত্ত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতিপূর্ণ বাণী, তব প্রেম-মুখখানি,
জাগ্রতে স্মরণ-পথে ভাসিবে সতত ;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

'বুড়ামঙ্গল' কবিতাটি অমৃতলাল বসুসহ কাশীতে বুড়ামঙ্গলের মেলাদর্শন উপলক্ষে রচিত[৩৭]। কিন্তু তাহাতেও প্রসঙ্গক্রমে পরাধীন ভারতের জন্য বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অনন্তশয্যা' কবিতাটি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে জনৈক বন্দী কর্তৃক বড়লাট লর্ড মেয়োর হত্যা উপলক্ষ্য করিয়া রচিত মনে হয়। কবি বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে সেই রাজপুরুষের শোকযাত্রার বর্ণনা দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত 'প্রতিকৃতি' কবিতাটিকে নবীনচন্দ্র সনেট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাতটি পূর্ণাঙ্গ চরণের প্রত্যেকটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চতুর্দশ

চরণসজ্জার প্রয়াস ব্যতীত উহাতে সনেট-লক্ষণ কিছুই নাই। সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কায়ায় সুনির্দিষ্ট একটি ভাবকে অষ্টক্, ষটক্ পর্যায়ে সন্নিবেশিত করার সংযত-কৌশল উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও পরিমিতিবোধহীন কবি নবীনচন্দ্রের অনায়ত্ত ছিল। ইহা তাঁহার অন্যান্য সৌন্দর্য-বর্ণনাত্মক কবিতারই সমধর্মী।

পূর্ণচন্দ্র-নিভ ফুল্লচন্দ্র মুখে,
মহিমার হাসি ভাসিছে তায়;
পতি-গরবেতে গরবিত বুকে
গরব-তরঙ্গ খেলিয়া যায়।
পূর্ণ কলেবর, চিত্র পূর্ণতার,
পবিত্র মাধুরী কোমলতাময়;
পূর্ণ-সিন্ধু-জলে, উচ্ছ্বাস আধার,
ফুটন্ত জ্যোৎস্না হতেছে লয়।
পতি-ভালবাসা অঙ্গে অঙ্গে মাখা,
পতি-ভালবাসা হৃদয়ে ভরে,
পতি-ভালবাসা নাহি যায় রাখা,
হৃদয় ভরিয়া উথলি পড়ে।
সোনার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে-পতি শিব চন্দ্রের মতন!

লক্ষণীয় এই যে, অন্যান্য কবিতার চরণ-সজ্জার অভ্যস্ত সংস্কার তিনি এই তথাকথিত 'সনেটে' কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

'এবার' কবিতাটি খুবই কৌতুকজনক। উহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—"অক্ষয়বাবু তখন 'সাধারণী' সম্পাদক।...... তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্যদর্শনের 'এবার' কবিতাটি কি আপনার লেখা? উহা সাধারণীর কোন অদ্ভুত সমালোচনার শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ।'.....তিনি আরও বলিলেন যে, আমার কবিতাটি এত সুন্দর যে, গালি খাইয়া এমন সন্তুষ্ট তিনি আর কখনো হয় নাই।"[৩৮] সত্যই উহা নবীনচন্দ্রের ব্যঙ্গ ও শ্লেষপ্রধান কবিতার একমাত্র সার্থক নিদর্শন। ইহা পড়িতে পড়িতে শুধু হেমচন্দ্রের সাময়িক ঘটনামূলক ব্যঙ্গ কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র সময়কার ব্যঙ্গ কবিতাগুলির কথাও মনে পড়ে। লঘু পরিহাসের সঙ্গে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা, বিভিন্ন কাব্যের মর্ম-উল্লেখ এবং কাব্য-সমালোচনার রীতি সম্পর্কে রসপূর্ণ ইঙ্গিত অত্যন্ত উপভোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ 'অবকাশরঞ্জিনী' সম্পর্কেই কৌতুকজনক মন্তব্যটুকু উক্ত কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতার আলোচনা শেষ করিতেছি :

আবার কি ? 'অবকাশরঞ্জিনী !' আ-মরি !
কেমন জাঁকাল নাম,—
বাঙ্গালের গঙ্গাস্নান !
'বিচ্ছেদ যাবার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না !'—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা ! বাঙ্গাল কি সেয়ানা !
দূর কর বাঙ্গালের 'ফুলের' ভাণ্ডার।
মরি' কর-কণ্ডূয়নে,
সাতসিন্ধু ভাবি মনে,
যায় ছয় দিন আজি, কালি রবিবার ;
কোথা মম অবকাশ ? রঞ্জিব কি ছার ?

সূত্র নির্দেশ

১। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ১৭৮ পৃঃ।

২। ঐ ঐ ১৭৯-৮০ পৃঃ।

৩। ঐ ১ম ভাগ, ১৪২ পৃঃ।

৪। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪৩-৪৬ পৃঃ।

৫। হেমচন্দ্র, ১ম ভাগ—মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯৮ পৃঃ।

৬। "বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।…অবকাশ-রঞ্জিনী একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'অবকাশ রঞ্জিনী'র সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ১ম সংখ্যা, ১২৮০।

৭। 'উপহার'—বঙ্গসুন্দরী, বিহারীলাল।

৮। An Introduction to the Study of Literature—W. H. Hudson, P. 97.

৯। আমার জীবন, ১ম ভাগ, ১৪২ পৃঃ।

১০। বঙ্গসুন্দরী—১০ম সর্গ, বিহারীলাল।

১১। A Survey of English Literature—Oliver Elton, P. 139.

১২। Giaour—Byron.

১৩। 'To Caroline,'—Hours of Idleness, Byron.

১৪। 'To Margurite'—Matthew Arnold. (See 'Leaves of English Poetry')

১৫। 'বর্ষার দিনে'—মানসী, রবীন্দ্রনাথ।

১৬। 'To Woman'—Hours of Idleness, Byron.

১৭। চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ-পরিচয় দ্রঃ।

১৮। আমার জীবন, ১ম ভাগ, ১৯৬ পৃঃ।

১৯। ঐ ২য় ভাগ, ১৭৩ পৃঃ।

২০। ঐ ৩য় ভাগ, ২৩৪ পৃঃ।

২১। ঐ ঐ ঐ

২২। জাতি-বৈর—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৪০-৪১ পৃঃ।

২৩। 'স্মৃতি-কথা'—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শিক্ষক, আশ্বিন, ১৩৬২।

২৪। 'The country was then visited by a devastating famine which spread from Madras to Behar, U. P., and the Punjab. Behar was then a part of Bengal and the famine there and the measures taken to cope with it formed the subject of bitter

criticism in papers.'—The Indian National Congress, Vol. I. by Dr. Hemendranath Das Gupta, P. 63.

২৫। 'An Agitation for the reform of Civil Service Regulations which were capriciously barring the access of Indians to higher appointments led Surendranath Banerjee to undertake tours in different provinces in 1877-78.'—Notes on Bengal Renaissance, by Amit Sen, P. 56.

২৬। ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃষ্ঠায় ১৩ জনের নাম পাওয়া যায়।

২৭। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২১৩ পৃঃ।

২৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন, ৩১২ পৃঃ।

২৯। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ২৬ পৃঃ।

৩০। 'Lines'—Hours of Idleness, Byron.

৩১। 'উপহার'—বঙ্গসুন্দরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী।

৩২। 'I would I were a careless child'—Hours of Idleness, Byron.

৩৩। ৬৭ সংখ্যক গীত—সঙ্গীত শতক, বিহারীলাল।

৩৪। ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র।

৩৫। দ্রঃ—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪৪নং—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।

৩৬। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম, ৩৬৭ পৃঃ।

৩৭। পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়—বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৬ পৃঃ।

৩৮। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ৩৬০ পৃঃ।

পলাশির যুদ্ধ

১৮৭৫ সালে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নবীনচন্দ্রের কবি-খ্যাতি দৃঢ়মূল হইল, এবং উহার অভিনব বিষয়বস্তু ও অন্তর্নিহিত ভাবোন্মাদনার জন্য তিনি জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিলেন। বায়রণ তাঁহার 'Childe Harold's Pilgrimage'-এর জনপ্রশস্তি দেখিয়া যেমন স্মরণীয় উক্তি করিয়াছিলেন—"I awoke one morning, and found myself famous",[1] তেমনি 'Childe Harold'-এর ভাবরসপুষ্ট 'পলাশির যুদ্ধে'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নবীনচন্দ্রও বলিয়াছেন—"বঙ্গসাহিত্যজগতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।...'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ামাত্র নবস্থাপিত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটকরচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। এরূপ চারিদিকে 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়।"[২] আত্মকৃতিত্ব-উচ্ছ্বসিত নবীনচন্দ্রের কথায় অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্যসমাদর যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। "উহা প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যে ঢাকা ও বরিশাল হইতে যথাক্রমে অজ্ঞাতনামার 'পলাশির যুদ্ধের ব্যাখ্যা' ও রাজমোহন চক্রবর্তীর 'পলাশির যুদ্ধের টীকা' বাহির হইয়াছিল।"[৩] প্রকাশমাত্রই উহা নিঃশেষিত হইয়াছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইল।[৪] সেই সময়ে 'পলাশির যুদ্ধে'র উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় তিনখানা সাময়িক পত্রে ;—'আর্যদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২) 'বান্ধব' (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৮২) ও 'বঙ্গদর্শনে' (কার্তিক, ১২৮১)। তন্মধ্যে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের ও 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন ঘোষের আলোচনা সত্যই রসগ্রাহী এবং বিচারমূলক হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত সূত্রনির্দেশহীন তাঁহাদের মন্তব্যসমূহ উক্ত আলোচনাদ্বয় হইতে গৃহীত বুঝিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"পলাশির যুদ্ধের সর্বত্রই অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।"

রঙ্গমঞ্চেও 'পলাশির যুদ্ধের' সমাদর উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ সালের ১৩ই এপ্রিল গ্রন্থের প্রকাশ, আর ঐ বৎসরের ২৫শে সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে (বিডন স্ট্রীট) 'নিউ এরিয়ান থিয়েটার' কর্তৃক উহার অভিনয়;[৩] যদিও সেই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উক্ত 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' কোম্পানীই ভূতপূর্ব ন্যাশনাল থিয়েটার।[৪] সুতরাং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'পলাশির যুদ্ধে'র ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা নবীনচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, যদিও গিরিশচন্দ্র ক্লাইভের ভূমিকায় অভিনয় করেন উহার দুই বৎসর পরে। ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণকরতঃ গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের (১লা ডিসেম্বর, ১৮৭৭) পরই নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র নাট্যরূপ দেন এবং ৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৮ তারিখে উহা মঞ্চস্থ করিয়া ক্লাইভের ভূমিকায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। উক্ত ভূমিকা অবলম্বনেই গিরিশচন্দ্রের 'প্রথম খ্যাতিলাভ' কথাটি যথার্থ নহে, তবে গিরিশের পূর্ব খ্যাতি যে এই অভিনয়-নৈপুণ্যে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৫]

যাহা হোক, আজিও নবীনচন্দ্রের স্মরণীয় পরিচয় 'পলাশির যুদ্ধে'র কবিরূপে। কিন্তু উহার সমস্তই কাব্যোৎকর্ষের জন্য নহে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, এবং সদ্যোজাগরিত স্বদেশাভিমানের সহিত উক্ত কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরসাদৃশ্যের জন্যও বাঙ্গালী উহাকে নিমেষে বরণ করিয়া লইল। বিষয়বস্তুর নূতনত্ব সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের সন্দিগ্ধ সচেতনতা 'পলাশির যুদ্ধে'ই প্রকাশ পাইয়াছে :

> দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
> নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
> করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
> বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
> কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
> নহে যা, কেমনে আমি বল কুহকিনি !
> মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ? (২য় সর্গ)

কিন্তু কী সেই অভিনব বিষয়বস্তু—যাহার দরুণ এই কাব্য অন্যান্য কাব্য হইতে স্বতন্ত্র ? 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র ঘটনা পৌরাণিক কাহিনী। সুতরাং পুরাণ-মহাকাব্যের ঐতিহ্যে নির্ভরতার অবসরে কবিরা কখনো

কখনো স্বাধীন কল্পনাকে পক্ষবিস্তারের সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধে'র ঘটনা ঐতিহাসিক, সংঘটনকাল নাতিদূরবর্তী। রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রেরও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশের আশ্রয়ভূমি ছিল ইতিহাস। আবার ইতিহাসাশ্রিত কাব্য-রচনার পথিকৃৎ হইলেও রঙ্গলাল পরবর্তী কবিগণকে, বিশেষতঃ, নবীনচন্দ্রকে প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। মোহিতলালের ভাষায় বলা চলে—"ইহার পর, (অর্থাৎ 'পদ্মিনী' কাব্যের) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে একখানিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল—সে নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'। কিন্তু ঐ কাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি 'পদ্মিনী' হইতে স্বতন্ত্র; মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র পর, ইহাই স্বতন্ত্র আকারে ও নূতন ভঙ্গিতে, সম্পূর্ণ ইংরেজী আদর্শে রচিত দ্বিতীয় বাংলা কাব্য।"[১] যাহা হোক, পূর্বোক্ত তিনজন কবি ভারতবর্ষের পরাধীনতা-গ্লানির বিষরক্ত মোক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন মুসলমান রাজত্বকালের কাহিনীকে পশ্চাৎ-পটরূপে রাখিয়া, দূর-অতীতের স্মৃতির অস্পষ্টতাও সেক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিষয় যে কালের এবং যে স্থানের, তাহার সহিত বাঙ্গালীর হৃদয়-ক্ষত বিজড়িত। তাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"বাংলার কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির এক ভয়ঙ্কর আবর্ত।...এখানে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়, এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি—এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশ-পরম্পরায় সহস্র কোটী লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়।" বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছিলেন—"পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা, ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার।...পলাশির যুদ্ধের ঘটনাসকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

'বিষয়-নির্বাচন' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত মন্তব্য অর্থপূর্ণ। ইহা সত্য যে, মাত্র একদিনের নয় ঘণ্টাব্যাপী সময়ের অকিঞ্চিৎকর ঘটনা এই পলাশির

যুদ্ধ ;—তন্মধ্যে আবার নবাব-পক্ষের প্রধান অংশ স্বার্থপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র মহিমায় নিষ্ক্রিয়। ইংরেজ সেনাপতি ড্রেক ও বেচার নিজেদের হীন কার্য-কলাপের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্ত ইহাকে যতই "Happy revolution in the Government of this Kingdom" বলুন না কেন," কর্ণেল ম্যালিসন্ যথার্থই বলিয়াছেন—"It was not a fair fight."' তবে এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত অকিঞ্চিৎকর যুদ্ধঘটনাকে কাব্যোপযোগী মনে করেন না—এইরূপ ধারণা করাও সঙ্গত নহে। তাহা হইলে মূল ঘটনার সামান্ততার জন্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যের'ও ক্রটি ধরিতে হয়। পলাশি-প্রান্তরের যুদ্ধ বস্তুতঃ যুদ্ধের উপসংহার; প্রকৃত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের (war of nerves) আকারে পূর্ব হইতেই সংঘটিত হইতেছিল কলিকাতা, হুগলী, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদে বৎসরাধিককাল ধরিয়া। কাজেই পলাশির যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালীর মনে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রই আবার 'কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার' বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আসল বক্তব্য ছিল এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যরূপ দিতে গেলে কবিকে অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হইতে হইবে। নবীনচন্দ্র সেই আশঙ্কা-সঙ্কুল পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্কিমের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল না, তাহা পরবর্তী কালে পলাশির যুদ্ধ কাব্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ঐতিহাসিক তথ্যের ক্রটি-বিচ্যুতি ও অসংযত উচ্ছ্বাসের অভিযোগ হইতেই প্রমাণিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজ রচিত বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্যই ছিল তখন নবীনচন্দ্রের অবলম্বন; আবার কবি নিজে ইতিহাসের তেমন সত্যানুসন্ধিৎসু অভিনিবিষ্ট পাঠকও ছিলেন না। তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে সিরাজকে সমর্থন বা সিরাজ-কলঙ্ক সম্পর্কে মনস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরবর্তী কালে তজ্জন্ত যে বিরুদ্ধ সমলোচনার বান বহিয়াছিল, নবীনচন্দ্র বার্ধক্যের শান্তচিত্তে সেই ক্রটি স্বীকার করিয়া বন্ধু গিরিশচন্দ্রকে লেখেন—"কুড়ি বছর বয়সে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখন সিরাজের শত্রুচিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।" "সুরেশের (সমাজপতি) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন এরূপভাবে সিরাজের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বা-চওড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস,

আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম মার্শমেন। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্ত এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।"[১১] নবীনচন্দ্রের এই চোখের জল ফেলার দাবী যে কৃতিত্ব প্রকাশের প্রয়াসমাত্র নয়, খুবই আন্তরিক তাহা মর্মগ্রাহী গিরিশচন্দ্রও উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"তোমার পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অস্বরূপ হলেও তোমার স্বদেশ অনুরাগ ও সেই দুর্দান্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়।"[১২] 'তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য'[১৩]—নবীনচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের তাৎপর্য পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। তিনি লিখেন—"ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে, ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা-গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন না—কিন্তু মহারাণীর খাস হুকুম আছে।... ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়।"[১৪] সংস্কৃত আলঙ্কারিকও ইতিহাসের উপর রসের প্রাধান্য দাবী করিয়া বলিয়াছেন —"কবিনা কাব্যমুপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্।... নহি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ।" (কাব্য-রচয়িতা কবিকে সর্বান্তকরণে রসের বশবর্তী হইতে হইবে।... ইতিবৃত্তমাত্রনির্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই, কারণ ইতিহাসাদিতে তাহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।)[১৫]

তথাপি নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তথ্য-বিকৃতির অভিযোগ সম্পর্কে আমরা একেবারে অনবহিত থাকিতে পারি না। সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষই ঐতিহাসিক ত্রুটির ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই কাব্যখানিতে ইতিহাস যেভাবে কল্পিত হইয়াছে, ত্রুটিসত্ত্বেও তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়"; কিন্তু তিনি উহার কোন বিশ্লেষণ করেন নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ই তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে (১৩০৪) সিরাজ এবং তাঁহার সমকালীন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীর উপর নূতন আলোকপাত করেন। বলা বাহুল্য, নবীনচন্দ্রের কাব্য তাঁহার নূতন তথ্য-

উদ্‌ঘাটনের প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে রচিত। অক্ষয়কুমার তাঁহার গ্রন্থের নানাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে 'পলাশির যুদ্ধে'র উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস রচনায় ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে সিরাজ-কালিমা উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?"[১০] তাঁহার প্রধানতম অভিযোগ এই যে, নবীনচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে উচ্ছৃঙ্খল, মত্তপ, কামাচারী ও অব্যবস্থিত চিত্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে সিরাজ আলীবর্দির মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি তেজস্বী, নির্ভীক, শিক্ষিত ও রাজকার্য-পারদর্শী ছিলেন, দেশপ্রীতিবশতঃ ইংরেজদিগের প্রভুত্ববিস্তার-প্রয়াসে তিনি প্রবল বাধা দান করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের দ্বিতীয় অভিযোগ এই ছিল যে, অন্ধকূপ হত্যাকাহিনী সর্বৈব অলীক এবং ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, কিন্তু নবীনচন্দ্র তাহার কলঙ্কও সিরাজের উপর আরোপ করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের মন্তব্য এই—"ইতিহাস-লেখকদিগের নিকট অন্ধকূপহত্যাকাহিনী চিরদিনই সন্দেহপূর্ণ থাকিবে, কেবল কল্পনানিপুণ ভারতীর বরপুত্রগণ কখন কখন বিমুক্তগগনের নক্ষত্র-লোক হইতে কবিতাবৃষ্টি করিয়া অন্ধকূপহত্যার করুণ কাহিনী জনসমাজে জাগরূক রাখিবেন।"[১১]

সিরাজ-চরিত্রের বিকৃতি এবং অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর স্বীকৃতির জন্য মৈত্রেয় মহাশয় নবীনচন্দ্রকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা বিচার করিতে গেলে বিষয় দুইটি সম্পর্কে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তও আলোচনা করিতে হইবে। কেননা, বহুকাল ধরিয়া মৈত্রেয় মহাশয়ের মন্তব্য আমাদিগকে নবীনচন্দ্রের কাব্যরস-আস্বাদনে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবার তাঁহারই সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০৬ সালে গিরিশচন্দ্র এবং ১৯৩৮ সালে শচীন সেনগুপ্ত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ-চরিত্রের উজ্জ্বল রূপ ফুটাইয়া তোলেন।

অক্ষয়বাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশের এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উহার এক সপ্রশংস সমালোচনা করেন। উহার উপসংহারে মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজ-চরিত্র উপস্থাপনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য,—"কেবল একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। গ্রন্থকার

যদিচ সিরাজ-চরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ ঔদার্য সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্যদ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ...ইহাতে গ্রন্থের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।"[১৮] মৈত্রেয় মহাশয়ের উপরি-উক্ত মন্তব্যসমূহ হইতেই রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝা যাইবে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সিরাজের চরিত্রহীনতা, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি বহু দোষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"অস্ত্র শিক্ষার অভাব হইলেও যুদ্ধশিক্ষায় সিরাজের সবিশেষ সুবিধা ছিল; উচ্ছৃঙ্খল সিরাজ এ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।"[১৯] আচার্য যদুনাথ সরকার সিরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"He was given no education for his future duties, he never learnt to curb his passionate impulses, none durst correct his vices, and he was kept away from manly and martial exercises as dangerous to such a precious life.......About the character of Siraj-ud-daulah the evidence of the English merchants of Calcutta or that of famous Patna Historian Sayyid Ghulum Hussain (the tutor of his rival Shaukat Jang) might be suspected and prejudiced. I shall therefore give here the opinion of Monsieur Jean Law, the chief of the French factory at Qasimbazar, a gentleman who was prepared to risk his own life in order to defend Siraj against the English troops. Law writes in his Memoirs—'The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact, he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty..... Every one trembled at the name of Siraj-ud-daulah."[২০] শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্য যদুনাথের সিদ্ধান্তের অনুরূপ মন্তব্য করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—"এক কাব্য-কাহিনী ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজদ্দৌলাকে কোনক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কি হিন্দু কি

মুসলমান, কি ইংরাজ কি ফ্রেঞ্চ, কি ডাচ্, একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি।"[২১] সৌভাগ্যের বিষয়, কাব্য-কাহিনীতে নহে, বরং পরবর্তীকালে রচিত 'নাট্য-কাহিনীতেই'[২২] সিরাজকে শহীদ বানানো হইয়াছে। অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্বেই বিরূপ মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—"অক্ষয়বাবু সিরাজদ্দৌলাকে ইংরাজ-ঐতিহাসিক-রাহুর গ্রাস-মুক্ত শশধরের ন্যায়...... প্রতিপন্ন করিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।"[২৩] উক্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থকারের জিজ্ঞাসার উত্তরে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জানাইয়াছেন—"অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলাকে কোন ঐতিহাসিকই প্রমাণগ্রন্থ বলে স্বীকার করবেন না। ......ইতিহাসের পাতা থেকে সিরাজের কেলেঙ্কারী মুছতে পারা যাবে না।"[২৪]

অতঃপর 'অন্ধকূপহত্যা কাহিনী' সম্পর্কে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মন্তব্য দেখা যাক। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সবিস্তার আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"এ ঘটনা কাল্পনিক এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।"[২৫] আচার্য যদুনাথ সরকার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"But the number of victims after given out and accepted in Europe (namely 123 dead out of 146 confined) is manifestly an exaggeration.......The true number was considerably less, probably only sixty."[২৬] সুতরাং পরবর্তী ইতিহাস-সন্ধানীরা অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী অস্বীকার করেন নাই, কেবল বন্দী-সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা অনেক অল্প ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হোক, দেখা যাইতেছে যে, বহুকাল পূর্বে বিদেশী-রচিত তথ্য অবলম্বন করিয়া নবীনচন্দ্র যেভাবে সিরাজ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক বিকৃত হইলেও পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা প্রবলভাবে সমর্থিত হইতেছে। ইহা সত্য যে, নবীনচন্দ্র তখন প্রত্যক্ষভাবে সিরাজকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিগত জীবন যতই উদ্দাম বিলাস ও ভোগাসক্তির পঙ্কলিপ্ত হউক না কেন, তথাপি বহিঃ-শত্রু ও অন্তঃশত্রুর যুগপৎ আক্রমণ-ক্ষত বাঙ্গালাকে সিরাজের ভাগ্যের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই 'পলাশির যুদ্ধের' শেষ চরণ-চতুষ্টয়ে

সিরাজের পতনকে বাঙ্গালার তথা ভারতের স্বাধীনতা-নাট্যের যবনিকা-পতন রূপে বর্ণনা করিয়া কবির দীর্ঘনিঃশ্বাসপাত আজও দেশবাসীর অন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে :

> সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
> পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
> নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
> ভারতের শেষ আশা—হইল স্বপন। (৫ম সর্গ)

তথ্যের অল্পস্বল্প ত্রুটি সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের স্বদেশাভিমান যেই সত্যকে উদ্‌ভাসিত করিতে চাহিয়াছিল, তাহা যে বাঙ্গালার স্বাধীনতা-বিক্রয় চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে অসহায় বলি-স্বরূপ সিরাজদ্দৌলার প্রতি প্রচ্ছন্ন কবি-সমবেদনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আন্তরিকতা বহু পূর্বে গিরিশচন্দ্রের মত রসগ্রাহী নাট্যকারও যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নবীনচন্দ্রকে লিখিত তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত পত্র হইতে জানা যায়। সম্প্রতি ঐতিহাসিক-প্রবর যদুনাথ সরকারও অনুরূপ শ্রদ্ধায় বলিয়াছেন—"Ignoble as the life of Siraj-ud-daulah had been and tragic his end, among the public of his country; his memory has been redeemed by a poet's genius ......The Bengali Poet Nabin Chandra Sen in his masterpiece 'The Battle of Plassey', has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing forth his readers' tears for fallen greatness and blighted youth".[1] সুখের বিষয়, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকের নির্মম অভিযোগে অভিযুক্ত কবি নবীনচন্দ্র পরবর্তী ঐতিহাসিকের সহৃদয় পুনর্বিচারে কেবল মুক্তিই পাইলেন না, জাতির শ্রদ্ধার আসনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাতেই স্বদেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম কবি-প্রতিভার উদ্দীপন-বিভাব, 'পলাশির যুদ্ধে' সেই দেশভাবনা অভিমানক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বিশিষ্ট কোন নায়কের 'বধ' বা 'সংহার'-কাহিনী সবিস্তারে ঘোষণা করার পরিকল্পনা নবীনচন্দ্রের ছিল না। সিরাজকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাপুঞ্জ যতই আবর্তিত হোক না কেন, তবু নবীনচন্দ্রের যে মুখ্য নায়ক সর্বত্র বাক্যহীন বিশাল প্রভাব বিস্তার করিয়া

আছে, সে সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঙ্গালাদেশ, ব্যাপক অর্থে—ভারতবর্ষ। সুতরাং যত প্রধানই হোক, কোন ব্যক্তিবিশেষের জয়-পরাজয় পলাশি-প্রান্তরের স্মরণীয় যুদ্ধ ঘটনার নিকট একান্তই অপ্রধান। তাই কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ নাম 'পলাশির যুদ্ধ', 'সিরাজদ্দৌলা বধ' বা 'সংহার' নহে। বাঙ্গালাভাষায় এই প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস কাব্যরূপ গ্রহণ করিল—জীবনকে স্পর্শ করিল—জাতীয়-জীবনের একটি মৌল প্রবল প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিল। মোহন-লালকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র জাতিকে নবীনভাবে দীক্ষাদান করিলেন। কাব্যের প্রধান সুরও বীর মোহনলালের উক্তিতে ধ্বনিত হইয়াছে—

যে আশা ভারতবাসী বীরধর্মসনে
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জন, (৪র্থ সর্গ)

তাহারই মর্মান্তিক পরিণতি :

আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ-আশা গেল পরিহরি'! (ঐ)

নিম্নলিখিত উক্তিতে কবি কেবল মর্মবিদারী প্রশ্নই জাগান নাই, পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ অন্তরে অনির্বাণ মুক্তি-বহ্নিও অলক্ষ্যে জ্বালাইয়া দিয়াছেন :

কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন? (ঐ)

'পলাশির যুদ্ধে'র কাব্যমূল্য অধিক নহে, তবু তাহা হইতে এক বন্ধন-অসহিষ্ণু পৌরুষদীপ্ত হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার অভাবিতপূর্ব সমাদর হইয়াছিল। রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বরে যে বরাভয় বাণী নির্ঘোষিত হইয়াছে, তাহা সেদিনকার আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীরই ভাষা। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী বীরাঙ্গনার কি অপূর্ব অভিলাষ ও দৃঢ়তা :

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

* * *

বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,

হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
অনন্ত দাসত্বপথে কর বিচরণ। (১ম সর্গ)

বিদেশী আক্রমণকারীর হস্তে স্বাধীনতা-সমর্পণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিগত যুগে জাতীয়-ভাবোন্মত্ত বাঙ্গালী যেমন বুঝিয়াছে, তাহাই যুগপ্রতিভূ নবীনচন্দ্র রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন :

বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।

* * *

যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন
থামিবে না এইখানে, (ঐ)

বহিরাগত মুসলমান শক্তিও এদেশে বিজয়ীর বেশে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু এদেশের মুগ্ধকরী পারিপার্শ্বিক-প্রভাবে এবং বহুশত বৎসরের সম্মিলিত সুখদুঃখপূর্ণ জীবনযাত্রার কল্যাণে বিজেতার স্বাতন্ত্র্য ও উগ্রতা একান্তভাবে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে; এখন হিন্দু এবং মুসলমান যেন ভারতজননীর অপূর্ব ধূপছায়া বস্ত্র। বিগত যুগে জাতীয় চেতনা প্রধানতঃ হিন্দু ঐতিহ্য ও ভাবধারা অবলম্বন করিয়া জাগ্রত হইলেও জাতীয় ঐক্যের সুর যেন তখন হইতেই ধ্বনিত হইতেছিল। রাণী ভবানীর মুখে কবি তাহাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন—

এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত,
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে। (ঐ)

রাণী ভবানীর সতর্কবাণীতে মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠের মতই অধিকাংশ বাঙ্গালী বিচলিত হয় নাই, তাই সেদিনের দুষ্কৃতির লীলাভূমি বাঙ্গালীর কলঙ্করঞ্জিত পলাশি নবীনচন্দ্রের স্বাজাত্যাভিমানে রূঢ় আঘাত হানিয়াছিল। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে অভিব্যক্ত স্বদেশপ্রীতি অত্যল্পকাল মধ্যেই সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাই 'পলাশির যুদ্ধে'র মাত্র চারিমাস পরে প্রকাশিত (১০ই আগষ্ট, ১৮৭৫) 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক দেশাত্মবোধক নাটকে। উহার নামপত্রে নাট্যকার দুর্গাদাস দাস

(বা উপেন্দ্রনাথ দাস) রাণী ভবানীর 'ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে' প্রভৃতি উক্তি এবং মোহনলালের 'চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন, মুহূর্তেক পাই যদি স্বাধীন জীবন' প্রভৃতি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নাটকের মূল সুরের আভাস দিয়াছেন।

যে বীর মোহনলালের দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল,—'পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস,' (তুঃ 'Better to reign in hell, than serve in heaven.'—Paradise Lost, Milton. Book I.)—সে যখন রণক্ষেত্রেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিল, শক্তিহীনতার দরুণ নহে স্বার্থপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথেই বাঙালীর স্বাধীনতা-রত্ন অপহৃত হইয়া গেল, তখন তাহার মর্মভেদী কাতরোক্তিতে কি বন্ধনজর্জর মুমুক্ষু বাঙালীরই সম্মিলিত আর্তনাদ ফুটিয়া উঠে নাই ?

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ রজনী।

* * *

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন !
কি ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী ;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ-আশা গেল পরিহরি' ! (৪র্থ সর্গ)

সেই ষড়যন্ত্রের মুখ্য-যন্ত্র ঐক্যহীন স্বার্থসর্বস্ব ভীরু বাঙালীর উদ্দেশ্যে কবির নিম্নোক্ত ধিক্কার-বাণী আজও বাঙালী সন্তানকে লজ্জার সহিত স্মরণ করিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধিক্কারও যে কবির বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তে-রঞ্জিত, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? স্বাধীনতা-লুপ্তির সেই আত্মঘাতী ইতিহাস মুক্তি-প্রবুদ্ধ নবীনচন্দ্র ভুলিবেন কি করিয়া ?

সাধে কি বাঙালী মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?

স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়!
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ। (১ম সর্গ)

উক্তিটি যদিও ষড়যন্ত্রচক্রীদের অন্যতম জগৎশেঠের মুখ হইতে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নির্গত হইয়াছে, তবু অন্তর্নিহিত সত্যতায় উহা গভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রের এমন নিপুণ শব্দচিত্র আর হইতে পারে না। ইহাকে চার্লস্ গ্রান্ট বা লর্ড মেকলে সাহেবের বাঙ্গালী-নিন্দার[১৮] প্রতিধ্বনি মনে করিবার কারণ নাই, কেননা বাঙ্গালী-সমাজজীবনের নানা প্রকোষ্ঠে পাদচারণা করিয়া নবীনচন্দ্র এই চিত্রই নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন-কথায় সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিচয় রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরও শেষজীবনে বাঙ্গালীসমাজের হীনতা ও কৃতঘ্নতায় জর্জ্জরিত হইয়া গভীর ক্ষোভে মানুষের বিরুদ্ধেই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইতর জন্তু কারা? মানুষ যাহাদিগকে জন্তু বলে, তাহারা, না মানুষ নিজে?"[১৯] নবীনচন্দ্রের পরে সমাজ-উৎপীড়িত স্বভাবকবি গোবিন্দদাসও বাঙ্গালী-চরিত্রের গ্লানিজনক পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
* * *
এমন সাহস-হীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সঙ্কুচিত হয়।[২০]

সুতরাং হৃদয়বান্ সমাজ-সচেতন কবি-সাহিত্যিকদের স্বজাতি সম্পর্কে এই উপলব্ধি স্বাভাবিক। যাহা হোক, এইভাবে জাতীয় পাপের স্মৃতিমন্থনে যে অভিমান ও আত্মগ্লানির বেদনা জাগিয়া ওঠে, তাহারই স্থায়ীভাব যে স্বদেশানুরক্তি—তাহাই 'পলাশির যুদ্ধ' পাঠের ফলশ্রুতি, এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যসিদ্ধিও এই দেশপ্রীতির উদ্বোধনে।

আমরা দেখিলাম—একটি প্রচণ্ড শক্তি, এক বাধাবন্ধহীন উজ্জ্বল আবেগ, সমগ্র জাতির দুঃখশোকে রোরুদ্যমান এক জীবন্ত কবিহৃদয়ের উষ্ণস্পর্শে 'পলাশির যুদ্ধ' সজীব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই উহা বাঙ্গালীর জাতীয়

কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন—"যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা।" এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টভাষায় জাতীয় অন্তর্দাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া 'পলাশির যুদ্ধে'র, নানা অংশের জন্য একদা কবিকে সরকারী কর্মচারীরূপে গ্লানি এবং বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল, পরিশিষ্টে (গ) তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের নানা রচনায় দাসত্বময় জীবনের জন্য যে ধিক্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলেও এই তিক্ত অভিজ্ঞতা।

'পলাশির যুদ্ধ' পরিকল্পনার যে নেপথ্য-ইতিহাস কবি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে জ্ঞাতব্য বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল।—"যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্য একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা সমিতি ছিল। —সঙ্গীত সমিতি, সাহিত্য সমিতি, ইয়ারকি সমিতি! সাহিত্য সমিতির সভ্য তিনজন—আমি, জগদ্বন্ধু ভদ্র, ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। জগদ্বন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে, আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বহি লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশির যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম, আমি পলাশির যুদ্ধ লিখিব।......জগদ্বন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহী-বিদ্রোহের কোন ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল।......আমি তখনই 'পলাশির যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম।......কবিতাটি......সত্তর আশী শ্লোক হইবে। উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি (যশোহরের এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়র) পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি তিনমাসের বিদায় গ্রহণ করি।......সেই সময় একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম ইঞ্জিনীয়ার বাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব।

সেই চেষ্টার ফল 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য। কতদিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশিদিন নহে। ছুটির মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়।"*

পূর্বেই বলিয়াছি—'পলাশির যুদ্ধের' প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার বিষয়বস্তু। পৌরাণিক ও রাজপুত শৌর্যের রোমাঞ্চকর কাহিনীর ঘনঘটার মধ্যে নিজ গৃহপ্রাঙ্গণের বেদনাপূর্ণ নাতিদূরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাব্য সৃষ্টি করিয়া নবীনচন্দ্র সে যুগে বাঙ্গালীর অবরুদ্ধ মর্মজ্বালা প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কাব্যাংশে নিখুঁত না হইলেও এই বিষয়-মাহাত্ম্যের জন্যই 'পলাশির যুদ্ধের' অচল প্রতিষ্ঠা।

নবীনচন্দ্র মহাকাব্যধারার কবি হইলেও সর্গবদ্ধভাবে রচিত এই কাব্যটিতে মহাকাব্যের লক্ষণ নাই! 'পলাশির যুদ্ধের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নাকি নবীনচন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, উহা 'next, if at all, to Meghnad!'** আবার 'পলাশির যুদ্ধের' কিছু পূর্বে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের সহিত ইহার তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে, সর্বোপরি চরিত্র-চিত্রণ আছে। পলাশির যুদ্ধে উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অল্প, গীতি অতি প্রবল।" বিচক্ষণ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধের' মূল গীতি-প্রকৃতি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াও কেন যে উহাকে 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যদ্বয়ের সহিত তুলনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, জানি না। তাঁহার প্রথম তুলনাটি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য উচ্ছ্বাসও হইতে পারে, সম্ভবতঃ তখনও কাব্যটির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি মনস্থির করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় তুলনা হইতে মনে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রও বহিরঙ্গ লক্ষণ বিচারে 'পলাশির যুদ্ধ'-কে মহাকাব্যগোত্রীয় বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন; তাই উহাতে উপাখ্যান, চরিত্র, নাট্যরস ও গীতিরসের পূর্ণসমাবেশ আশা করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র পরেই আবার একস্থানে লিখিয়াছেন—"মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্য তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।" 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার নাকি নবীনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "আপনি পলাশির যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য বলেন?" উত্তরে নবীনচন্দ্র বলেন—"আমি উহাকে অকাব্য বলি।"*** প্রশ্নটি সকৌতুকে

এড়াইয়া গেলেও ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায়, নবীনচন্দ্র উহাকে মহাকাব্যের রূপ দিতে চাহেন নাই। পূর্ববর্তী খণ্ডকবিতা সংকলন 'অবকাশরঞ্জিনীতে' যে স্বদেশাভিমান ও পরবশ্যতাজনিত ধিক্কার বিচিত্রভাবে নানা কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এখানে একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীতে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে মাত্র। গীতি-উচ্ছ্বাস তেমনি আছে, উপাখ্যান, চরিত্র প্রভৃতি এখানে সেই দুঃসহ আবেগকেই শুধু ধরিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ 'পলাশির যুদ্ধকে' বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে রচিত একটি ঐতিহাসিক গাথাকাব্য বা Romance বলা যায়। মহাকাব্যের সহিত যে এই ধরণের কাব্যের একটা আপাতঃসাদৃশ্য অথচ মূলীভূত পার্থক্য আছে তাহা স্বীকার্য। "Another division of narrative poetry which with many resemblances to the epic, is yet distinguished from it in source, matter and method, is the Metrical Romance."[৩৪] 'পলাশির যুদ্ধের' বহিরঙ্গরূপ দেখিয়াই বুঝি একদা উহাকে মহাকাব্যগোত্রীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। আসলে উহা একটি Matrical Romance, ঐতিহাসিক পটভূমিতে গড়া।

কাব্যটি অনতিবৃহৎ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। বর্ণনাত্মক কাব্য হইলেও ইহাতে ঘটনার গতিক্রম অনুযায়ী সর্গগ্রন্থন-প্রয়াসে পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুসৃত হইয়াছে মনে হয়। সংস্কৃত নাটকে ঘটনার আরোহ-অবরোহ ক্রম অনুযায়ী (ascending and descending order) পাঁচটি অঙ্ককে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ—এই পাঁচটি নামে বিভক্ত করিয়া অঙ্কবিশেষের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। ইংরেজী নাটকেও অনুরূপ বিভাগ রহিয়াছে। যথা,—Exposition, growth of action, climax, falling action or denouement, catastrophe or conclusion. 'পলাশির যুদ্ধের প্রথম সর্গে নবাববিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে যেন ঘটনার নাটকীয় সূচনা; দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইভের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়া কর্তৃক আশ্বাসদানে ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে পলাশিক্ষেত্রে বিলাসমগ্ন সিরাজের গভীর আতঙ্ক-দৃশ্যে ঘটনার ভাবী পরিণতি আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া উহাকেই ঘটনার climax বা চরমরূপ বলা চলে, কেননা, ইঙ্গিতময়তার দিক দিয়া মূল যুদ্ধঘটনা হইতেও এই দৃশ্যের গুরুত্ব অধিক; সিরাজের মানস-মৃত্যু যেন তখনই ঘটিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ-বর্ণনা যেন climax বা উচ্চগ্রাম হইতে ঘটনার নাটকীয় অবতরণ, বহুপূর্ব হইতেই যাহা প্রত্যাশিত ছিল। অতঃপর সর্বশেষ পঞ্চম সর্গে নির্বহণ, catastrophe বা সিরাজের শোচনীয় পরিণতি—কবি উহার নামকরণও করিয়াছেন 'শেষ আশা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতে 'আশার নির্বাণ' নাম আরও উপযুক্ত হইত। পঞ্চাঙ্ক নাটকের এই পূর্ণবৃত্ত রূপ পঞ্চসর্গবদ্ধ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যকে যে নাট্যরসাশ্রিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নাট্যরূপদানকালে এই পঞ্চসর্গ-বিভাগের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, জানিতে কৌতুহল হয়। তবু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নাট্যবোধ নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিগত নহে, তাই নাটোপোযোগী আবহ-রচনায় তাঁহার আগ্রহ কম।

উপাখ্যান-অংশ ইহাতে অবশ্যই সামান্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাহিনীও তো কিছুই নয়, তবু মধুসূদন দেবচক্রান্ত, লক্ষ্মণের প্রস্তুতি, রাবণের প্রতিশোধ-উদ্যম প্রভৃতির উপযোগী নানা পরিপূরক ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করিয়া মূল ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মহাকাব্যের ব্যাপকতার জন্য উহার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র এই গীতি-লক্ষণাক্রান্ত কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্যকে মুখ্য না করিয়া কেন্দ্র-ভাবের উপযোগী পরিবেশ-রচনার দিকেই যেন অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই কেন্দ্র-ভাব—পলাশিতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিলুপ্তি এবং তজ্জন্য সমগ্র জাতির হইয়া কবির অশ্রুবর্ষণ। ঘটনা যেটুকুও আছে, তাহা শুধু যেন সেই বেদনা-উচ্ছ্বাসকে বহন করিবার জন্য, গীতিসৌন্দর্যময় কল্পনাপ্রোজ্জ্বল বর্ণনাসমূহকে ধারণ করিবার জন্য—এই কাব্যের উদ্দেশ্য যে মধুসূদনের ন্যায় শিল্পবস্তু গঠন নয়, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের ন্যায় কাহিনী-কথনও নয়, বরং বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের উদ্ঘাটন মাত্র; তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য-আস্বাদনও সম্ভব হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"এই কাব্যের একটি বিশেষ দোষ কাব্যের মন্থর গতি। ইহাতে কার্য (action) অতি অল্প; যাহা আছে তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে, অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে।" কিন্তু কার্য বা ঘটনা বর্ণনা ইহার লক্ষ্য ছিল না। যদি উহা বিস্তৃত কাহিনী-কাব্য বা পূর্ণাঙ্গ নাটক হইত, তাহা হইলে

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশি সমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত কারাগার। (৫ম সর্গ)

এই চরণদ্বয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত ঘটনাসমূহকে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িত। কিন্তু নবীনচন্দ্রের নিকট ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা, প্রতিপক্ষ ক্লাইভের সংকল্প-দৃঢ়তা, সিরাজের কৃতকার্যের বিভীষিকা, মোহনলালের খেদ, সিরাজের পতনের বেদনা—বিচিত্র ঘটনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, তাঁহার কেন্দ্র-ভাব প্রকাশের জন্য এই কয়টি বিষয়ের অনুকূল পরিবেশ রচনাতেই তিনি সমস্ত বর্ণনক্ষমতা নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আর বঙ্কিমের ভাষায়—'নবীনচন্দ্র বর্ণনায় একরূপ মন্ত্রসিদ্ধ।' অবশ্য এই সব বর্ণনায়ও নানাস্থানে বাহুল্য আছে, অসংগতি আছে, অসংযম আছে; তবু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে চিত্র ও সঙ্গীতরসের গুণে উহারা পাঠককে আবিষ্ট করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রথম সর্গ (শেঠ-ভবনে ষড়যন্ত্র) কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এবং দ্বিতীয় সর্গেই কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। আবার তিনিই পরে বলিয়াছেন—"প্রথম সর্গের দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে।" সুতরাং উহার উপযোগিতা একরূপ স্বীকৃতই হইল। বস্তুতঃ প্রথম সর্গেই সমগ্র কাব্যঘটনার 'মুখ' রচিত হইয়াছে। কেননা পূর্বেই একস্থানে বলিয়াছি—"পলাশিপ্রান্তরের যুদ্ধ তো যুদ্ধের উপসংহার মাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের (war of nerves) আকারে পূর্ব হইতেই সংঘটিত হইতেছিল কলিকাতা, হুগলী, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া।" সুতরাং এই নেপথ্য-উদ্যোগ বাদ দিলে কাব্য নিরবলম্ব হইয়া পড়িত। এই সর্গেই বিপরীত চিন্তার স্রোত-সংঘাত জাগিয়া উঠে রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণীতে, আর তাহাতে ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কবি তদুপযোগী পরিবেশটিও রচনা করিয়াছেন সুন্দর—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
নিবিড় জলদাবৃত গগন-মণ্ডল,

*   *   *

তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।

আর তাহার মধ্যে মুর্শিদাবাদে রুদ্ধদ্বার শেঠ-ভবনের গবাক্ষপথে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি যেমন গোপন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিতেছে, তেমনি মন্ত্রণাকারীদের পশ্চাতে প্রাচীরে বিলম্বিত লোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনীর চিত্র সমগ্র পরিবেশটিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। তাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন—

চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ-বর্ণনা যেন climax বা উচ্চগ্রাম হইতে ঘটনার নাটকীয় অবতরণ, বহুপূর্ব হইতেই যাহা প্রত্যাশিত ছিল। অতঃপর সর্বশেষ পঞ্চম সর্গে নির্বহণ, catastrophe বা সিরাজের শোচনীয় পরিণতি—কবি উহার নামকরণও করিয়াছেন 'শেষ আশা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতে 'আশার নির্বাণ' নাম আরও উপযুক্ত হইত। পঞ্চাঙ্ক নাটকের এই পূর্ণবৃত্ত রূপ পঞ্চসর্গবদ্ধ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যকে যে নাট্যরসাশ্রিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নাট্যরূপদানকালে এই পঞ্চসর্গ-বিভাগের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, জানিতে কৌতূহল হয়। তবু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নাট্যবোধ নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিগত নহে, তাই নাটোপোযোগী আবহ-রচনায় তাঁহার আগ্রহ কম।

উপাখ্যান-অংশ ইহাতে অবশ্যই সামান্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাহিনীও তো কিছুই নয়, তবু মধুসূদন দেবচক্রান্ত, লক্ষ্মণের প্রস্তুতি, রাবণের প্রতিশোধ-উদ্যম প্রভৃতির উপযোগী নানা পরিপূরক ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করিয়া মূল ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মহাকাব্যের ব্যাপকতার জন্য উহার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র এই গীতি-লক্ষণাক্রান্ত কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্যকে মুখ্য না করিয়া কেন্দ্র-ভাবের উপযোগী পরিবেশ-রচনার দিকেই যেন অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই কেন্দ্র-ভাব—পলাশিতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিলুপ্তি এবং তজ্জন্য সমগ্র জাতির হইয়া কবির অশ্রুবর্ষণ। ঘটনা যেটুকুও আছে, তাহা শুধু যেন সেই বেদনা-উচ্ছ্বাসকে বহন করিবার জন্য, গীতিসৌন্দর্যময় কল্পনাপ্রোজ্জ্বল বর্ণনাসমূহকে ধারণ করিবার জন্য—এই কাব্যের উদ্দেশ্য যে মধুসূদনের ন্যায় শিল্পবস্তু গঠন নয়, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের ন্যায় কাহিনী-কথনও নয়, বরং বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন মাত্র; তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য-আস্বাদনও সম্ভব হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"এই কাব্যের একটি বিশেষ দোষ কাব্যের মন্থর গতি। ইহাতে কার্য (action) অতি অল্প; যাহা আছে তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে, অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে।" কিন্তু কার্য বা ঘটনা বর্ণনা ইহার লক্ষ্য ছিল না। যদি উহা বিস্তৃত কাহিনী-কাব্য বা পূর্ণাঙ্গ নাটক হইত, তাহা হইলে

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশি সমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত কারাগার। (৫ম সর্গ)

এই চরণদ্বয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত ঘটনাসমূহকে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িত। কিন্তু নবীনচন্দ্রের নিকট ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা, প্রতিপক্ষ ক্লাইভের সংকল্প-দৃঢ়তা, সিরাজের কৃতকার্যের বিভীষিকা, মোহনলালের খেদ, সিরাজের পতনের বেদনা—বিচিত্র ঘটনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, তাঁহার কেন্দ্র-ভাব প্রকাশের জন্ম এই কয়টি বিষয়ের অনুকূল পরিবেশ রচনাতেই তিনি সমস্ত বর্ণনক্ষমতা নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আর বঙ্কিমের ভাষায়—'নবীনচন্দ্র বর্ণনায় একরূপ মন্ত্রসিদ্ধ।' অবশ্য এই সব বর্ণনায়ও নানাস্থানে বাহুল্য আছে, অসংগতি আছে, অসংযম আছে; তবু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে চিত্র ও সঙ্গীতরসের গুণে উহারা পাঠককে আবিষ্ট করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রথম সর্গ (শেঠ-ভবনে ষড়যন্ত্র) কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এবং দ্বিতীয় সর্গেই কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। আবার তিনিই পরে বলিয়াছেন—"প্রথম সর্গের দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে।" সুতরাং উহার উপযোগিতা একরূপ স্বীকৃতই হইল। বস্তুতঃ প্রথম সর্গেই সমগ্র কাব্যঘটনার 'মুখ' রচিত হইয়াছে। কেননা পূর্বেই একস্থানে বলিয়াছি—"পলাশিপ্রান্তরের যুদ্ধ তো যুদ্ধের উপসংহার মাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের (war of nerves) আকারে পূর্ব হইতেই সংঘটিত হইতেছিল কলিকাতা, হুগলী, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া।" সুতরাং এই নেপথ্য-উদ্যোগ বাদ দিলে কাব্য নিরবলম্ব হইয়া পড়িত। এই সর্গেই বিপরীত চিন্তার স্রোত-সংঘাত জাগিয়া উঠে রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণীতে, আর তাহাতে ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কবি তদুপযোগী পরিবেশটিও রচনা করিয়াছেন সুন্দর—

> দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
> নিবিড় জলদাবৃত গগন-মণ্ডল,
> * * *
> তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।

আর তাহার মধ্যে মুর্শিদাবাদে রুদ্ধদ্বার শেঠ-ভবনের গবাক্ষপথে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি যেমন গোপন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিতেছে, তেমনি মন্ত্রণাকারীদের পশ্চাতে প্রাচীরে বিলম্বিত লোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনীর চিত্র সমগ্র পরিবেশটিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। তাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন—

"বোধহয়, 'মেঘনাদবধের' আরম্ভ ভিন্ন বাংলার কোন কাব্যের প্রারম্ভ-বর্ণনাতেই এমন ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য এবং পরিম্লান মনোহারিত্ব দেখান হয় নাই।" এমনকি, 'বৃত্রসংহারের' প্রথম সর্গে 'পাতালপুরে দেবগণের মন্ত্রণা' শব্দালঙ্কারপূর্ণ হইলেও এত গভীর অর্থবহ হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা।

দ্বিতীয় সর্গে বৃটিশ-সৈন্যদের বিচিত্র মনোভাববিশ্লেষণে, ক্লাইভের অন্তর্দ্বন্দ্বময় চিত্ত-উদ্ঘাটনে, ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর দিব্যমূর্তি বর্ণনে নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা যেন মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন উভয়েই এই সর্গ সম্পর্কে সপ্রশংস অভিমত দিয়াছেন। কেবল দীর্ঘ 'আশা-বন্দনা'টি এখানে অবান্তর বলিয়া মনে হয়, যদিও কালীপ্রসন্ন বলিয়াছেন—"আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে ভাবে ক্লাইভকে সহসা অভিনয়ভূমিতে আনিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে।" আমাদের বিবেচনায় বৃটিশ-সৈন্যদের বর্ণনার পরেই—

শিবিরে অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইভ, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

এই বর্ণনাটুকুই ক্লাইভকে উপস্থাপনার পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতময় হইত, 'আশার' মধ্যস্থতা নিরর্থক। আর যে সমস্ত কারণে আশাকে 'কুহকিনী', 'মায়াবিনী' বলা হইয়াছে, ক্লাইভের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। তাঁহার নিকট উহা ছলনাময়ী আশা নয়, বরং সার্থক আত্মবিশ্বাস ; তাই তাঁহার উক্তি—

না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি।

এই 'আশা' বন্দনারই এক স্থলে নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মচারীর বেদনা-অপমানের যে সংক্ষিপ্ত অথচ গ্লানিময় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যেন বাঙ্গালী কেরাণীরই আত্মধিক্কার—

ধর্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্মচারী,
উদরে জঠরজ্বালা, গুরু কার্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত ভয়ে।

'আশা'-বন্দনার ন্যায় এই সর্গশেষে বৃটিশ সৈনিকদের গীতটিও অপ্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন—উভয়ে ইহার প্রশংসা করিলেও মনে হয়, তদ্দ্বারা বৃটিশ শৌর্য প্রকাশের বিশেষ সহায়তা যেমন হয় নাই, তেমনি গীতিস্বরও ততটা ঝঙ্কৃত হয় নাই।

তৃতীয় সর্গে ঘটনা নাই, কিন্তু চরম ঘটনার—মানস-বিভীষিকাচ্ছন্ন সিরাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির—নিগূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। কালীপ্রসন্ন এই সর্গ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কবি কল্পনাযোগে পলাশির ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে।...... ইহার মধ্যেই সহসা অন্য কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল গণনা, আর কোথায় রূপসীদের রূপের তরঙ্গ। কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র হাতে ধরিয়া নবাব শিবিরের বিলাসগৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই বিলাসতরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন। ইহা যেন এক গানের মধ্যে আর এক গান, এক রাগিনীর মধ্যে আর এক রাগিনী, ইহাই নবীনচন্দ্রের অসাবধানতা।" সত্যই বিলাসবর্ণনার বাহুল্যে কবির অসাবধানতা এখানে চরমে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ কবি এই সুযোগে এক রোমাঞ্চকর ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা সিরাজের মানস-দ্বন্দ্বের পটভূমিরূপে কাজ করিবে, আবার পূর্বেই ভিন্নরসের আস্বাদ দিয়া পরবর্তী সর্গের যুদ্ধ-ঘটনাকেও ঘোরতর করিয়া তুলিবে। বায়রণের Childe Harold-এ বর্ণিত ওয়াটারলু-যুদ্ধের পূর্বরাত্রির বর্ণনা এখানে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সর্গে ক্লাইভকে পুনরায় দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ চিত্তে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য আছে। পরদিনের যুদ্ধফল তো পূর্বস্থিরীকৃত ব্যাপার, সুতরাং এই বর্ণহীন ঔৎসুক্যহীন যুদ্ধকে কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে প্রতিপক্ষকেও আশঙ্কা-বিচলিত এবং প্রস্তুতি-তৎপর রাখিতে হয়। 'মেঘনাদ বধ' উদ্যোগে লক্ষ্মণের চণ্ডী-আরাধনার তাৎপর্য ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। দ্বিতীয় সর্গের গীতটির ন্যায় এই সর্গেও বিলাসমুহূর্তে বামাকণ্ঠনিঃসৃত বিরহগীতটি নিরর্থক মনে হয়, যদিও স্বতন্ত্রভাবে এই সঙ্গীতসমূহের গীতিসৌন্দর্য প্রশংসনীয়। তবুও এই সর্গের শেষে বৃটিশ-যুবকের প্রণয়গীতটির কিছুটা সার্থকতা এই কারণে থাকিতে পারে যে, উহাদ্বারা কবি ক্লাইভের কঠোর চিত্তের এক করুণমধুর

দুর্বল দিক উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যেখানে কবি-কল্পনা সর্বাংশে রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে।

সেই তান ক্লাইভের পশিল শ্রবণে,
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয়।
সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহ হইল নির্গত—
'প্রিয়তমে মেস্কিলিন!—জনমের মত।'

চতুর্থ সর্গ 'যুদ্ধ'। একদিনে মাত্র নয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সংঘটিত সাধারণ যুদ্ধ হইলেও এই সর্গে কবি যে ইহাকে প্রভূত গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহা সূচনা-শ্লোক হইতেই উপলব্ধ হয়।

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখ ভরে ধীরে দিনমণি।

*　　　*　　　*

ক্লাইভের মনে হল স্ফূর্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

অবশ্য সূচনাতেই বিজয়ী-বিজিত সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের কৌতূহল কিছুটা ম্লান করিয়া দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুদ্ধ-পরিবেশ রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাঙলাকাব্যে এই প্রথম এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের আবেগময় বর্ণনা মিলিল, তৎসহ মোহনলালের তেজোদৃপ্ত অথচ করুণ খেদোক্তি সংযুক্ত হওয়ায় এই সর্গ একদা শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠস্থ ছিল। কালীপ্রসন্ন তাই ইহাকে 'বাঙালী মাত্রেরই অভিমানের বিষয়' বলিয়াছিলেন। বাঙালীসেনার প্রতি মোহনলালের প্রতিরোধ-আহ্বান অংশটুকু রচনার প্রেরণা নবীনচন্দ্র রঙ্গলালের 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য' (পদ্মিনী-উপাখ্যান) হইতে পাইতেও পারেন, কিন্তু নবীনচন্দ্র-রচিত মোহনলালের উদ্দীপক আহ্বান আন্তরিক উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধতর। অস্তগামী সূর্যকে উদ্দেশ্য করিয়া মুমূর্ষু মোহনলালের পরাধীনতাসূচক খেদোক্তি কাব্যের প্রথম সংস্করণে কবির বক্তব্যরূপেই ছিল, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রস্তাবে উহা পরে মোহনলালের মুখে দেওয়া হয়। এই খেদোক্তিই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের

সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও স্মরণীয় অংশ। একদা ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মত উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল। যাহা হোক, মোহনলালের এই বেদনার্ত ভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলে যে আরও গভীর তাৎপর্যময় হইয়া উঠিত,—ইহা বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করিয়াছিলেন। অযথা দৈর্ঘ্যের জন্য মোহনলালের চিন্তা ও বক্তব্য যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম সর্গের 'শেষ আশা' নামকরণের উপলক্ষ্য মন্দভাগ্য সিরাজ, ইহার মুখ্য ঘটনা সিরাজের হত্যা। বাহুল্যপূর্ণ হইলেও মুর্শিদাবাদের সর্বব্যাপী বিজয়োৎসব, ইংরেজ-শিবিরের আনন্দ-উল্লাস—সমস্তই ঐ শোচনীয় ঘটনার পটভূমি রচনা করিয়াছে। উহার প্রধান সার্থকতা অবস্থার বৈপরীত্য-সৃষ্টিতে (contrast)। কবি সুস্পষ্টই বলিয়াছেন—

সেই নৃত্য সেই গীত রয়েছে সকল,
হায়! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল?

এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া নবাব সিরাজ ও বেগম লুৎফার মর্মান্তিক পরিণতি আরও গভীর বেদনাময় রূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব হইয়াছে।

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ;

আর সেই সঙ্গে অপরদিকে কারাগারে—

জাগিল সন্ত্রাসে বামা, সিরাজদ্দৌলার
শিবির সঙ্গিনী হায়! সেই বিষাদিনী!

এবং—

কারাগারে কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে?

প্রমত্ত মীরজাফর ও মীরণের চিন্তাক্লিষ্ট মানস-চিত্র উদ্‌ঘাটন দ্বারা কবি ইংরেজ-কবলিত বাঙ্গালার বিকৃত ভাগ্যের প্রতি নিজ বিরূপতাই যেন প্রকটিত করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বদেশাভিমানী কবির ক্ষুব্ধ তিরস্কার তৃতীয় সর্গে মন্ত্রণাকারীদের সম্পর্কে (৭ম, ৮ম শ্লোক), পঞ্চম সর্গে মীরজাফর (১২শ শ্লোক) এবং হত্যাকারী মহম্মদী বেগ সম্পর্কে (৪৪শ শ্লোক) তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিষাদান্তক এই কাব্যের শেষ সর্গে মৃত্যুপ্রতীক্ষমান সিরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া কবির অনুরূপ উক্তি—

রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার, নিষ্ঠুর, দুর্জন!
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।

যেন অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, এবং এক্ষেত্রে সেক্সপীয়রের সাইলক-চরিত্র সম্পর্কে প্রযুক্ত মন্তব্যটুকু প্রয়োগ করিয়া বলা চলে—'He was more sinned against than sinning.' সিরাজ-সম্পর্কে কবি-প্রযুক্ত বিশেষণ-সমূহ যে একেবারে নিরর্থক নহে, তাহা আমরা পূর্বে বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে যদিও জানিয়াছি, তবু সিরাজের এতটা প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবতঃ কবির সজ্ঞান-চিত্তেরও অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, এক্ষেত্রেও প্রবীণ ঐতিহাসিকের গবেষণা নবীনচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে।—"The fallen monarch abased himself to the ground, made frantic appeals for mercy, and promised to live in harmless obscurity if only his life was spared. But all his efforts proved futile."[৩৫] সিরাজের প্রতি কবি যে সহানুভূতিসম্পন্নই ছিলেন—একথাও আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এবং সেই সহানুভূতির উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে কাব্যের সমাপ্তিসূচক চরণদ্বয়ে—

নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন।

সিরাজের পতনের সহিত ভারতের পতন মিলিত হইয়া এক মর্মান্তিক জাতীয় ইতিহাস রচিত হইল, আর সেই ইতিহাসেরই কাব্যরূপ হিসাবে 'পলাশির যুদ্ধের' গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' চরিত্রচিত্রণের অভাব বোধ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষও বলিয়াছেন—"পলাশির যুদ্ধের অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।" এই ত্রুটি নির্দেশসত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন উহার কতিপয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া নবীনচন্দ্রের চরিত্রায়নের প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হোক, একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মহাকাব্যের বিরাট বিস্তৃতি ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টির অবসর কবি ইহাতে করিয়া লন নাই। পরাধীনতায় নিরুদ্ধকণ্ঠ একটি জাতির ধূমায়িত বেদনাবহ্নি ও

বাষ্পোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং একটি প্রবল ভাব বিশদ বর্ণনায় ফুটাইয়া তোলাই যে এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহা কালীপ্রসন্নও বুঝিয়াছিলেন দেখা যায়। নবীনচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন—"চরিত্রচিত্রণ পলাশির যুদ্ধ রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল না।"[৩৩] এই ধরণের কাব্যে চরিত্রসৃষ্টির সুযোগও নাই। এক একটি সর্গে এক একটি চরিত্র বিশেষ কোন ভাবের প্রতীকরূপে উপস্থিত, তাহার উক্তি বা আচরণে সেই ভাব ব্যঞ্জিত হইলেই কাব্য-প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেল। কেবল মীরজাফর প্রথম ও পঞ্চম সর্গে, ক্লাইভ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে, সিরাজ এবং লুৎফা তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে দুইবার করিয়া উপস্থিত;—তন্মধ্যে আবার কেহই দুই সর্গেই সমানরূপে প্রধান ও সক্রিয় নহে। মীরজাফর প্রথম সর্গে, ক্লাইভ দ্বিতীয় সর্গে, সিরাজ তৃতীয় সর্গে এবং লুৎফা পঞ্চম সর্গে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাণী ভবানী ও মোহনলালের মত দুইটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ সর্গে মাত্র একবার করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ষড়যন্ত্রকারীদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন—"কবি অতি সাবধানে সুকৌশলে, ইহাদের এক একজনের মনের ভাব এক এক রূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে শব্দনৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্লভ কপট ধার্মিক। তাঁহার মন কূর্মশুণ্ডবৎ—উহা একবার বাহিরে আসে, আবার সংকুচিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক বিশ্বাস করেন না।...তাহার পর জগৎশেঠ অকপট, অসন্দিগ্ধ চিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ এবং অভিমানবিষে জর্জরিত।...রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই, কথা যেন ফুটি ফুটি করিয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে।...রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর।...কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা।" কালীপ্রসন্ন মীরজাফর চরিত্র বিশেষ বিশ্লেষণ করেন নাই। ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণার উদ্বোধনকর্তা মন্ত্রী রায়দুর্লভের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সিরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতায় স্বদেশের দুঃখ-ভাবনায় যেন তিনি যথার্থ উদ্বিগ্ন; কিন্তু তাঁহার—

আমা হতে এই কর্ম হবে না সাধন,

* * *

নাহি কাজ অতএব পাপ-মন্ত্রণায়।

প্রভৃতি উক্তি যে একান্ত কূটনৈতিক ছলনার অভিব্যক্তি, তাহা বুঝিয়াও যেন মীরজাফর নিজের সম্পর্কে কোন আশার ইঙ্গিত পাইলেন না। তাই—

নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,

প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।

রায়দুর্লভের কপট উক্তির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেই তিনি উৎসুক, অন্যদের নিকট হইতে চরম প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার আশায় তাঁহার নির্বাক প্রতীক্ষা। তাই রাজবল্লভ যখন সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন বুঝি নিজ স্বার্থের সম্ভাবিত সিদ্ধির আনন্দে—

উঠিল কাঁপিয়া,

দুরু দুরু করি মীরজাফরের হিয়া।

পঞ্চম সর্গে নবীন-নবাব প্রবীণ মীরজাফরকে চাটুকার-পরিবৃত কামিনী-বিলাসমত্তরূপে চিত্রিত করিয়া চরম অপদার্থতার জন্য কবি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিদ্বারা ক্লাইভের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করা হইয়াছে, তাহা রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আপন শক্তিতে অটল বিশ্বাস; এবং সেইক্ষণে এই বিদেশী বিজয়ীর পূর্ব-পরিচয়ও আত্মচিন্তাসূত্রে বিবৃত করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণেই ক্লাইভের চরিত্র সম্যক বিকশিত—

গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি সুরূপের চিহ্ন,.........
... ... অথচ যুবার
সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়।... ...

* * *

বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোতঃ ভয়ঙ্কর,

অন্তর্ভেদী তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।

কালীপ্রসন্ন স্থন্দর বলিয়াছেন—"যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্তি ও অকীর্তির বিভিন্ন মূর্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক-দংশন, লোভের অঙ্কুশ তাড়না এবং অভিমানে প্রদীপ্ত বহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় মূর্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায় দিব্যমূর্তি এক নারীর আবির্ভাব কবি-কল্পনার এক আশ্চর্য সৃষ্টি।" বলাবাহুল্য, এই নারী ইংলণ্ডেশ্বরী। রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টির আগ্রহে এবং ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতদানের উদ্দেশ্যে কবি এখানে কল্পনার আশ্রয় লইলেও এই দৈবী আবির্ভাবকে সংশয়-পীড়িত ক্লাইভের নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীকস্বরূপ বলা চলে।

রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত চরিত্রচিত্রণে কবির শ্রদ্ধা ও সংযম প্রশংসনীয়। সূচনায় কেবল তাঁহার রূপ নয়, অন্তঃপ্রকৃতিও স্বল্প কথায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—

একটি রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে
গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণ নয়ন,—

* * *

আবার পলকে সেই নয়নযুগল
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময়;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।

'রাণীর কি মত'? এই প্রশ্নের দৃঢ় উত্তরের মধ্যেই সিরাজের প্রতি রাণী ভবানীর রমণীচিত্তসুলভ অনুকম্পা পীযূষ-নির্ঝরের মত ক্ষরিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা, কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!)

* * *

কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

যৌথ-মন্ত্রণায় এই ভিন্ন স্বর যে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাৎপর্যময় ইঙ্গিত, তাহা রাণী ভবানীর ভাষণ এবং প্রলয়ঙ্কর প্রকৃতি-দৃশ্যের অবতারণা দ্বারা

পরিস্ফুট করা হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, উন্মত্তা প্রকৃতি, নৃমুণ্ডমালিনীর প্রতিকৃতি,—এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে রাণী ভবানীর প্রদীপ্ত উক্তি—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

গভীর দ্যোতনাময় হইয়া উঠিয়াছে। রাণী ভবানীর এবং মোহনলালের স্বদেশ-ব্যাকুলতার কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যের সহিত হিন্দুশৌর্যের পুনরুদ্ধার-বাসনাও জড়িত ছিল দেখা যায়। রাণী ভবানীর ক্ষেত্রে না হইলেও মোহনলালের ক্ষেত্রে উহা দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। কেন না, মোহনলালের আনুগত্য নবাব সিরাজের প্রতি, অথচ বেদনা হিন্দুশৌর্যের চির অবলুপ্তির জন্য।

সিরাজ-চরিত্রচিত্রণে ইতিহাসানুগত্য সম্পর্কে বিতর্কের আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। প্রথম সর্গে মন্ত্রণাকারীদের বিরূপ বর্ণনা হইতেই সিরাজের চরিত্র আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তৃতীয় সর্গের সূচনাতেই সেই উচ্ছৃঙ্খল নবাবকে দেখিতে পাই—

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,

কিন্তু—
এমন ইন্দ্রিয় সুখসাগরে ডুবিয়া
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?

ষড়যন্ত্র-আশঙ্কায় এবং শত্রুপক্ষের যুদ্ধায়োজন-ভীতিতে বিচলিত সিরাজের দুর্বলতা কবি এখানে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই দুর্বল মুহূর্তেই অনুশোচনায়—

ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু।

কখনো প্রতিরোধ স্পৃহা, কখনো পরাজয় বরণ দ্বারা আত্মত্রাণ বাসনা—এই বিপরীত দ্বন্দ্বে বিক্ষত সিরাজের বিভীষিকাময় স্বপ্নদর্শনে তাহার তৎকালীন মনোভাবের সুনিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। পঞ্চম সর্গে কারারুদ্ধ আত্মচিন্তানিরত হতভাগ্য সিরাজকে যেন হিন্দুসংস্কারানুরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখি, যাহার চরম পরিণতি হত্যাকারী মহম্মদী বেগের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা। এই চিত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের সংশয় পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

তৃতীয় সর্গে স্বপ্নবিভ্রান্ত উন্মাদপ্রায় নবাবকে স্নেহ-সান্নিধ্য দানকালে আমরা বেগম লুৎফাকে প্রথম দেখিলাম—

শান্ত অশ্রুমুখী সেই রমণীরতন

* * *

প্রেমপূর্ণ স্থির নেত্রে, আনত বদনে
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখপানে।

পতিব্রতা সীতা ও সাবিত্রীর সহিত তুলনা করিয়া কবি লুৎফাকে এক পবিত্র রমণী-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পঞ্চম সর্গের সমস্ত ট্রাজিক কারুণ্য লুৎফাকে কেন্দ্র করিয়া যেন সঞ্চিত হইয়াছে। কারাগারে ভিন্ন কক্ষে অবরুদ্ধা লুৎফা—

অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগল রেখা কপোল কমলে।

পতিচিন্তাক্লিষ্টা কোমলপ্রাণা বেগম লুৎফা কল্পিত-ঘাতকের হস্ত হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার মানসে—

ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে উন্মাদিনী প্রায়।
অবরুদ্ধ কক্ষ হতে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়
পড়িল ভূতলে স্বর্গ-প্রতিমার মত।

তথাপি লুৎফার অন্তরের বিশ্বাস অবিচলিত—

'সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার পরশে আমার!

* * *

তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার'—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।

এখানে উপমাপ্রয়োগে কবির যে প্রযত্ন, তাহা সহমর্মিতারই পরিচায়ক। তৎপর—

রক্তস্রোতে শোকস্রোতে হয়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

লুৎফার জীবনাবসানের এই বেদনা কবি অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মত সহজে মিলাইয়া যাইতে দেন নাই। বিলাস-বিহ্বল পুরী যখন নীরব অবসন্ন, তখন—

কেবল রমণীশোকে নীরবে রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

দাম্পত্য-প্রণয়োৎকণ্ঠার এই আবেগ-মধুর অশ্রুসিক্ত চিত্রই সমগ্র কাব্যের সার্থক গীতি-অংশ, এবং নবীনচন্দ্রের গীতিপ্রবণ কবি-কল্পনাও এইখানে গভীর আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ইতিহাস মৌন, জীবনস্পন্দনই মুখর।

তাই বলি, 'পলাশির যুদ্ধে' পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য চরিত্রচিত্রণের অভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ কবি রাখেন নাই। যদিও চরিত্রচিত্রণ নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না, তবু কাহিনী এবং পরিবেশ সূত্রে সমাগত বিচিত্র চরিত্র-সমূহের এক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকে তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া কবি তাহাদিগকে উজ্জ্বলতায় ভরিয়া দিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্যের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন— 'নবীনচন্দ্র বর্ণনায় একরূপ মন্ত্রসিদ্ধ।' উক্তিটি সর্বাংশে সার্থক। নবীনচন্দ্রের কাব্যে বুদ্ধির চাইতে হৃদয়ের আবেদনই বেশী, তাই তাঁহার কল্পনাবিলসিত বর্ণনা আমাদের হৃদয় আলোড়িত করে। মনে রাখিতে হইবে, এই গীতিধর্মী গাথাকাব্যে নবীনচন্দ্রের মনোযোগ পরিবেশ বর্ণনায় এবং চিত্ররচনায় যতটা নিয়োজিত ছিল—ঘটনা বিশ্লেষণে ততটা নহে। প্রথম সর্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গভীর ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা ও সুদূরপ্রসারী পরিণতির যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিবেশ বাহিরে প্রকৃতিবক্ষে কবি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার শুধু যাথার্থ্য নয়, গুরুত্বও উপলব্ধি করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
নিবিড় জলদাবৃত গগন-মণ্ডল,
বিদারী আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলি চঞ্চল। (১ম সর্গ)

দুষ্ট ফণীর আকাশ-বিদারণ কি শুধুই প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র,—না তাহা ষড়যন্ত্রকারীদের আঘাতে ভারতভাগ্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত? আবার 'ধরা যেন

বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,'—এই চিত্রও কি দেশের ভাবী অবস্থার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না? প্রথম সর্গের বিশ্লেষণকালে আমরা এই পরিবেশ-সৃষ্টির সার্থকতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

শুধু ভয়াবহ অন্ধকার-চিত্র নয়, বর্ণনাস্রোতের মধ্য দিয়া যে সব প্রকৃতি-চিত্র নানা স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও কম উপভোগ্য নহে। যেমন অপরাহ্লের চিত্র—

দিবা অবসান প্রায়; নিদাঘ ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিনী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ।
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিনী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে। (২য় সর্গ)

এখানে 'তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা' এবং শেষ চরণদ্বয়ে বর্ণিত চিত্রের প্রকাশ-রীতি নিপুণ শিল্পীর যোগ্য। আবার পর্বত ও সমুদ্র বর্ণনার মনোহারিত্বও চোখে পড়ে, পর্বত-সমুদ্রশোভিত দেশের কবির পক্ষে ইহা স্বাভাবিকও বটে।

অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ঐ দেখ উর্দ্ধশিরে পরশে গগন,—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
উর্মির উপরে উর্মি, উর্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে। (২য় সর্গ)

এখানেও শেষ চরণদ্বয় সম্পর্কে পূর্বোক্ত মন্তব্যটুকু প্রযোজ্য।

নবীনচন্দ্রের আবহ-রচনা-দক্ষতার পরিচয় আমরা ষড়যন্ত্র-সভা, নবাব-শিবিরের উদ্দামউল্লাস, যুদ্ধ, যুদ্ধ-পরবর্তী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির বর্ণনায় পাইয়াছি, এবং প্রতি সর্গের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছি। গীতিসৌন্দর্যময় বর্ণনাও এই কাব্যে দুর্লভ নহে। যেমন, ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ণনা—

> শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
> কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত
> অপূর্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
> চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত। (২য় সর্গ)

অথবা, বিরহিণীর মূর্তি-চিত্রণ—

> অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রিমা,
> বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
> নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
> ঝরেছিল যেই রূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
> প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
> বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি। (২য় সর্গ)

'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রেমব্যাকুল গীতিকবি যেন এখানে বর্ণনা-ঐশ্বর্যে আরও সমৃদ্ধতর।

সূত্র-নির্দেশ

১। From Byron's 'Memoranda' quoted in Poetical Works of Byron—Ed. by W. M. Rossetti.

২। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২২৭-২৮ পৃঃ।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন, ৩২৭ পৃঃ।

৪। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ৫৭ পৃঃ।

৫। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬ পৃঃ। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৩০ পৃঃ।

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০ পৃঃ।

৭। 'Here, too, Girish's part as Clive was superb and movements of his body quite befitting the hero of Plassey.'—The Indian Stage, Vol. III, by Dr. H. N. Das Gupta, p. 10.

৮। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার, ২৬৯ পৃঃ।

৯। Report to the Hon'ble Secret Committee—'স্বাধীনতা', শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৪) অমিতাভ গুপ্তের 'মানদণ্ড ও রাজদণ্ড' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

১০। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১১। 'আনন্দমঠের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছিলেন—'আমি উপন্যাস লিখিয়াছি, ইতিহাস নহে।'

১২। ২৫।২।১৯০৬ এবং ২৩।৩।১৯০৬ তারিখে লিখিত পত্র। 'গিরিশচন্দ্র'—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রঃ।

১৩। ৭।৩।১৯০৬ তারিখে লিখিত পত্র। 'গিরিশচন্দ্র'—গঙ্গোপাধ্যায় দ্রঃ।

১৪। 'ভারতী', শ্রাবণ, ১৩০৫।

১৫। ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন, তৃতীয় উদ্দ্যোত ; ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

১৬। সিরাজদ্দৌলা—মৈত্রেয়, ৩২৪ পৃঃ।

১৭। ঐ ১৮০-৮১ পৃঃ।

১৮। 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫।

১৯। বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম প্রকাশ ১৩০৮)।

২০। History of Bengal, Vol. II (1948)—Sir Jadunath Sarkar, pp. 468-69.

২১। পলাশির যুদ্ধ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১০৪ পৃঃ।

২২। সিরাজদ্দৌলা (নাটক)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৯০৬ ; সিরাজদ্দৌলা (নাটক)—শচীন সেনগুপ্ত, ১৯৩৮।

২৩। বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)—বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫০-৫১ পৃঃ।

২৪। সুবোধরঞ্জন রায়কে লিখিত ১৯।১২।৫৬ তারিখের পত্র।

২৫। বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)—বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৯ পৃঃ।

২৬। History of Bengal, Vol. II—Sarkar, pp. 476-77.

২৭। Ibid. p. 497.

২৮। যথাক্রমে, 'জাতি-বৈর'—যোগেশচন্দ্র বাগল, ৩ পৃঃ ; এবং Life of Raja Digambar Mitra – Bholanath Chandra, p. 26, গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত।

২৯। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১৮ পৃঃ।

৩০। 'বাঙ্গালী'—গোবিন্দ-চয়নিকা, ৪৭ পৃঃ।

৩১। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২২২-২৩ পৃঃ।

৩২। ঐ, ঐ ২২৫ পৃঃ।

৩৩। ঐ, ঐ ২২৬ পৃঃ।

৩৪। Introduction to the Study of Literature—Hudson, p. 108.

৩৫। History of Bengal, Vol II—Sarkar, p. 496.

৩৬। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২২৬ পৃঃ।

নবীনচন্দ্র ও বায়রণ

'অবকাশরঞ্জিনী'র খণ্ডকবিতাসমূহের আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে বায়রণের কবিপ্রতিভার মূলপ্রবৃত্তির সহিত নবীনচন্দ্রের কবি-প্রবৃত্তির সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছি, এবং নানাক্ষেত্রে উভয়ের কবিতার উল্লেখ করিয়া সেই সাদৃশ্য প্রমাণেরও চেষ্টা করিয়াছি। তেমনি 'পলাশির যুদ্ধ' প্রসঙ্গেও নবীনচন্দ্রের উপর কবি বায়রণের প্রভাবের কথা বলা হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় উহাকে 'প্রভাব' না বলিয়া 'অনুপ্রেরণা' বলাই সমীচীন। এইখানে সেই অনুপ্রেরণার কারণ ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার সারস্বত-সাধনা ইংরেজী কাব্য-সম্পদ হইতে রসপ্রেরণা আহরণ করিয়া পুষ্ট হইতেছিল। মধুসূদনই প্রথম বিদেশী সাহিত্যে স্বচ্ছন্দ আনাগোনার পথ উন্মুক্ত করেন; শুধু গ্রহণ বা অনুকরণ নহে, স্বীকরণের আদর্শও তিনিই স্থাপন করেন। বাঙলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহা স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছিল, নতুবা সিসৃক্ষু বাঙালী-প্রতিভার উদার প্রাণক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের রসাবেদন ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইংরেজী সাহিত্যের কোন কোন বিশিষ্ট কবি আমাদের উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিগণকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাব্যনাটকাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তখন এদেশের উচ্চশিক্ষা-পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্তও ছিল। এতদ্‌ভিন্ন রসাস্বাদনের আগ্রহেও অনেকে তাঁহাদের রচনার অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তন্মধ্যে সেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তাই ছিল সর্বাধিক; প্রথমদিকে বাঙালা রঙ্গমঞ্চের প্রধান উপজীব্যই ছিল তাঁহার নাটক। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের গুরু রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৩০ সালে উক্ত একটি মন্তব্য হইতে সেকালে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার স্বরূপ বোঝা যাইবে—"Pope and Dryden were more to be esteemed than Hindu Sastras"[১] মধুসূদনের ইংরেজী সাহিত্য-প্রীতি এবং উহাতে তাঁহার অবাধ অধিকার এত সুবিদিত যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস।"[২] ১৮৭৫

সালে কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাব-সংকলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।"[৩] সেক্সপীয়রের পরে বায়রণের জনপ্রিয়তাই ছিল সম্ভবতঃ অধিক। কিশোর মধুসূদনের ইংরেজী কাব্য-রচনা প্রয়াসে বায়রণের প্রভাব যেমন স্বল্প নহে, তেমনি বায়রণের প্রতি তাঁহার অনুরাগও সুবিদিত।[৪] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় কবি বিহারী-লালেরও বায়রণ-প্রীতির উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য।—"তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য-দেবতা ছিলেন সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।……তাঁহার (বায়রণ) কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউটিকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।"[৬]

একসময় খ্যাতনামা বাঙ্গালী-কবিদিগের কয়েকজনকে ইংরাজ কবি-তিলকদের নামের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের কবি-প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টাও হইয়াছিল, দেখিতে পাই। যেমন—মুকুন্দরাম বাংলার চসার, ভারতচন্দ্র পোপ, মধুসূদন মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্র স্কট, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলী। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে 'পলাশির যুদ্ধের' আলোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রকে বায়রণের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। "কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি তাঁহাকে বাঙ্গালার বায়রণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।"[৭] বায়রণের সহিত নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সাধর্ম্যের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনার পূর্বে আমরা নবীনচন্দ্রের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের সম্ভাবনা ও পরিমাণটুকু নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। নবীনচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ (বি.এ. ১৮৬৭)। কিন্তু ইহাও সত্য যে, মধুসূদনের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন এবং দুর্লভ জ্ঞানসঞ্চয় তাঁহার ছিল না। বঙ্কিমের পাণ্ডিত্যপ্রসূত তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিও নবীনচন্দ্রের অনায়ত্ত ছিল। সুদীর্ঘ আত্মজীবনী 'আমার জীবনের' কোথাও নবীনচন্দ্র বায়রণ বা অন্য পাশ্চাত্ত্য কবিবিশেষের প্রতি তাঁহার আসক্তির পরিচয় দেন নাই, অথবা তাঁহার কাব্য-রচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ-আলোচনাও করেন নাই। 'প্রবাসের পত্রে' বোম্বাই-

ভ্রমণ প্রসঙ্গে একবার বায়রণের কথা তিনি বলিয়াছেন—তাহাও দেশপ্রীতি-সূত্রে, "পূর্বদিন মলয় পর্বত-শিরে দাঁড়াইয়া, এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বায়রণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে,
বোম্বাই সমুদ্র তীরে,
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপন,
ভারতের সুখসূর্য আসিবে রে ফিরে।

বায়রণের স্বপ্ন ফলিয়াছে,—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি ?"

তাঁহার জ্ঞানচর্চা বা মানসোৎকর্ষের প্রয়াস-রূপ 'আমার জীবনে' তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। এই প্রসঙ্গে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের (কবির স্বদেশবাসী) মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"আমাদের এ কবি বিস্তৃত অধ্যয়নশীল পণ্ডিত কিম্বা কোন বিষয়েই ধৈর্যশীল অধীতী ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোনরূপেই বহুপ্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।...... যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকট তিনি বহুপরিমাণে ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Childe Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, একথা তিনি আমার কাছে স্বীকার করিয়াছেন।"[৮] নবীনচন্দ্র মধুসূদনের মত দেশবিদেশের সাহিত্যবারিধি হইতে রত্ন আহরণ করিয়া তিলে তিলে তিলোত্তমা গড়িতে পারেন নাই, সুনির্দিষ্ট কোন কাব্যাদর্শও তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই তাঁহার মধ্যে বিদেশীয় কোন কবির উল্লেখযোগ্য প্রভাব নিরূপণের জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই। কেননা, নবীনচন্দ্রের স্বভাবধর্মের মধ্যেই এমন এক স্বতঃউচ্ছ্বসিত আবেগ ছিল, ভাব ও কল্পনার এমন বিদ্যুদ্দীপ্তি ও ক্ষিপ্রগতি ছিল যে তাহাকে স্বৈরিণী কবিপ্রতিভা বলাই সঙ্গত। অপরিসীম ভাবোন্মাদনাই তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা। বিহারীলালের ভাষায় এ যেন—

বিচিত্র এ মত্তদশা ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে। (সারদামঙ্গল)

এই মত্তদশাতেই নবীনচন্দ্রের কাব্যসাধনা চলিতে থাকে। তবু 'অবকাশ-রঞ্জিনীতে' এবং 'পলাশির যুদ্ধে' কবি বায়রণের কবিধর্ম ও ব্যক্তিমানসের সহিত তাঁহার কবিধর্মের যে একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণও বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বোক্ত আলোচনায় বিচক্ষণতার সহিত নির্ণয় করিয়াছিলেন—

"ইংরাজীতে বায়রণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাবসকল আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ —যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য।........নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোতঃ উচ্ছ্বলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রাবের ন্যায়।" মূলতঃ উভয়েই অসংযত হৃদয়াবেগের কবি। বায়রণের কবি-ধর্মের প্রধান ও প্রবল প্রবৃত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় সুনিপুণ মতামত নবীনচন্দ্রের মনোধর্ম উপলব্ধির পক্ষেও সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। "His only object seems to stimulate himself and his readers for the moment—to keep both alive, to drive away ennui, to substitute a feverish and irritable state of excitement for listless indolence or even calm enjoyment."[৯] "In truth, Byron was a man of......impulses and temperament at once versatile and uncertain on the surface, and doggedly obdurate at the core."[১০] "There is Byron the liberator,......it was he that struck the imagination and kindled the soul of patriot poets—everywhere"[১১] "It would be hard to find a character of more energy than that of Byron, but he was never completely master of himself."[১২] নবীনচন্দ্রও পাঠকচিত্তে 'feverish and irritable state of excitement' জাগাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তিনিও নিঃসন্দেহে 'man of impulses and temperament', মুক্তিকামনায় তিনিও ছিলেন 'liberator', কেননা তাঁহার কাব্যোন্মাদনা দ্বারা তিনি পরবর্তী patriot poetদের এবং সেকালের পাঠকদের 'imagination' ও 'soul' অনেকটা উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার energyও অফুরন্ত, আবার তাঁহার সম্পর্কেও নিশ্চিন্তে বলা চলে—'he was never completely

master of himself.' বায়রণের Hours of Idlenessএর সহিত 'অবকাশরঞ্জিনীর' নাম-সাদৃশ্যের কথা এবং নবীনচন্দ্রের প্রেমবিষয়ক খণ্ড কবিতাসমূহের আবেগোচ্ছ্বাসের সহিত বায়রণের অনুরূপ কবিতার ভাব ও সুরসঙ্গতির কথা পূর্বে যথাসম্ভব উদ্ধৃতি-সহযোগে আলোচিত হইয়াছে। সেখানেও ঐ impulse এবং passionate feeling এর প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু 'feverish and irritable state of excitement'এর যথার্থ প্রকাশ 'পলাশির যুদ্ধে'।

বায়রণের Childe Harold's Pilgrimageএর অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে' কতকটা সঞ্চারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। উহার দু'এক স্থলে বায়রণের ভাব ও ভাষার অনুকৃতিও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যে পলাশির যুদ্ধকে অনেক স্থলে বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ বলিয়া মনে করেন[১৭], তাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কেননা উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনাভঙ্গিই ভিন্ন। 'Childe Harold' জনৈক আবেগপ্রবণ মুক্তচিত্ত উদ্দাম পুরুষের ইউরোপের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহে ভ্রমণ-ব্যপদেশে বিচিত্র চিন্তাসঞ্জাত ভাবব্যাকুলতার উচ্ছ্বসিত কাব্যরূপ, উহা সুবিন্যস্ত কোনও কাহিনী নহে। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধ' একটি ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য। যত সীমাবদ্ধই হোক না কেন, 'পলাশির যুদ্ধের' একটা কাহিনী আছে, ঘটনা-সংকুলতা আছে, সুস্পষ্ট পরিণতি আছে। চাইল্ড হ্যারল্ড বর্ণনাত্মক, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যানমূলক।

বায়রণের যে উজ্জ্বল অনুকৃতিমাত্র নয়, প্রায় অনুবাদটুকু 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে যুদ্ধ-বর্ণনা উপলক্ষে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা Childe Harold's Pilgrimageএ ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্বরাত্রির বর্ণনাত্মক নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটি মাত্র—

Last noon behold them full of lusty life,
Last eve in Beauty's circle proudly gay,
The midnight brought the signal-sound of strife,
The morn the marshalling in arms,—the day
Battle's magnificently-stern array !
The thunder-clouds close o'er it, which when rent

The earth is cover'd thick with other clay,
Which her own clay shall cover, heap'd and pent,
Rider and horse,—friend, foe,—in one red burial blent,
(Canto III, Stanza 28.)

কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ,—
অহঙ্কারে স্ফীত বুক রমণীমণ্ডল
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতুহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন। (চতুর্থ সর্গ, ১০ম শ্লোক)

তবে 'পলাশির যুদ্ধের' তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে যুদ্ধের পশ্চাৎপট-রচনায় নবীনচন্দ্র 'Childe Harold'এর তৃতীয় সর্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ভাবমণ্ডলটুকু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বায়রণের কাব্যের তৃতীয় সর্গের ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৩৫ সংখ্যক শ্লোকসমূহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তেমনি প্রথম সর্গে বাঙ্গালীর দুর্বলতার জন্য তিরস্কারে এবং চতুর্থ সর্গে পরাধীনতার জ্বালাপ্রকাশে যেন Don Juan-এর তৃতীয় সর্গের অন্তর্গত The Isles of Greeceএর তপ্ত স্পর্শ লাগিয়াছে। তবু কোথাও বায়রণের কাব্যের ছায়ায় নবীনচন্দ্রের কাব্যের কায়া আচ্ছন্ন হয় নাই, কেননা নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যভূমির সর্বত্রই একটা সুন্দর স্থানিক পরিবেশ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের যৌবনবেগদৃপ্ত কবি-মানস সমধর্মিতার সূত্রে বায়রণের অগ্নিমন্ত্রে সাময়িকভাবে দীক্ষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধের' পরেই উভয়ের মানস-ব্যবধান সুদৃঢ়ভাবেই রচিত হইয়া গিয়াছে। নবীনচন্দ্র ক্রমে উদ্দাম ভাবোন্মাদনা হইতে ভারতীয় জীবনদর্শনের গভীরতর প্রশান্তির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বায়রণের মধ্যে কিন্তু অনুরূপ পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না। সমালোচকের মতে—
"His lordship was, from a very early period of youth, a

sceptic, and remained such to the end of his life."[১৩] সুতরাং লক্ষণীয় এই যে—নবীনচন্দ্রের মধ্যে গভীর স্থৈর্যের ও বিশ্বাসের পরিচয় যখন হইতে পাওয়া যাইতেছে, তখন বায়রণ-সুলভ অধৈর্য ও অবিশ্বাস আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কবিদেরও কিছু কিছু ছায়া 'পলাশির যুদ্ধের' এখানে সেখানে পড়ে নাই, তাহা নহে। তাঁহারা সকলেই এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত কবিতিলক—মিল্টন, সেক্সপীয়র, স্কট প্রভৃতি। প্রথম সর্গের ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণার সহিত মিল্টনের Paradise Lostএর দ্বিতীয় সর্গের Pandamoniumএর পরিকল্পনা-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তৃতীয় সর্গে সিরাজের অপকীর্তিজনিত বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নদর্শনের সমগ্র ধারণা এবং উপস্থাপনার আদর্শ টুকু নবীনচন্দ্র সেক্সপীয়রের Richard the Third নাটকের পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে Richardএর স্বপ্নদর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা উভয়ের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তেমনি দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত 'আশা'-বন্দনার সহিত কবি ক্যাম্বলের 'The Pleasures of Hope' নামক সহস্রাধিক চরণবিশিষ্ট কবিতার অংশবিশেষের ক্ষীণ সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। স্থানে স্থানে সঙ্গীতের অবতারণাকে কেহ কেহ স্কটের প্রভাবজাত মনে করেন।[১৪]

এইসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুকৃতির কথা তথ্য হিসাবে অবশ্যই জ্ঞাতব্য, তবে সেই হেতু কবির মৌলিকতায় আস্থাহীন হওয়া নিরর্থক; কেননা—সাহিত্যক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাব আত্মস্থ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তি এবং ক্ষমতা থাকাও এক ধরণের মৌলিকতা, তাহা কবিমনের সম্প্রসারণশীলতারই পরিচায়ক। মধুসূদনে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসোর উজ্জ্বল ছায়াপাত এবং রবীন্দ্রনাথে উপনিষদ, কালিদাস, বৈষ্ণবকবির সৌন্দর্য-আলোক বিচ্ছুরণ যেমন ব্যর্থ হয় নাই তেমনি নবীনচন্দ্রের মধ্যেও প্রধানতঃ বায়রণের অনুপ্রেরণা প্রবল শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের রসাস্বাদনে ও সৃষ্টিতে যে শুভঙ্কর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে, ইহা তাহারই নিদর্শন। নবীনচন্দ্রের আবেগপ্রবণ চিত্ত এইরূপ অল্পস্বল্প বহিঃপ্রভাবকে কুক্ষিগত করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সে প্রকাশ হয়ত বা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু বিশেষত্বহীন নহে।

সূত্র-নির্দেশ

১। প্রিয়রঞ্জন সেনের 'Western Influence in Bengali Literature' গ্রন্থে ৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২। পদ্মিনী উপাখ্যান, ভূমিকা—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড), ভূমিকা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৪৬ পৃঃ।

৫। পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ১৬৬ পৃঃ।

৬। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ, ১৩০-৩১ পৃঃ।

৭। 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১২৮২।

৮। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন, ৪০-৪১ পৃঃ।

৯। The Spirit of the Age—Hazlitt.

১০। The Poetical Works of Lord Byron—Introduction by W. M. Rossetti.

১১। A Survey of English Literature, Vol II—Oliver Elton, p. 181.

১২। A History of English Literature—Legouis & Cazamian, p. 1045.

১৩। চিত্রচরিত্র—প্রমথনাথ বিশী, ৯৬ পৃঃ।

১৪। The Poetical Works of Lord Byron—Introduction by W. M. Rossetti.

১৫। "Introduction of song-element is a probable imitation of Scott,"—Western Influence on 19th Century Bengali Poetry by H. M. Das Gupta, p. 71.

ক্লিওপেট্রা

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার সর্বগ্রাসী প্রণয়-প্রবাহে বীরাগ্রগণ্য এণ্টনী কি নিদারুণভাবে সাম্রাজ্যের সহিত নিজেকেও ভাসাইয়া দিল, এবং এণ্টনীর হৃদয়-বিজয়িনী ক্লিওপেট্রা আপন ব্যর্থ প্রণয়ের হলাহল কি নির্মমভাবে পান করিয়া মুক্তি পাইল, তাহার কাহিনী রোমক ইতিহাসের একটি তরঙ্গসংকুল অধ্যায়কে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, এবং অক্ষয় হইয়া আছে—

রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে পটে কাব্যে ইতিহাসে। (ক্লিওপেট্রা—নবীনচন্দ্র)

সুতরাং কাব্য-নাটকের উপাদান হিসাবে উহা সত্যই উপাদেয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশের পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত কবিসম্প্রদায় বিদেশীয় পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে মৌলিক কাব্য-রচনায় তেমন উদ্যোগী হন নাই, প্রধানতঃ অনুবাদ বা ছায়ানুসরণ করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছেন। সেই হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা'কে (১৮৭৭) মৌলিক কাব্যই বলা চলে।

পরাধীনতার বেদনা-উচ্ছ্বাসের সূত্র ধরিয়া কবিহৃদয়ের যে উল্লাস 'পলাশির যুদ্ধে' ভাষা পাইয়াছিল, তাহারই ভিন্নতর রূপ—অর্থাৎ প্রেমোন্মাদনা—'ক্লিওপেট্রায়' অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'অবকাশরঞ্জিনীর' আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি,—দেশাত্মবোধ এবং প্রণয়-উচ্ছ্বাস, এই উভয় বৃত্তিই নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রেরণার উৎসস্বরূপ; এবং ব্যক্তিগত জীবনে 'বিদ্যুৎ'কে কেন্দ্র করিয়া নবীনচন্দ্রের যে কিশোর-প্রেম একদা অপরূপ মাধুর্য-উপলব্ধির আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ক্ষণিক পূর্ণতা এবং চিরকালীন ব্যর্থতা আর একবার—খণ্ড কবিতার মধ্য দিয়া নয়—বিশ্রুত এক প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কবিতার মধ্য দিয়াই যেন আস্বাদিত হইল। তাহারই ফল 'ক্লিওপেট্রা'। এখানে প্রণয়ের আগ্নেয়গিরি যে উষ্ণ লাভা উদ্গীরণ করিয়াছে তাহার প্রকাশ একান্ত রোমান্টিক। সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ নাটক 'Antony and Cleopatra'র কথা নবীনচন্দ্রের অবশ্যই স্মরণ ছিল, কিন্তু উহার অনুকরণ বা অনুসরণ তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিতে গিয়া সেক্সপীয়রকে যে দ্বন্দ্বসংকুল যুদ্ধঘটনার পরিমণ্ডল সৃষ্টি

করিতে হইয়াছে, এন্টনী ও ক্লিওপেট্রার চরিত্রে যুগপৎ যে কামনা, অসূয়া, অহঙ্কার ও আত্মগ্লানি ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে, গীতিমূলক কাব্যের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করাতে নবীনচন্দ্রকে সেই জটিল পথে যাইতে হয় নাই। প্রবল-ভাবে কেন্দ্র-ভাবটিকে এবং মুখ্য ক্লিওপেট্রা-চরিত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাঁহার কবি-কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। আত্মহত্যার পূর্বে সখী চারমিয়নের নিকট আপন রুদ্ধ হৃদয়-যন্ত্রণা উন্মুক্ত করিতে গিয়া ক্লিওপেট্রা সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কাহিনীটুকু ব্যক্ত করিলেও বস্তুতঃ সমগ্র কবিতাটিকে ক্লিওপেট্রার বেদনার্ত্ত স্বগতোক্তি বলা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের যদি কোন পূর্বাদর্শ থাকিয়া থাকে তবে আমাদের মনে হয়, তাহা মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য। নবীনচন্দ্র এখানে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপকল্প যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি 'সোমের প্রতি তারা'-পত্রের আবেগবিহ্বল কবি-ভাষাকে এই কাব্যে আরও যেন করুণ মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি—নবীনচন্দ্র ক্লিওপেট্রার চরিত্রের কেবল একমুখী ভাবের উপর, যৌবনমদমত্তা প্রণয়পিপাসিতা অপ্রতিরোধণীয়া প্রকৃতিটির উপরই আলোকসম্পাত করিয়াছেন; এইখানেই 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' প্রণয়তাপিতা নায়িকাদের সহিত ক্লিওপেট্রার মর্মসাদৃশ্য। বাল্যপ্রণয়িনী বিদ্যুতের কথা বলিতে গিয়া নবীনচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি যে বইখানি ভালবাসি, সে তাহা পড়িত। আমি 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' ভালবাসিতাম সর্বদা আওড়াইতাম।"[১] সেই বয়সে এই 'বীরাঙ্গনাকাব্য'-প্রীতি কি কবিমনের এক বিশেষ প্রবণতাকেই স্ফুরিত করিয়া তোলে নাই? মধুসূদনের রোমান্টিক মনোধর্মের যে আন্তরিক প্রকাশ 'বীরাঙ্গনাকাব্যে' দেখিতে পাই, নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা' যেন তাহারই ভিন্নতর রূপ। একটি কথা নানা সূত্রে আমাকে বারবার বলিতে হইবে যে, রোমান্টিক কবিসুলভ গীতিকাব্যোচ্ছ্বাস এবং ভাবাতিশয্য নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক কবিধর্ম। মহাকাব্য-রচনায় উহা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করিলেও 'ক্লিওপেট্রার' মত প্রণয়ভাবকেন্দ্রিক কাব্যে তাহা অপূর্ব মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াও এই প্রণয়জর্জরিতা অন্তর্বেদনায় বিক্ষতচিত্তা নারীর প্রতি যে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহাই এই কাব্যকে করুণরসমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কাব্যের মুখপত্রেই কবি 'ক্লিওপেট্রা'-

চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার সমবেদনার আভাস দিয়াছেন। —"আমি তাহার রূপে মোহিত, প্রেমে ব্রথিত, তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তিতে চমৎকৃত এবং তাহার হতভাগ্যে দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে এরূপ রত্ন নাই।"

জর্জ বার্ণার্ড শ পাঠকদের উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে যাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—"Do you crave for a story of an unchaste woman ?"[২] সেই কলঙ্কিতা হতভাগিনী সম্রাজ্ঞীর পূর্বকথা একটু না জানিলে কবির সমবেদনা-রহস্যটুকু অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, বার্ণার্ড শ তাঁহার 'Caesar and Cleopatra' নাটকে (১৮৯৮) ক্লিওপেট্রার জীবনের এই পূর্ব অংশকেই উপজীব্য করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ক্লিওপেট্রা নিজেই তাহা সখী চারমিয়নের নিকট বর্ণনা করিতেছে—

দুঃখ বলিব কেমনে!
দশমবর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠে আমার
করি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ;
সেইখানে ক্লিওপেট্রা জীবন-উদ্যানে
যেই বীজ, প্রিয় সখি! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল সজনি!
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি।

* * *

ডুবায়ে টলেমি-বংশ, জনক আমার
সংবরিল নরলীলা, নব দম্পতীরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রি-করে,
দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠা মার্জ্জারে।

সেই যৌবনে অপরিতৃপ্তা মানিনী রমণীর প্রতিশোধস্পৃহার পরিণতি দাঁড়াইল অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ভর্তার সহিত সংঘর্ষ, সেই সূত্রে মিশর-বিজয়ী জুলিয়াস সিজারের সহায়তায়—

ভাসিয়াছে শিশুভর্তা শত্রুদল-সহ,
অনন্ত-জীবন-জলে। বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে, বলিব কেমনে
সেই লজ্জা? সিজারের হৃদয়-আসনে।

এবং সিজারের সুবিদিত হত্যার পর—

চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনী, সখি! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত-চোরে, যুবতী-যৌবন।

দুই বীরশ্রেষ্ঠের হৃদয়ে কামনা-বহ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দিয়া ক্লিওপেট্রা হয়ত দুর্বল পিতৃবিধানকেই নির্মম পরিহাস করিল, কিন্তু নিজে প্রসন্ন শান্তিতে ভরিয়া উঠিতে পারিল কোথায়? সম্রাজ্ঞীর অটল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল কোথায়? তাহার পরিবর্তে ক্লিওপেট্রা সবিষাদে দেখিল,—তাহার ভোগৈশ্বর্যের হর্ম্যচূড়া ভূলুণ্ঠিত, এণ্টনী তাহার রূপসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া শুধু তলাইয়াই গেল—কূল পাইল না, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিশর হইল হৃতগৌরব; তখন উপভোগ-মধুর অতীত দিনগুলির স্মৃতি-দংশনে জর্জরিতা অসহায়া রূপসীর বিষাদময়ী মূর্তি নবীনচন্দ্রের তুলিকায় কত ব্যঞ্জনাময় হইয়া ফুটিয়াছে—

বিষাদ-আঁধারে এই রূপ-কহিনুর
জ্বলিতেছে; ভাসিতেছে শুকতারা সম
বিষাদ-আকাশ-গায়ে যুগল-নয়ন।
দুই বিন্দু,—দুই বিন্দু বারি, মুক্তানিভ,
নড়ে না, ঝরে না, আহা! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন
পড়িতে ভূতলে।

বিলাসকক্ষে বিলম্বিত এক চিত্রের প্রতি আজ ক্লিওপেট্রার দৃষ্টি পড়িল,—তাহাতে ক্লিওপেট্রা স্বয়ং নদীবক্ষে প্রমোদতরণী মধ্যে উপবিষ্টা এবং জল-বিহারে প্রমত্তা-রূপে অঙ্কিতা,—

বারুণী-রূপিণী, ওই-তরণী-ঈশ্বরী;—
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!

সেই চিত্র যেন হর্ষময় অতীত ও বিষাদময় বর্তমানকে স্মৃতিপটে আরও উজ্জ্বল বর্ণক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—বেদনার ক্ষতকে করিয়া তুলিতেছে আরও উদ্দীপ্ত,—

আমি যদি ক্লিওপেট্রা, তরী-বিহারিণী
ওই চিত্র নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।

সেই মুখে হাসি-রাশি, এ মুখে বিষাদ,
সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক।

* * *

সেদিন প্রেমের শুক্ল-দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায়! নিরাশার কৃষ্ণা-চতুর্দশী!

এই প্রণয়ব্যথিত চিত্তের সংক্ষোভ-বর্ণনায় গীতিরসপ্রবণ নবীনচন্দ্রের লেখনী বড়ই স্বচ্ছন্দ;—ছবির পর ছবি, কথার পর কথা আসিয়া ভীড় করিতেছে, কবির কাজ তাহাদিগকে শুধু সাজাইয়া তোলা। দুঃখের বিষাদস্মৃতি যেমন ক্লিওপেট্রার মনকে আলোড়িত করিতেছে, তেমনি বিলাস-বিহ্বলতার স্মৃতিও ক্ষণিকের জন্য মনকে আলোকিত করিতেছে, বিচিত্র উপমায় তাহা প্রকাশ করিয়াও যেন কবির তৃপ্তি নাই।

ক্লিওপেট্রার বিষাদান্ত জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে এণ্টনী জীবন দিয়া উদগ্র প্রণয়-কামনা সম্পূর্ণ করিল, আর সেই আত্মোৎসর্গের শোকান্ধকারে উন্মাদিনী ক্লিওপেট্রা বুঝিল—এই প্রণয়ের পরিণাম সুখাবহ না হইলেও বিজয়িনী সে,—কেননা এণ্টনীর দুই পত্নী সিল্‌ভিয়া ও অগস্তাকে (ইতিহাসে নাম দুইটি যথাক্রমে Fulvia ও Octavia) স্বামীর প্রণয়স্বর্গচ্যুতা করিয়া সে তাহার বিশ্ববিমোহিনী রূপ ও প্রেমোদ্বেল হৃদয়-সম্পদে এণ্টনীকে জয় করিয়াছে। জগতের চক্ষে কলঙ্কিনী, লালসাময়ী এই রমণীর স্বাভাবিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে সহৃদয় নবীনচন্দ্র তিরস্কার করেন নাই, বরং তাহার করুণ ব্যর্থতার জন্য সমবেদনার অশ্রুই মোচন করিয়াছেন। যদিও ইতিহাস এণ্টনীর প্রতি ক্লিওপেট্রার প্রণয়ের অকৃত্রিমতায় আজিও সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে এবং তাহার প্রেমে গভীরতর উদ্দেশ্য আরোপ করে,* তথাপি সাহিত্য চিরক্ষমাশীল, তাই নবীনচন্দ্রের কাব্যের ক্লিওপেট্রা আপন প্রেমের অকৃত্রিমতার শক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাসিনী—

প্রণয়-বিহনে
পরিণয়! পরিমল-হীন পুষ্প! মণি-
হীন ফণী,—আজীবন অনন্ত দংশক।
মধু-হীন মধু-চক্র,—মক্ষিকা পূরিত;
হেন পরিণয়-বলে, ওই দেখ সখি!

এন্টনীর পাশে বসি, অগস্তা সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে
বিসর্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে;

* * *

পরিণয়-বলে
জীবলোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমরলোকে, পরিণয়-বলে
তারে রাখিবি কেমনে?

সহানুভূতিপ্রবণ সেক্সপীয়রও বুঝি তাই ক্লিওপেট্রার অন্তিম মুহূর্তকে রাজকীয় মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিয়াছেন। তাঁহার নাটকে বিজয়ী Octavian Caesarএর সপ্রশংস উক্তি লক্ষণীয়—

Bravest at the last,
She levelled at our purposes, and being royal,
Took her own way.

* * *

No grave upon the earth shall clip in it
A pair so famous.*

নবীনচন্দ্রের কাব্যেও ক্লিওপেট্রা শেষ পর্যন্ত 'অপূর্ব রমণী-কীর্তি—রূপে গুণে দোষে।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে—কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় একদা এক দুশ্চরিত্র সহপাঠীর প্ররোচনায় পতিতালয়ে গমন করিয়া ঘটনাচক্রে নবীনচন্দ্র এক হতভাগিনী পতিতাকে মুমূর্ষু ও পরিজন পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিয়া ঘৃণাহীন করুণাকাতর অন্তরে তাহার সেবাকরতঃ যে আত্মতৃপ্তি ও মানবপ্রীতিতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, "আমার জীবন"—প্রথম খণ্ডে 'পতিতা' অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'ক্লিওপেট্রার' মুখপত্রেও নবীনচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল—"অভাগিনী ক্লিওপেট্রা সংসারের ঘোরতর ঝটিকায়, তাহার বিশালতম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল বলিয়া কেনই বা পাপিনী হইল?......ক্লিওপেট্রার প্রেম পুরোহিতের মন্ত্রে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল না বলিয়া যদি তাহাকে ঘৃণা করিতে হয়, করিও; কিন্তু ক্লিওপেট্রা অবস্থার দাসী বলিয়া দয়া করিও, অভাগিনী

বলিয়া দুঃখ করিও।" সুতরাং পাপকে ঘৃণা করিয়া পাপীকে ঘৃণা না করিবার প্রবৃত্তি যেমন নবীনচন্দ্রের সহজাত, তেমনি সেই যুগের মানবতাবোধের প্রেরণাপুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রও পাপীয়সী রোহিণীর স্বাভাবিক প্রণয়-যন্ত্রণার জন্ত পাঠকের সহানুভূতির দ্বারে আবেদন করিয়াছিলেন। "রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই। পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না। তা তোমরা রোহিণীর জন্ত একবার আহা বল।"[৬] যে উদার প্রশস্তহৃদয় কবি নবীনচন্দ্র পাপীকেও ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিয়া বলিতে পারেন—"তুমি আমি কে যে পাপীকে ঘৃণা করিব! মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। পাপী নহি কে?"[৭] তাঁহারই সহানুভূতিতে গঠিতা এই প্রণয়-প্রতিমা ক্লিওপেট্রা, পরে 'জরৎকারু'-চরিত্রও (কাব্যত্রয়ীতে) এই একই ধাতুতে গড়িয়া উঠিয়াছে। দেবীরূপিণী 'সুভদ্রা' যেন নবীনচন্দ্রের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করিয়াছে—

> পাপীরে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে
> সেই জন প্রেম-অবতার। (কুরুক্ষেত্র—৩য় সর্গ)

'ক্লিওপেট্রা' রচনার সময়ে 'বান্ধব'-পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহাতে ক্লিওপেট্রা-চরিত্রকে নির্মমভাবে তিরস্কার করেন। তাঁহার পবিত্রতা-বাতিকগ্রস্ত (Puritanic) মন সেই চরিত্রকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 'বঙ্গদর্শনে' নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা'র কিয়দংশ পাঠ করিয়া তিনি নবীনচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন—"আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, কবিতে এবং একজন সামান্ত প্রবন্ধলেখকে কি গুরুতর প্রভেদ। আমি অকিঞ্চিৎকর ধর্মাভিমানে অন্ধ হইয়া 'ক্লিওপেট্রাকে' কি ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করিয়াছি। আমি পাপীকে কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি, আর আপনি উহাকে কি পুণ্যের চক্ষে দয়ার চক্ষে করুণার চক্ষে দেখিয়াছেন। আপনার কবিতাটি পড়িয়া আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি। আমার প্রবন্ধ আর প্রকাশিত হইবে না।"[৮]

সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত 'ক্লিওপেট্রাকে' গীতিরসসমৃদ্ধ রোমান্টিক প্রেমকাব্যরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান আমাদের সাহিত্যে দেওয়া প্রয়োজন।

বিদেশীয় ইতি-কাহিনীর মৌলিক কাব্যরূপায়ন হিসাবে, এবং নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত জোয়ারের মুখে উৎক্ষিপ্ত একটি তরঙ্গরূপেও এই ক্ষুদ্র কাব্যটি স্মরণীয়।

সূত্র-নির্দেশ

১। আমার জীবন, ১ম ভাগ, ১১৯ পৃঃ।

২। Caesar and Cleopatra (Prologue)—J. B. Shaw.

৩। "She herself was not in love",—The story of civilization, Vol. III, by Will Durant, P. 204. "Whether she ever loved him may well be questioned. What is certain is that she intended to make use of his blind devotion to preserve for her at least her own independence and to secure the throne for her children."—Pheraoh to Farouk, by H. Wood Jarvis, P. 41.

৪। Antony and Cleopatra, Act V, Sc. II—Shakespeare.

৫। কৃষ্ণকান্তের উইল, ৭ম পরিচ্ছেদ—বঙ্কিমচন্দ্র।

৬। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২৫৮ পৃঃ।

৭। 'ক্লিওপেট্রা'—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বান্ধব, আষাঢ়, ১২৮২।

৮। আমার জীবন, ২য় ভাগ, ২৫৭ পৃঃ।

রঙ্গমতী

'রঙ্গমতী' ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহার রচনা সূচিত হয় ১৮৭৫ সালে, 'পলাশির যুদ্ধ'-প্রকাশের অব্যবহিত পরে। কবির চাকুরী ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নানা বিশৃঙ্খলাজনিত বাধায় রচনা বহুকাল স্থগিত থাকে, এরূপে প্রায় পাঁচ বৎসরে 'রঙ্গমতী' লিখিত হয়।' প্রথম সর্গ রচনার বৎসর খানেক পরেই কবি স্বচক্ষে রঙ্গমতী দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। রঙ্গমতী বা রাঙ্গামাটি পার্বত্য-চট্টগ্রামের প্রধান স্থান। উহার আরও ঊর্ধ্বে কর্ণফুলী নদীর উৎস। কর্ণফুলী চঞ্চল নৃত্যছন্দে রাঙ্গামাটির গিরিঅঞ্চল মুখরিত করিয়া চট্টগ্রামের সমতল বক্ষ বিধৌত করিয়া অবশেষে সাগরে মিশিয়াছে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রমণীয় পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল; সেই সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধের' দেশভাবনা এবং 'ক্লিওপেট্রা'র প্রণয়-বেদনা তাঁহাকে এবারে এমন এক মৌলিক আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার কল্পনা এবং বর্ণনাশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত লীলায় বিলসিত হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের মত 'রঙ্গমতী'তেও নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক মনোবৃত্তি ধরা পড়িয়াছে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের স্বাভাবিক নিসর্গ-সৌন্দর্যবিতানে পুষ্পিত এক ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে নবীনচন্দ্রেরই অপরিণত প্রণয়োচ্ছ্বাস যেন শুনিতে পাই। সুতরাং ব্যক্তিসম্পর্কের নিবিড়তায় এই কাব্যে যে আবেগ-মাধুর্য ক্ষরিত হইয়াছে তাহা অনবদ্য।

'রঙ্গমতী'র কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—উহার গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন প্রভাব যেন ক্রিয়াশীল। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী; ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অদৃষ্ট-বিপর্যয়ের বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনী-উপস্থাপনার এক সুনির্দিষ্ট আদর্শও তাঁহারই হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী'র পূর্বে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, এবং রোমান্সধর্মী সেই কাহিনীসমূহ দেশের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে। নবীনচন্দ্রের

'রঙ্গমতী'কে Metrical Romance বলা চলে। অন্যত্র বলিয়াছি, পূর্বরচিত কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ'ও Metrical Romance বা কল্পনাপ্রবণ আখ্যায়িকা কাব্য,—তবে "পলাশির যুদ্ধে উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প, গীতি অতি প্রবল।"[২] এই হিসাবে 'রঙ্গমতী' সত্যই রোমান্স, Romance in verse,—কী দেশপ্রীতির উচ্ছ্বাসে, কী প্রণয়াবেগের উৎসারে। ইহাতে সুসঙ্গত একটি উপাখ্যান রহিয়াছে, যাহার নাট্য-উপাদানও কম নয়। তাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"পলাশীর যুদ্ধে নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন তাঁহার কবিতা গৈরিক নিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্‌গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্মভেদী রোদন 'রঙ্গমতী'র অস্থিপঞ্জর। প্রভেদ এই, 'পলাশির যুদ্ধ' কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি, তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। রঙ্গমতী কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি কাব্যসোপানে আর এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"[৩]

স্কটের আখ্যায়িকা-কাব্যের স্বদেশপ্রীতি, বীরপুরুষদের (knights) বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ (chivalry), নিসর্গ-পরিবেশ প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের মনে কিছুটা রেখাপাত করিয়াছিল, যদিও তাঁহার মধ্যে স্কটের সুস্পষ্ট প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং অবাঞ্ছিত বিবাহের বিপদ হইতে রক্ষার জন্য তপস্বিনী-দত্ত বৃক্ষপত্র আঘ্রাণদ্বারা নায়িকা কুসুমিকাকে মৃতবৎ করিয়া রাখার সহিত সেক্সপীয়রের Romeo Juliet নাটকে Friar Laurence কর্তৃক Julietকে অনুরূপভাবে মুমূর্ষু করিয়া রাখার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। স্কট নহে, বরং কাহিনীর নাটকীয় সূচনা, জটিলতাসৃষ্টি ও জটিলতামোচনের কৌশল নবীনচন্দ্র যেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইতিহাসের ছায়ায় গঠিত পূর্বোক্ত উপন্যাস কয়টিতে বঙ্কিম স্বদেশপ্রীতির চাইতেও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই দেশ-ভাবনার দিক হইতে নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী' অগ্রবর্তী, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতিমূলক উপন্যাসত্রয়ীর (আনন্দমঠ-১৮৮২, দেবী চৌধুরাণী-১৮৮৪, সীতারাম-১৮৮৭) বোধন-সঙ্গীত। এ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের উক্তি উদ্ধারযোগ্য,—"কি বিষয়ে নূতন 'নভেল' লিখিতেছেন (বঙ্কিমচন্দ্র) আমি জিজ্ঞাসা করি, এবং বরাবর যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম, এবারও লিখি যে ইংরেজী পীরিতের ছায়া ছাড়িয়া তিনি যেন দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভগ্নীপ্রেম……লইয়া নূতন উপন্যাসটি রচনা করেন। তিনি তদুত্তরে

লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। নূতন উপন্যাসটি রঙ্গমতীর পথে যাইতেছে। 'It follows exactly the lines of your Rangamati.'—এবং রঙ্গমতীর দরুণ তাহার কয়েক অধ্যায় তাঁহাকে পরিবর্তন করিতে হইতেছে। উহাই আনন্দমঠ।''[১] রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮) 'কর্মদেবী' (১৮৬২) 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) মৌলিক কাহিনী নহে, টডের 'রাজস্থানে'র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; 'কাঞ্চীকাবেরী'র মূলও উৎকলদেশীয় ইতি-কাহিনী। সুতরাং দেশপ্রীতিমূলক কাব্য হইলেও 'রঙ্গমতী' যে ধরণের কাব্য—উহারা তাহা নহে। রঙ্গমতীর বহুপূর্বে হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতিমূলক আখ্যায়িকাকাব্য 'বীরবাহু' (১৮৬৪) রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু "উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।"[২] 'রঙ্গমতীর' কাহিনী অংশও কাল্পনিক, তবে তাহাতে ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে সুকৌশলে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিবাজী-সায়েস্তা খাঁর সংঘর্ষ কাহিনী,[৩] এবং চট্টগ্রামের সমুদ্র-উপকূলে পর্তুগীজ দস্যুর উপদ্রব ও সায়েস্তা খাঁ কর্তৃক তাহাদের উৎখাত-ঘটনা[৪]—ইতিহাসে সুবিদিত। এই সংঘর্ষের সহিত উপাখ্যানের নায়ক বীরেন্দ্রের সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে তাহার বাল্যজীবনের পারিবারিক বিপর্যয়, মাতৃসন্ধান ও পর্তুগীজ-হস্ত-কবলিত স্বদেশ-উদ্ধারের সংকল্প লইয়া মোগল সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সংঘর্ষসূত্রে শিবাজীর সহিত পরিচয় ও নবপ্রেরণালাভ, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন—প্রভৃতি ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই কল্পিত হইয়াছে, এবং এতদ্‌সূত্রে নায়কের বাল্যপ্রণয়ের পরিণতিকেও সামাজিক কূটচক্রান্তের পরিবেশে স্ফুটতর করা হইয়াছে।

এই ধরণের কাল্পনিক আখ্যানকাব্যে ভাবাবেগলীলাবিলাসের এবং কল্পনাচাতুর্যবিকাশের সুযোগ থাকে বলিয়াই ভাবকুশল কবির পক্ষে ইহা বড় সুন্দর অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-রচনাবলীও (বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড) প্রণয়-ব্যর্থতার কাল্পনিক আখ্যায়িকায় সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, 'রঙ্গমতী'তে কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের সংস্পর্শ অত্যন্ত গভীর। গ্রন্থোৎসর্গে (বঙ্কিমচন্দ্রকে) নবীনচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে আমার বিপদের

স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে।” এই কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্র যেন নবীনচন্দ্রেরই প্রতিরূপ। জন্মভূমির অপূর্ব-সৌন্দর্য একদিকে যেমন তাঁহার নায়ককে কল্পনাময় রাখিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আর্যস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার-ব্রতেও তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছে। সেই পুনরভ্যুত্থানের যুগে প্রাচীন ঐতিহ্য-গৌরবের দিকে আশামুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বর্তমানের দুঃসহ গ্লানি অপনোদনের আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ প্রায় সকল কবির মনেই জাগিয়াছিল। কল্পকাহিনীর দেশপ্রেমকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে নবীনচন্দ্র সঙ্গতভাবেই শিবাজী-ইতিহাসের সামান্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। তবে মানুষের জীবনের কপটতা, নিষ্ঠুরতা এবং লালসার যে চিত্র তাহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা নবীনচন্দ্র বস্তুতঃ পারিপার্শ্বিক সমাজ হইতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, নবীনচন্দ্রের সমাজবোধ ও লোকচরিত্রজ্ঞান গভীর ছিল। ডাঃ সুকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন, “মোহন্তের অত্যাচার-কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতা কিছু থাকিতে পারে।”[৮] অনুমান নিষ্প্রয়োজন, কেননা সত্যই উহা বাস্তব। মাদ্রাজের ত্রিপতির মোহন্ত, তারকেশ্বরের মোহন্ত, সীতাকুণ্ড এবং বাড়বকুণ্ডের মোহন্তের ব্যভিচার ও উৎপীড়ন কাহিনী সমাজকে পূর্ব হইতেই আলোড়িত করিতেছিল। নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মচারীরূপে সীতাকুণ্ডের মোহন্তের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। সীতাকুণ্ডের তৎকালীন সেবাইত হরকিশোর অধিকারী লিখিয়াছেন,—“১৮৭১-৭২ ইংরাজীতে ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় সীতাকুণ্ড মেলার (৺চন্দ্রনাথ তীর্থের) ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন মোহন্ত কিশোরী বনের পূর্ণ যৌবন। যৌবনের ভোগস্পৃহা, বিষয় লালসার দুর্দমনীয় প্রভাব, কুশিক্ষার তাড়না, কুসঙ্গীর আদর্শ, উচ্ছিষ্টভোজী চাটুকার দলের কৌশলে কিশোরী বন ধীরে ধীরে ডুবিতেছিলেন। নবীনবাবু কিশোরী বনের শৈশব-বন্ধু ছিলেন। বহুবার সতর্ক করিয়া, উপদেশ দিয়া যখন কোন ফল হইল না, ...তীর্থযাত্রীগণের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হইল, তখনি নবীনবাবু কিশোরী বনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ববঙ্গের একমাত্র প্রাচীন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রটিকে রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আদর্শ-তীর্থে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।”[৯] নবীনচন্দ্র নিজেও সীতাকুণ্ড মোহন্তের অনুরূপ

বর্ণনা এবং তীর্থ-সংস্কারের কথা আত্মজীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন।[১০] 'ভানুমতী'তেও প্রসঙ্গক্রমে মোহন্তদের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন—"ইহারা ত মোহন্ত নহে মোহান্ধ।"[১১] সুতরাং মোহন্ত-চরিত্র নবীনচন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ। আবার দুরাত্মা মোহন্তের সর্ব পাপকর্মের সহায়ক ধূর্ততাগুণসম্পন্ন জনৈক সরকারী কর্মচারীর কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এই মোহন্তের ও 'বুঝম্ ক্রেগুের' মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া আমি 'রঙ্গমতী'র গদাধর বন ও ঢেঁকি পঞ্চাননের মূর্তি আঁকিয়াছিলাম।"[১২]

'রঙ্গমতী'র ভাব, ভাষা ও বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের আবেগপ্রবণতা ও মুক্ত-কল্পনার পরিচয় রহিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক, কেননা 'অবকাশরঞ্জিনী'র খণ্ড কবিতার সুরে, 'পলাশির যুদ্ধে'র দেশাত্মবোধে এবং 'ক্লিওপেট্রা'র ব্যর্থ প্রণয়-ব্যাকুলতায় কবির যে রোমান্টিক মনোবৃত্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা 'রঙ্গমতী'তে সম্মিলিতভাবে পরিস্ফুট। এখানে গীতিরস আছে, দেশভাবনা আছে, প্রণয়বেদনা আছে, আর আছে নাটকীয় ঘটনা-সংকুলতা। কাব্যমধ্যে স্থানে স্থানে যে চিত্র ও সঙ্গীতরস যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মাধুর্য উপভোগ্য। সন্ধ্যার বর্ণনা—

> মেঘমুক্ত দিনমণি, দেখিলা যুবক—
> নদীর পশ্চিমতীরে, বনরাজিশিরে
> জ্বলিছে,—নির্বাণোন্মুখ অনল যেমন। (১ম সর্গ)

তেমনি পর্বত-বর্ণনা—

> সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত পর্বত-লহরী,—
> গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে!
> প্রকৃতি কৌতুকশীলা, আহা মরি! যেন
> উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ
> তরঙ্গ লহরী-লীলা ভূধর-শিখরে,—
> অচঞ্চল, অতরল, অমর, অটল। (৩য় সর্গ)

বর্ণনাকুশল নবীনচন্দ্র এই সব ক্ষেত্রে অনায়াস অক্লান্ত। নায়ক বীরেন্দ্রের আপন প্রণয়-সঞ্চারের গীতিময় বিবৃতির বৈশিষ্ট্য শুধু তরু ও লতার উপমায় নহে, পর্যায়ক্রমে এক একটি খণ্ডচিত্রকে তাহা যেন লতার মত জড়াইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে এক বেদনার মোহাবেশও সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে,—

ভগবতি, রঙ্গমতী নিবিড় কাননে
অঙ্কুরিত ছিল এক তরু সুকোমল।
কোথা হতে মরি! এক কনক-বল্লরী
আসিয়া মিলিল সেই তরু সুকুমারে
আচম্বিতে। দেবি! দিন দিন তরুলতা
বাড়িতে লাগিল, দিন দিন লতাতরু
অনন্ত বেষ্টনে হায়! বেষ্টিত হইল।
যতই নিদাঘ-শিখা হইত প্রখর,
উজ্জ্বল; যতই শীত হইত শীতল;
আলিঙ্গিত পরস্পরে তত গাঢ়তর।
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে, মলয় অনিলে,
আলাপিত পরস্পরে; দেখিত যুগলে
অতৃপ্ত যুগল শোভা, ভাসিত আবার
অনিবার বরিষার আনন্দসলিলে।

* * *

বীরেন্দ্র সে তরু সেই লতা কুসুমিকা। (২য় সর্গ)

শোকাবহ শেষ অধ্যায়ে বীরেন্দ্র বিস্ময়ে বেদনায় দেখিল—

পড়ে আছে কক্ষতলে—সুষমার ছবি—
অচেতন কুসুমিকা কৌমুদী প্রতিমা।
একটি বীণার তান নিশীথ বিপিনে
মূর্তিমতী যেন। একখণ্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোন আঁধার কুটীরে। (৬ষ্ঠ সর্গ)

এমন ব্যঞ্জনাময় সার্থক শব্দচিত্র নবীনচন্দ্রেরও বুঝি বেশী নাই। এই গীতিরসই নবীনচন্দ্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত। নায়ক বীরেন্দ্র ও নায়িকা কুসুমিকার জীবনাবসান কবি সুভাষিত (euphemistic) করিয়া না বলিয়া পারেন নাই, সেই সঙ্গে বেদনার অশ্রুও যেন কবির দৃষ্টিকে ভারাতুর করিয়া তুলিয়াছে—

ধীরে সন্ধ্যাগমে
নীরবে মুদিল দল যুগলকমল,
নিদ্রা গেল কুসুমিকা! হায়! একবৃন্তে

ফুটেছিল দুটি ফুল সংসার কাননে
একসঙ্গে দুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া।

মৃত্যুর বেদনা এখানে পুষ্পানুষঙ্গের রূপকে প্রচ্ছন্ন থাকায় সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভাব-পরিকল্পনায় না হইলেও রূপকল্পের ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র মধুসূদনের অনুসারী। 'ক্লিওপেট্রা'র মত 'রঙ্গমতী'ও অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে রচিত। মধুসূদনের মত ধ্বনিপ্রবাহ ও গাম্ভীর্যসৃষ্টির উপযোগী না হইলেও নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হেমচন্দ্রের ন্যায় ধ্বনিহীন আড়ষ্ট পয়ারগোত্রীয় নহে, তাহার নিজস্ব একটা গতি, সুর ও মাধুর্য আছে। যাহা হোক, সেই আলোচনা ভিন্ন অধ্যায়ে করা হইবে।

নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—'রঙ্গমতী'র দীর্ঘ পর্বত-বর্ণনা কাহারও ক্লান্তিকর মনে হইয়াছে, কেহ বা মুগ্ধ হইয়াছেন।[১৩] ইহা সত্য যে, কাব্যের প্রায় সর্বত্রই শুধু পর্বত নয়, নানাবিধ বর্ণনাবাহুল্যে কাহিনীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়াছে। আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে পর্বত ও সমুদ্রের মহিমা-গাম্ভীর্য এবং অনন্ত বিস্তৃতি অন্তর দিয়া বর্ণনা করিবার অধিকার কেবল নবীনচন্দ্রেরই ছিল, কেননা তিনি 'সিন্ধুমেখলা ভূধরস্তনী' চট্টগ্রামেরই সন্তান। সমতলের লোক সেই অপরিচিত উত্তুঙ্গ মহিমায় বিস্মিত হইবে বটে, কিন্তু রস পাইবে না। কবি নিজেও বলিয়াছেন—"আমি বঙ্গদেশের উচ্চভূমিবাসী (Highlander) হইলেও পার্বত্যপ্রকৃতির অচিন্তনীয় শোভা অল্প বাঙ্গালীই দর্শন করিয়াছেন। উহাই রঙ্গমতীর দুরদৃষ্ট। ...রঙ্গমতী তেমন সমাদর লাভ করে নাই।[১৪] পর্বত-বর্ণনার আধিক্যই রঙ্গমতীর অনাদরের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অধিকাংশ পাঠকের রোমান্স-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছিল বলিয়াই বুঝি Romance in Verse 'রঙ্গমতী' বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

এই 'রঙ্গমতী'তেই কবির পরবর্তী কাব্যত্রয়ের (রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস) সুমহান পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হইয়াছে, মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলাও সূচিত হইয়াছে এখানে,—

অন্তর-বিগ্রহে, বৎস! ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নিশিখা

জলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেব-চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একচ্ছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব-অভিনেতৃ সম্বরিল লীলা
সিন্ধু প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ী-করে।

* * *

ভারত সন্তান
এই দীর্ঘ শিক্ষাপরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্বশক্তি-মূল
একতা।

এই যে সর্বভারতীয় ঐক্যে কবির সহৃদয় নিষ্ঠা, ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলপন্থার উপর অখণ্ড-বিশ্বাস,—অতঃপর এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া 'এক ধর্ম-রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'-কে[১৫] বন্ধন করার আদর্শ-নির্ণয়ই কবির অন্যতম সাধনা হইবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। আমার জীবন, ৩য় ভাগ, ২২৮ পৃঃ।

২। পলাশির যুদ্ধ সমালোচনা—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৮২।

৩। রঙ্গমতী সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮৮।

৪। আমার জীবন, ৩য় ভাগ, ২৩০-৩১ পৃঃ।

৫। 'বীরবাহু'র বিজ্ঞাপন—হেমচন্দ্র।

৬। Shivaji—Sir Jadunath Sarcar, P. 88-89.

৭। History of Bengal, vol. II—Ed. by J. Sarcar, P. 377-79.

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন, ৩৩০ পৃঃ।

৯। 'চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য'—হরকিশোর অধিকারী, ১৬২ পৃঃ, ১৬০৭ সাল।

১০। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ১০১—১৩ পৃঃ।

১১। 'ভানুমতী'—৯ম অধ্যায়।

১২। আমার জীবন, ৫ম ভাগ, ২১৭ পৃঃ।

১৩। ঐ , ৩য় ভাগ, ২৩৪ পৃঃ।

১৪। ঐ , ৩য় ভাগ, ২৩৩-৩৪ পৃঃ

১৫। 'শিবাজী', রবীন্দ্রনাথ, সাপ্তাহিক কেশরী, ১৫ জুন, ১৮৯৭।

মহাকাব্যধারায় নবীনচন্দ্র

নবীনচন্দ্র মধুসূদন-প্রবর্তিত মহাকাব্যধারার অন্যতম কবি। মহাকাব্যের প্রকৃত স্বরূপবিচারে বাঙ্গালার কোন কাব্য আদৌ মহাকাব্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা—তাহা লইয়া সংশয়-বিতর্কের আজিও অবসান হয় নাই। প্রারম্ভেই সেই বিতর্কে প্রবেশ না করিয়া বলা চলে—মধুসূদনই বাঙ্গালা-সাহিত্যে মহাকাব্যের প্রবর্তক, এই ধারণা সুচিরপ্রচলিত এবং সার্থক। মধুসূদন নিজে তাঁহার কাব্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে epic, কখনো epicling এবং 'বীররসে ভাসি মহাগীত' অর্থাৎ Heroic poetry বলিয়াছেন। আর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সমালোচক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বহু সমালোচক সাধারণ লক্ষণবিচারে উহাকে 'মহাকাব্য' বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার মেঘনাদবধ কাব্য খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য নয়—এরূপ মতও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যাহা হোক, কাব্যের আঙ্গিক-বিষয়ে সতর্ক যে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—"I think, I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me,"[১] তাঁহার সম্পর্কেই যেখানে সংশয় বিদ্যমান, সেখানে সেই তুলনায় স্বল্পপ্রতিভাবান অনুবর্তীদের কথা বলাই বাহুল্য। আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—কাহারও মহাকাব্য-রচনার দাবী ছিল না। তাঁহারা ব্যাপক পরিধিতে বিশাল জীবনের উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন, যদিও মহাকাব্যের তাহাই লক্ষ্য। তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিথিলবদ্ধভাবে হইলেও মহাকাব্যের মহাআধারই যেন গড়িয়া গিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে মহাকাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষণ কিছুটা থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ লক্ষণ ও নিগূঢ় প্রবৃত্তি-সমন্বিত কোন রচনার সন্ধান যে মেলে না, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে—মহাকাব্যোপযোগী জীবনের বিশালতা ও পৌরুষ-বিশ্বাস তখনও বাঙ্গালী আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ, 'মনসামঙ্গলে' চাঁদ

সদাগরের মত পৌরুষ-দৃপ্ত চরিত্র—যাহার সম্পর্কে এ যুগের কবি গভীর শ্রদ্ধায় বলিতে পারিয়াছেন—

তুমি দেবতারো বড় আমার এ অর্ঘ্য ধরো,
শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
—('চাঁদ সদাগর'—কালিদাস রায়)

তাহাকেও মঙ্গলকাব্যকার শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল রাখিতে পারেন নাই, দৈবী-ইচ্ছার হাতে তাহাকে অসহায়ভাবে সমর্পণ করিতে হইয়াছে। তেমনি 'চণ্ডীমঙ্গলে' কালকেতুর মত বিজয়ী বীরকেও কিনা কার্যকালে পত্নীর পরামর্শে ধান্যঘরে গিয়া লুকাইতে হয়, কেননা দেবীর প্রসন্নতা ও বিরূপতার উপরই তাহার চরিত্র নির্ভরশীল। কিন্তু "It is of man, and man's purpose in the world, that the epic poet has to sing, and not of the purpose of gods."[২] তাই একথা বলা চলে, মর্ত্যচারী জীবন-নির্ভর মানুষ মধ্যযুগের কাব্যে 'স্ব-মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র দেহধর্মী মানুষকে জাগাইয়া তুলিলেন, কিন্তু প্রাণধর্মী মানুষের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, অন্তরে-বাহিরে আদর্শ-সংঘাতের ফলে জাতির সামগ্রিক জাগরণের উষাকাল পর্যন্ত। তাই প্রাণসম্পদে গরীয়ান মানুষের গৌরবে আস্থাবান কবি মধুসূদনকেই মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে—বিগত শতাব্দীর জীবন-সাধনারই শিল্পরূপ এই মহাকাব্য। কাজেই কেহ কেহ যখন বলেন—গদ্য উপন্যাসের যুগে এপিক-কাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া মাইকেল ভুল করিয়াছিলেন, তখন তাহা অনুবর্তীদের ক্ষেত্রে কতকটা প্রযোজ্য হইলেও মধুসূদনের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। বাঙ্গালা দেশে সেই যুগের উচ্ছ্বসিত আবেগোৎকণ্ঠা এবং আনন্দবেদনার স্পন্দন যেমন স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়িল যুগোপযোগী সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর ছন্দে—গদ্যে নয়, তেমনি তাহার প্রকাশের রূপবন্ধও স্বাভাবিকভাবেই স্থির হইল দৃঢ় সংবদ্ধ ক্লাসিক আদর্শের অনুকূল মহাকাব্য—গীতিকাব্য নয়। যুগবঙ্গার প্রবাহকে, প্রাণপ্রেরণার Abstract রূপ বা ভাব-রূপকে ধারণ করিবার জন্য এই মহাকাব্যের মহাআধারেরই প্রয়োজন ছিল। যখন জীবনকে কর্মে ও চিন্তায় বিচিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া concrete রূপে বা বাস্তবরূপে বিধৃত করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই যুগ-প্রয়োজনের তরঙ্গশীর্ষে আরোহণ

করিয়া আসিল বঙ্কিমের উপন্যাস; যদিও একটি হইতে আর একটিতে সংক্রমণের কালব্যাপ্তি অত্যন্ত পরিমিত। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস পাশ্চাত্ত্যের ব্যর্থ অনুকরণ নয়, আদর্শ নির্বাচনের ত্রুটি নয়, সাহিত্যে নিষ্ফল সৃষ্টিও নয়,—স্বল্পকাল মধ্যে গভীরতর জীবনের উত্তাপ সঞ্চার করিয়া তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে; ক্লাসিক রচনাদর্শের কিঞ্চিৎ অনুশীলনও বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে কিয়ৎপরিমাণে ঋজুতা ও দৃঢ়তা অন্ততঃ আনিয়া দিয়াছে। হইলই বা তাহার প্রকাশ ত্রুটিপূর্ণ, তবু স্তিমিত কল্পনার ক্ষীণ ধ্বনির মধ্যে তাহারা মহাসমুদ্রের তরঙ্গনির্ঘোষ শুনাইয়াছে।

একথা স্বীকার্য যে, মহাকাব্যের সুসংহত শিল্পরূপ মধুসূদন তাঁহার অত্যুন্নত ও সংযত প্রতিভায় অনেকটা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন; হেমচন্দ্র অতি সতর্কতা ও শৃঙ্খলানুগ প্রবৃত্তির বশে রীতিসম্মত মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনরস সঞ্চার করিতে পারিলেন না; আবার স্বেচ্ছাচারী কবি-প্রতিভায় মহাভারতের নূতন তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের এক শিথিলবন্ধ ভিন্নতর রূপ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, যেখানে ভাবাবেগ ও প্রাণোচ্ছলতা মহাকাব্যকে প্রায় গীতিকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এক হিসাবে হয়ত বা উহাই মহাকাব্যের স্বাভাবিক পরিণতি। কেননা বাঙ্গালীর কমনীয় মনোধর্মে ক্লাসিক মহা-কাব্যের ঋজুতা এবং সুগম্ভীর রস তেমন গভীর আশ্রয় পায় নাই, সেইজন্য অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যেই আমরা মহাকাব্য-রচনার সূচনা ও অবসান দেখিলাম। গীতিকাব্যরসপ্রবণতা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ, তাই মহাকাব্যের একরূপ শেষ কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে রোমান্টিকতা ও গীতিউচ্ছ্বাস এক অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শুধু নবীনচন্দ্র কেন,—গীতিপ্রবণতা মধুসূদনেরও যে স্বভাবধর্ম, সে সম্পর্কে মধু নিজেই অবহিত ছিলেন।[৩] আর কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করিলে, কিম্বা সে যুগের বিচিত্র ভাব-সংঘাতে অনাহত থাকিতে পারিলে নবীনচন্দ্র হয়ত বা উপযুক্ত গীতিকবিই হইতে পারিতেন।

আরও একটি কথা। হেম-নবীনের সময়েই মহাকাব্য এবং আখ্যায়িকা-কাব্যকে সরাইয়া উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাতিতে শুরু করিয়াছে। তাই নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয় মহাকাব্য এবং উপন্যাসের কৌতূহলোদ্দীপক সমন্বয়রূপে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগে সর্বত্রই মহাকাব্যের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গল্পোপন্যাস।

মহাকাব্যে আমরা যে আখ্যান, বিচিত্র চরিত্র এবং বর্ণনারস আস্বাদন করিতেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সসমূহ সে সমস্তই আরও স্বচ্ছরূপে একেবারে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত করিল, মহাকাব্যের আর প্রয়োজন রহিল না। আবার এই ব্যক্তিনিষ্ঠতার যুগে ব্যক্তিগত উপলব্ধির শিল্পরূপ মুখ্যতঃ গীতিকাব্য। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়—"যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না, সেই একই কারণে এদেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি। সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না।"[৪] তৎসত্ত্বেও কিন্তু এযুগে যুরোপে মহাকাব্য রচনাপ্রয়াস একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। টমাস হার্ডির The Dynast কাব্যকে epic-drama বলিয়া ধরিলেও অন্ততঃ তিনটি আধুনিক মহাকাব্যের—ইংরেজ কবি এজরা পাউণ্ড-এর Cantos বা সর্গমালা, ফরাসী কবি সাঁ-জন প্যাস-এর Amers বা সৈকতমালা, এবং গ্রীক কবি নিকস্ কাজান্‌ৎজাকিস-এর The Odyssey—নাম এইসূত্রে উল্লেখ করা যায়।[৫] যাহা হোক, রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় কৌতুকচ্ছলে নিজ কাব্যসাধনার প্রকৃতি সম্পর্কে বলিতে গিয়া এই নূতন যুগের গীতি-লক্ষণকেই প্রকাশ করিয়াছেন—

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।—('ক্ষতিপূরণ'-ক্ষণিকা)

বিশেষ করিয়া, রবীন্দ্র-কণ্ঠোৎসারিত সেই হাজার গীতের ঝঙ্কারে, লিরিক সুর-মূর্ছনায় মুমূর্ষু মহাকাব্যের ক্ষীয়মান ধ্বনি আমাদের সাহিত্যে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল। তবুও নবীনচন্দ্রের পরে মানকুমারী বসু (বীরকুমার-

বধ কাব্য), কায়কোবাদ (মহাশ্মশান), যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ, শিবাজী) প্রভৃতি উৎসাহী কবিগণ মহাকাব্য-রচনার দুঃসাহসিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাব্যমূল্য অধিক নয়। কেননা, তাঁহাদের সময়ে পূর্বরচিত মহাকাব্যের পরিবেশ এবং সংস্কারটুকু পর্যন্ত জাতিচিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

এখানে মহাকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী অলংকার-শাস্ত্রে মহাকাব্যকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। Authentic epic বা epic of growth, স্বতঃস্ফূর্ত বা জাত মহাকাব্য প্রাচীন যুগের এক বা একাধিক কবির সৃষ্টি; তাহাতে কাহিনীর প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের পরিবেশ সংস্কার মনোধর্ম প্রবৃত্তিসমূহ যথাযথ ফুটিয়া উঠে, যদিও একটি সার্বকালিক রূপও তাহাদের থাকে। তাহা ছাড়া, আঙ্গিক-পারিপাট্যে এগুলি সর্বথা নিখুঁত নহে, গঠন-শৈথিল্যে ও পরিমিতিহীনতায় এগুলি আদি মানুষের সুস্থ সরল অবিন্যস্ত প্রকৃতিকেই প্রকাশ করিতেছে। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমারের কাব্য এই শ্রেণীভুক্ত। আর Literary epic বা epic of art, সাহিত্যিক বা অনুকৃত মহাকাব্য সচেতন শিল্পীমানসের সৃষ্টি;—বিষয়বস্তু প্রাচীন হইলেও তাহাতে কবির সমসাময়িক যুগের ভাবধারা, সংস্কার, নৈতিক ধারণা প্রভৃতি সুস্পষ্ট আভাসিত হইয়া উঠে। ইহাদের আঙ্গিক-পারিপাট্যে সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার পরিচয় পরিস্ফুট, দৃঢ়পিনদ্ধ কায়াগঠনে এযুগের মানুষের সুদৃঢ় ব্যক্তিনিষ্ঠতার ছাপ সুস্পষ্ট। মিল্টন, কালিদাস প্রভৃতির কাব্য এই শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যেও উভয় ধরণের কাব্যের প্রকৃতি-বিভিন্নতা স্বীকার করা হইয়াছে। সেখানে Authentic বা স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যকে বলা হইয়াছে 'ইতিহাস', এবং Literary বা সাহিত্যিক মহাকাব্যকেই 'মহাকাব্য' বা 'মহৎকাব্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।* দণ্ডী এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ এই ধরণের মহাকাব্যের (অর্থাৎ সাহিত্যিক মহাকাব্যের) লক্ষণ-নির্দেশক সূত্রই বাঁধিয়া দিয়াছিলেন মনে হয়।

ইউরোপে Aristotle মহাকাব্যের যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সুবিদিত। Aristotle-এর মতে—"Epic Poetry is an imitation of serious subjects in agrand

kind of verse. The construction of its stories...should be based on a single action, one that is complete whole in itself, with a beginning, middle and end. It must be either simple or complex....In epic poetry the narrative form makes it possible for one to describe a number of simultaneous incidents, and those, if germane to the subject, increase the body of the poem. This is a gain to the epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest and room for episodes of diverse kinds."[৭] Aristotle Authentic Epic-এর লক্ষণই মুখ্যতঃ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশিত সূত্রে মহাকাব্য হইতেছে মহত্তর জীবনানুকৃতির উদার বিস্তৃত সুগম্ভীর ছন্দোবদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত রূপ। বিশ্বনাথ-নির্দেশিত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥[৮]

বিশ্বনাথের লক্ষণসমূহে এরিষ্টটলের অনুরূপ গভীরতা না থাকিলেও উহাতে নায়ক, বিষয়বস্তু, রস, কাব্যব্যাপ্তি—সমস্ত মিলাইয়া মহাকাব্যের ঐ মহত্তর স্বরূপের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাকাব্যের ঐ মহৎ সত্তার উপলব্ধিসঞ্জাত রসেরই নাম দিয়াছেন 'বিশালরস'।[৯] সুতরাং কি Authentic, কি Literary—সমস্ত মহাকাব্যেই জীবনের গভীরতর রহস্য, সাফল্য-ব্যর্থতা, গৌরব-গ্লানি, গভীর গম্ভীর বাণীভঙ্গিতে প্রকটিত হইয়া পাঠকচিত্তে বিস্ময়ের উদ্বোধ ঘটায়, জীবনের বিশালতায় বিশ্বাস আনে; ইহাই তাহার আন্তর-ধর্ম—বহিরঙ্গ লক্ষণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সেই তুলনায় গৌণ।

এবারে আমরা সংক্ষেপে মধুসূদন ও 'হেমচন্দ্রের, এবং বিস্তৃতভাবে নবীনচন্দ্রের (যেহেতু নবীনচন্দ্রই আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রধান

কেন্দ্র) কাব্যবৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা মহাকাব্যের প্রধান কবিত্রয়—মধু, হেম, নবীন—Literary epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রচয়িতা। ইহারা পৌরাণিক কাহিনীকে বিগত শতাব্দীর মানবতার আদর্শ-জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত এবং নিজ নিজ কল্পনা ও প্রবৃত্তির বর্ণক্ষেপে অনুরঞ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন, পৌরাণিক চরিত্রাদি নবরূপে ও ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। 'রাবণ' সে যুগের আশায় উদ্বেল নৈরাশ্যে জর্জর বন্ধন-অসহিষ্ণু জীবনের প্রতিরূপ; 'বৃত্র' উদ্ধত জৈবশক্তির অবক্ষয়-প্রতীক এবং ইন্দ্র স্বদেশের মুক্তিসাধনার প্রতীক; তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণ' সমস্যা-সংক্ষুব্ধ দেশে এক ধর্ম, কর্ম ও ভাবাদর্শের প্রেরণাসঞ্চারক মহানেতৃত্বের জ্বলন্ত মূর্তি।

দেশবিদেশের কাব্যসাহিত্যে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মধুসূদন মহাকাব্যের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য রীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিয়াও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সব রীতি সম্পূর্ণ পালন করেন নাই। তাঁহার কাব্যের কাহিনী-ঔজ্জ্বল্য তেমন না থাকিলেও জীবনরসের স্পর্শে উহা প্রাণবান্, গঠন-পারিপাট্যে অনবদ্য, সীমিত আয়তনে সুসংহত, বিচিত্র অলঙ্করণে সমৃদ্ধ, ক্লাসিক-মহিমায় ভাস্বর। এই কারণে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মধুসূদনের কাব্যগঠনরীতিকে বলিয়াছেন 'genuine sculptural style' বা ভাস্কর্যরীতি। আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই যে সার্থক মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত, তাহার কারণ literary epicএর আদর্শ ও গঠনরীতি সজ্ঞানভাবে একমাত্র ইহাতেই অনেকটা অনুসরণ করা হইয়াছে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য এককালে মধুসূদনের গৌরবকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার কারণ সম্ভবতঃ ঐ কাব্যের আখ্যানবস্তুর বিশালতা, মহত্তর আদর্শ-প্রবণতা, এবং চিরন্তন নীতি-আনুগত্য। নতুবা উহা জীবনের উত্তাপহীন, কাহিনী-পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণে মধুসূদনের সুস্পষ্ট অনুকৃতির ছায়ায় নিষ্প্রভ। যদিও হেমচন্দ্রের অতি-সতর্কতা এবং শৃঙ্খলানুগ প্রবৃত্তির দরুণ 'বৃত্রসংহার' আঙ্গিক কৌশলে সরল মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে,—যাহাকে ব্রজেন্দ্রনাথ 'Roman Architectural Fashion' বা স্থাপত্যরীতি বলিয়াছেন—তবু উহাতে মানব-রসের উষ্ণতার অভাব পাঠক অনুভব না করিয়া পারেন না।

নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ীর' পরিকল্পনা অতি বিশাল, পটভূমি আরও ব্যাপক। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত-গঠনের উপাখ্যান যেমন জাতীয়

জীবনের ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি মহাকাব্যেরও একান্ত উপযোগী। আয়তনেও এই কাব্য সুবৃহৎ। মধুসূদন বিশ্বনাথ কবিরাজের 'নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ'—সূত্রের অনুসরণে নয়টি সর্গে কাব্য সমাপ্ত করিয়া কেবল সংযম নয়, নাট্যরসবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। তুলনায় হেমচন্দ্রের দুইখণ্ডে চব্বিশ সর্গে সম্পূর্ণ কাব্য বৃহৎ, তাঁহার কাব্যবিষয়ের রূপায়নে এই আয়তন-বিস্তৃতি কিছুটা স্বাভাবিক মনে হইলেও দেখা যায়—দৈর্ঘ্যসত্ত্বেও মূল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দধীচির আত্মোৎসর্গ নেপথ্যে সংঘটিত হওয়ায় কাব্যে মহত্তর জীবনের প্রভাব পড়ে নাই। আবার মধু ও হেমের তুলনায় নবীনের কাব্য বিশালতম; তিনটি গ্রন্থে পঞ্চাশটি সর্গে উক্ত কাব্য বিস্তৃত। রচনার এই বিপুল বিস্তার নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাসপ্রবণ অসংযত কবিপ্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে, কাব্যরীতি ও শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্যই সূচিত করিতেছে। সত্যই অতিদৈর্ঘ্যজনিত বিশৃঙ্খলার অরণ্যে নবীনচন্দ্রের প্রতিপাদ্যবিষয়, ঘটনা-ঐক্য ও ভাবাদর্শ হারাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই কাব্য-পরিকল্পনার বিশালতা ও মৌলিকতা এবং আখ্যানবস্তুর তাৎপর্যময়তা সত্ত্বেও প্রায় সকল সমালোচকই উহার গঠনশৈথিল্য, ঘটনাবাহুল্য, ও বাগ্‌বিস্তারের নিন্দা করিয়াছেন। 'রৈবতক' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মন্তব্য করিয়াছেন—"The simple truth is that ten of the twenty books must be lopped of, if Raibataka is to take a place among the great epics of Bengal."[১০] 'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাসের' ক্ষেত্রেও অনুরূপ আংশিক পরিবর্জন সম্ভব। অসংযত কবিপ্রকৃতি ছাড়াও এই অবিন্যস্ত রচনার অন্যতম কারণ এই যে, নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সুনির্দিষ্ট কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন নাই, স্বভাবধর্মের আনন্দবশেই চালিত হইয়াছেন। তবু তাঁহার এই অযত্নসিদ্ধ কাব্যরূপের মধ্যে বিচিত্র কাব্যরীতির কৌতূহলোদ্দীপক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, যদিও উহা কবির অনুভূতিগোচর ছিল কিনা সন্দেহ। মনে হয়, বিদেশীয় কাব্যরীতি অপেক্ষা দেশীয় কাব্যরীতিই যেন নবীনচন্দ্রকে পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। দেশীয় আদর্শে আলঙ্কারিক নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতার মধ্যেও শৈথিল্যের অবকাশ রহিয়াছে। বিশ্বনাথের লক্ষণ-নির্ণয়ে দেখা যায়, বিচিত্র বর্ণনা এবং উপঘটনা প্রভৃতিকেও মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে; সম্ভবতঃ

মহাকাব্যের বিরাট পরিবেশ রচনার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা তৎকালে অনুভূত হইয়াছিল। 'কাব্যালঙ্কার'-প্রণেতা রুদ্রটও বিভিন্ন বর্ণনীয় বিষয়ের একটি বিশদ তালিকা দিয়াছেন যাহা মহাকাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা চলে। অবশ্য ইহার কাব্যরসগত ত্রুটিও রহিয়াছে। কেননা ইহা কাব্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিলেও অনেক সময় মহাকাব্যের মূল কাহিনীকে আড়াল করিয়া রাখে। নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেখি—মূল আখ্যানভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড কাব্যসৌন্দর্য ও উপঘটনা-মাধুর্য অনেক সময় অপরূপ মোহ বিস্তার করিয়াছে; আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাহা সঙ্গতির অভাবও ঘটাইয়াছে।

নবীনচন্দ্র বৈচিত্র্যপ্রবণ বর্ণনাকুশল কবি। তাঁহার রচনা মূলতঃ চিত্রধর্মী, চিত্রে বিচিত্র বর্ণক্ষেপের উপযোগী বিস্তৃত পরিসর (vast canvas) প্রয়োজন, মূলবস্তুকে ফুটাইবার জন্য নানা আনুষঙ্গিকের সমাবেশ সেখানে করিতে হয়, আবেগময় ঘটনাপুঞ্জ সেখানে কল্পনাকে মুক্তি দেয়। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নবীনচন্দ্রের রচনাকে 'Poetry of Painting" বা চিত্রকাব্য আখ্যা দিয়াছিলেন। কাজেই নবীনচন্দ্র নিজ স্বভাবধর্মের অনুবর্তী হইয়াই বর্ণনা সৌকর্যের অনুকূল যে বস্তুপুঞ্জ কিছুটা বাহুল্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা যেমন ভারতীয় সাহিত্য-সূত্রকারদের অনুমোদিত লক্ষণ-সমূহের বিরোধী নহে, তেমনি Aristotle-স্বীকৃত লক্ষণ অনুসারেও অগ্রাহ্য নহে। সেখানেও আনুষঙ্গিক ঘটনাপুঞ্জ (number of simultaneous incidents) কাব্যদেহকে পুষ্ট করে, তাহারা মহাকাব্যে ঐশ্বর্য ও বিচিত্র কৌতূহল (grandeur and variety of interest) সঞ্চার করে, আর বিচিত্র episode বা উপঘটনা অবতারণার অবকাশও সেখানে রহিয়াছে। তা' ছাড়া, যে মহাভারত অবলম্বনে নবীনচন্দ্র 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাও সর্বাংশে মহাকাব্যের নিখুঁত গঠনকৌশল ও সামঞ্জস্য-সুষমায় পূর্ণ নহে, কেননা উহা ইতিহাস। বিচিত্র উপকাহিনী, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি যেন উহার মূল কুরুপাণ্ডব-আখ্যানমূর্তির চারিদিকে শোভন চালচিত্ররূপে বিরাজ করিতেছে; তথাপি বস্তুমহিমার জন্য উহার গ্রন্থন-শিথিলতা সর্বজনগ্রাহ্য। নবীনচন্দ্র বুঝি তাঁহার উৎস-গ্রন্থের সেই বস্তু-বৈচিত্র্যজনিত শৈথিল্যও গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার Aristotle-অনুযায়ী কাব্যগঠনের বিষয় চিন্তা করিলেও দেখিতে পাই—শৈথিল্যসত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের বিষয়বস্তু-পরিকল্পনাতে রহিয়াছে সুমহান জীবনের অনুকৃতি (imitation of serious subject), তাঁহার কাহিনী-গ্রন্থন জটিল (complex), এবং সেই কাহিনীর ভাবও নৈতিক আদর্শ-প্রণোদিত (ethical), তাঁহার নায়কও character of higher type, বিশ্বনাথের ভাষায়—'ধীরোদাত্ত গুণান্বিতঃ।' অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে এবং বাহুল্যপূর্ণ অংশ উপেক্ষা করিলে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে ঘটনাঐক্যও (unity of action) লক্ষ্যগোচর হয়। তাঁহার বিভিন্ন ছন্দ-প্রয়োগে Aristotleএর না হইলেও বিশ্বনাথের সম্মতি আছে। সুতরাং সজ্ঞানে সুনির্দিষ্ট কোন কাব্যাদর্শ অনুসরণ না করিলেও শিথিলভাবে Authentic এবং literary epic-এর দেশী-বিদেশী উভয় আদর্শ, উপন্যাসের বিশ্লেষণকৌশল, এবং তৎসঙ্গে স্বভাবসুলভ গীতিউচ্ছ্বাস নবীনচন্দ্রের কাব্যে আসিয়া মিলিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে Romance অর্থাৎ প্রণয়দ্বন্দ্ব এবং প্রেমার্তা নায়িকার (বিশেষতঃ জরৎকারু) আত্ম-বিশ্লেষণ মহাকাব্যের পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়াও অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রেমোপাখ্যান-প্রাধান্য মহাভারতে যেমন কিছু কম নহে, তেমনি পাশ্চাত্ত্য প্রাচীন মহাকাব্যেও তাহা দুর্লভ নহে। 'Argonautica' মহাকাব্যের রচয়িতা গ্রীক কবি Apollonius Rhodius সম্পর্কে সমালোচক বলেন—"He introduced into the epic psychological analysis, the epic heroine and the theme of romantic love".[১১] Virgilএর Aeneid মহাকাব্যেও নায়ক Aeneasএর প্রেমমুগ্ধা রাণী Didoর প্রণয়দ্বন্দ্ব-উদ্‌ঘাটনে প্রায় ঔপন্যাসিক আত্মবিশ্লেষণ-রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে—উক্ত মহাকাব্যদ্বয় বহু পূর্বযুগে রচিত, আর নবীনচন্দ্রের কাব্য দ্বন্দ্বসংকুল বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে রচিত, সুতরাং জরৎকারুর আত্মবিশ্লেষণ একহিসাবে যেমন সময়োচিত, তেমনি প্রাচীন মহাকাব্যেও ঐ রীতি-প্রয়োগের নিদর্শন রহিয়াছে দেখিতে পাই।

পূর্বোল্লিখিত মধুসূদনের 'ভাস্কর্যরীতি'—অর্থাৎ উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা এক একটি ভাব বা ঘটনাকে সংযত শব্দ-যোজনায় স্ফুটতর করিবার শিল্পকৌশল; হেমচন্দ্রের 'স্থাপত্যরীতি'—অর্থাৎ অলঙ্করণ নয়, বিশ্লেষণাত্মক বাক্যবিন্যাস দ্বারা অনুভূতির ঋজু প্রকাশ এবং

ভাববস্তুর মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য সঞ্চারকৌশল; আর নবীনচন্দ্রের 'চিত্ররীতি'— অর্থাৎ বর্ণনার বর্ণবিস্তার ও কল্পনার আলোছায়া সম্পাত দ্বারা ঘটনা এবং চরিত্র সম্পর্কে আগ্রহ ও আবেগ সৃষ্টির কৌশল;—এই সমস্তই কবিত্রয়ের মানস গঠন ও শিল্পদৃষ্টির বিভিন্নতার দ্যোতক। কাজেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উপস্থাপনারীতিও এক হইতে পারে না। মৌলিক পার্থক্য আরও রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় ধর্মসংস্কার ও জীবনবিশ্বাসের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তিনজন কবির স্বভাবধর্ম সম্পর্কে শশাঙ্কমোহন সেন সুন্দর পারিভাষিক উক্তি করিয়াছেন—"মধুসূদন শাক্ত, হেমচন্দ্র শৈব, নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব।"[১২] সত্যই মধুসূদনে অস্থির শক্তির প্রচণ্ডতা, তান্ত্রিক-সুলভ দৃঢ়তা, প্রকাশে পৌরুষদৃপ্ত স্বাধীনতা। হেমচন্দ্রে সুস্থির শৈব-প্রসন্নতা, কল্যাণ-আদর্শের স্বপ্নবিভোরতা, প্রকাশে সতর্ক নীতি ও রীতি-আনুগত্য। নবীনচন্দ্রে প্রেমের আলোকদীপ্তি, উচ্ছল বৈষ্ণবীয় ভাববিহ্বলতা, প্রকাশে অসংযত কল্পনাবিহার। আবার তাঁহাদের কাব্য-ভাবনায়ও পার্থক্য লক্ষণীয়। মধুসূদনের সমগ্র সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাই উদ্দেশ্যহীন চিরন্তন সৌন্দর্য-বাসনা, হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল গভীর চিন্তা ও উন্নত আদর্শচেতনা, নবীনচন্দ্রের কাব্যলীলার প্রেরণা আসিয়াছিল আবেগমুখর জীবনবোধ হইতে।

উক্ত আবেগ-প্রবণতা নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তুতে যেমন প্রেম ও ভক্তির প্রাবল্য আনিয়া দিয়াছে, তেমনি তাঁহার কাব্যের পরিবেশ রচনায়ও মুক্ত প্রকৃতির (nature) আনন্দরস সঞ্চার করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্র বিশ্বনাথ কবিরাজের সূত্র—"কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা"—অনুসরণে কোন ঘটনা বা চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের নামকরণ করেন নাই; ঘটনাস্থলকে প্রাধান্য দিয়াই তাঁহার কাব্যের নামকরণ—'রৈবতক' (পর্বত), 'কুরুক্ষেত্র' (সমভূমি), 'প্রভাস' (সিন্ধুতীর)। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁহার কাব্যের ঘটনা সন্নিবেশে সহায়তা করিয়াছে, কবির বিরাট ভাবকল্পনা ও সুমহান জীবনাদর্শকে বিশাল ব্যাপ্তি দিয়াছে। বিহারীলালের কবিতায় পর্বত এবং সমুদ্র তাহার প্রকৃত স্বরূপ—বিশালতা এবং বিস্ময়করতা লইয়া প্রথম ফুটিয়া উঠিলেও আখ্যায়িকা কাব্য এবং মহাকাব্যে পর্বত-সমুদ্রকে বিরাট পটভূমিরূপে নবীনচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার

কাব্যে উহারাও যেন নির্বাক নায়ক। মধুসূদনও একদা পর্বত-সমুদ্রপ্রধান একটি ঘটনা বা বিষয় তাঁহার পরবর্তী মহাকাব্যের জন্ম খুঁজিয়াছিলেন, কেননা কাব্য-ব্যাপকতা ও কল্পনা-প্রসারের জন্ম নিসর্গ-সংযোগ তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন।'[১০] আমাদের সাহিত্যে নবীনচন্দ্র 'রঙ্গমতী' এবং 'কাব্যত্রয়ী'তে পর্বত-সমুদ্রের উপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শুধু কাব্যের পরিধিই বিস্তার করেন নাই, তাঁহার কবিমানসের উত্তুঙ্গতা ও বহমানতারও পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষেত্রবিশেষে সামঞ্জস্যহীনতা ও সংযমের অভাবসত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—উহার মর্ত্যচারী কল্পনা ও জীবনরস-কৌতূহল—বিশেষ লক্ষণীয়। 'আদৌ নমস্ক্রিয়া' দ্বারা নহে, কাব্যত্রয়ীর প্রতিটি কাব্য-খণ্ডের প্রারম্ভেই মহৎ উদার প্রকৃতির সৌন্দর্য-সমুজ্জল বর্ণনা দ্বারা আখ্যান-বস্তুর সূচনা গভীর অর্থবহ; তাহা মহাকাব্যের মহৎ প্রকৃতি ও মহান আদর্শ সূচিত করিতেছে। আবার মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্যের মত নবীনচন্দ্রের কাব্যের ঘটনাবলী দেব-দৈত্য-নর আশ্রয় করিয়া স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে পরিব্যাপ্ত হয় নাই, তাঁহার কাব্যের সংঘটন-ক্ষেত্র মর্ত্যলোক। সেখানে supernaturalism বা অলৌকিকতা যেমন নাই, তেমন Due ex machina বা নেপথ্য-দৈবচক্রান্তও নাই। 'Pharsalia' (The civil war) কাব্য-রচয়িতা Lucan সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি নবীনচন্দ্র-সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—"He is to be commended for having laid the gods aside, and thus given proof that the intervention of the gods is not absolutely required in the epic poem."[১১] নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রধান নায়ক 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' হইয়াও শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁহার লীলাও মানবশক্তিসাধ্য। এইভাবে কৃষ্ণলীলাকে অতিপ্রাকৃত অতি-মানবীয়তা হইতে মুক্ত করিয়া উপস্থাপিত করিবার প্রয়াসের মধ্যে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের নিকট কবির স্বকীয় বিশ্বাস ও হৃদয়-বৃত্তির পরাভব সূচিত হইয়াছে কিনা, কবিমানস ও কবিকৃতির মধ্যে ভাবগত ঐক্য সংরক্ষিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা যথাস্থানে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া বিচার করিব। এখানে কবির মানবিক পরিকল্পনার তাৎপর্যই সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। তাঁহার অন্যান্য চরিত্রসমূহও দোষগুণসম্পন্ন মানুষ। সন্নিবিষ্ট ঘটনাবলী কখনো কখনো অবান্তর বাহুল্য মনে হইতে

পারে, কিন্তু অবাস্তব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সংঘাত ও সমন্বয়ের সমস্যা গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই নবীনচন্দ্রের কাব্যে বিধৃত হইয়াছে। বাস্তবভিত্তিক বলিয়াই তাঁহার কাব্য এক হিসাবে যুগচিত্র। এই ঔপন্যাসিক বাস্তবতা রহিয়াছে মহাভারতে, মঙ্গলকাব্যে; নবীনচন্দ্রের কাব্য উহাদের অনুসারী। এই কারণেই পূর্বে বলিয়াছি—নবীনচন্দ্র কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে এক বিচিত্র সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কাহিনী-গ্রন্থনে উপন্যাসিক জটিলতা, প্রণয়দ্বন্দ্বে রোমান্সের রসস্পর্শ। এই রোমান্সরসের আভাস কিছুটা ছিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে ও বীরাঙ্গনা কাব্যে। যাহা হোক, বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্ষয়িতশক্তি 'মহাকাব্যের' বিলয় এবং প্রবল সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বল 'উপন্যাসের' উদয়—তাহারই সন্ধিক্ষণে থাকিয়া নবীনচন্দ্রের কাব্য পরবর্তী নবীন যুগোচিত প্রকাশ-বাহনের (উপন্যাসের) সার্থকতার ইঙ্গিত দিতেছে।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যে মহাকাব্যরচনা-প্রয়াসে নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব পরিমাণ করিতে গিয়া কোন বিশেষ কাব্যাদর্শ আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার কাব্যত্রয়ের স্বতন্ত্র রূপ, ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহার কাব্যকে আর 'ব্যর্থতার মরুভূমি' এবং 'মাইকেলের শিল্পের ব্যর্থ অনুকরণ'[১৫] বলিয়া মনে হইবে না। মাইকেলের অনুকৃতি হেমচন্দ্রে সুস্পষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা রীতি, কি উদ্দেশ্য ও আদর্শ, কি চরিত্রচিত্রণ, কি ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ—সর্বক্ষেত্রেই নবীনচন্দ্র মধুসূদন হইতে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। আর একটি কথা। "Epic poetry is one of the complex and comprehensive kinds of literature,—in which most of the other kinds of literature may be included,"[১৬] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাকাব্য নাট্যরসপ্রধান, গীতিরসপ্রধান, তত্ত্বপ্রধান, এমন কি রোমান্সধর্মী হইলেও ক্ষতি নাই,—যদি উহাতে মহাকাব্যোপযোগী বিশালতা, মহৎ আন্তরধর্ম এবং জীবনের বিরাট স্বরূপের অভিব্যক্তি থাকে। এরূপ মহাকাব্য যে সাম্প্রতিককালেও (১৯৩৮) রচিত হওয়া সম্ভব, তাহা গ্রীক কবি কাজানৎজাকিসের 'The odyssey—A modern sequel' নামক মহাকাব্যের প্রকৃতি-বিচার করিলেই বোঝা যায়। সমালোচক বলেন—"Although the rhythm

and scope of the odyssey are epical, the psychological insight and development dramatical, the structure mystical and symbolical, the narrative method is often lyrical."[17] সুতরাং মহাকাব্যের ধারণা এ যুগে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস—নবীনচন্দ্রের হাতে মহাকাব্যের তেমনি এক ভিন্নতর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই ভিন্নতার প্রকৃতিও এই প্রবন্ধে নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কাব্যত্রয়ীর বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া নবীনচন্দ্রের কাব্যপরিকল্পনা ও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য, তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি সম্যক বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

সূত্র-নির্দেশ

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৩০৭ পৃঃ।

২। The Epic—L. Abercrombie, p. 69.

৩। মধুসূদনের জীবনচরিত—বসু, ৩৫৫ পৃঃ।

৪। প্রবন্ধ-সংগ্রহ, ১ম ভাগ—প্রমথ চৌধুরী, ১১৫ পৃঃ।

৫। The odyssey—A Modern Sequel কাব্যের আলোচনা করিতে গিয়া 'মম্মট ভট্ট' নামধেয় লেখক বলেন—"এ যুগে শুধু মহৎ কবিতা নয়, প্রতিভাবান কবির পক্ষে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত অর্থেও প্রকৃত মহাকাব্য রচনা সম্ভব।"—'বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি' দেশ, ৭ চৈত্র, ১৩৬৫।

৬। History of Sanskrit Literature—Dr. S. N. Das Gupta & Dr. S. K. De, p. 173.

৭। Poetics—Aristotle, p. 34.

৮। সাহিত্য দর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ কবিরাজ

৯। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভূমিকা।

১০। 'The Neo-Romantic Movement in Literature'—Sir B. N. Seal, Calcutta Review, Vol. XCII, Jan. 1891.

১১। The Classical Background of English Literature—J. A. Thomson, p. 49.

১২। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন, ২২৫ পৃঃ।

১৩। মধুসূদনের জীবন-চরিত—বসু, ৩৬২ পৃঃ।

১৪। English Epic and Heroic Poetry—W. M. Dixon, p. 4.

১৫। 'কাব্যবিতানে'র ভূমিকায় এবং 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য

১৬। Epic and Romance—W. P. Ker, p. 16.

১৭। Introduction, by Kimon Friar, P. XXXV ; in English Translation of 'The Odyssey—A modern Sequel' by NiKos Kazantzakis.

কাব্যত্রয়ী

(রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস)

১

পূর্বেই বলিয়াছি—'রঙ্গমতীতে'ই কবির পরবর্তী 'কাব্যত্রয়ীর' সুমহান পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হইয়াছে, মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সূচিত হইয়াছে। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'—সমভাবসূত্রে গ্রথিত এই কাব্যত্রয় নবীনচন্দ্রের প্রধান কীর্তিসৌধ। তাঁহার প্রতিভার সমস্ত স্বধর্ম—সুদূরবিস্তৃত পটভূমিতে মহাকাব্য গঠন, প্রাচীন মহাভারতীয় কাহিনীতে কল্পনাবলে বর্তমান যুগ-সমস্যার প্রতিচ্ছবি অবলোকন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মহত্তম আদর্শ নির্ণয়, রোমান্টিকতা, গীতিকাব্যরসপ্রবণতা, নিসর্গতন্ময়তা, সর্বোপরি ভাব ও ভাষার বিপুল আবেগ—সমস্তই উৎকর্ষে অপকর্ষে, আলোকে অন্ধকারে, কাঠিন্যে তারল্যে এই কাব্যত্রয়ীতে মুকুলিত মুঞ্জরিত হইয়াছে। এই বিশাল কাব্য সাময়িক ভাবোন্মাদনার ফল নয়, দীর্ঘকালের ধ্যান ও উপলব্ধি ইহার রচনার পশ্চাতে নিয়োজিত ছিল। কবি এই কাব্যসৃষ্টির যে নেপথ্য-ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রারম্ভে জ্ঞাতব্য। ১২৯৩ সালে 'রৈবতক'এর উৎসর্গপত্রে (ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে) কবি লিখেন—

"কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এবং বৌদ্ধধর্মের আদিতীর্থ 'গিরিব্রজপুর' বা আধুনিক রাজগৃহে রাজকার্যে অবস্থান-কালে স্থানমাহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে কাব্য-জগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর একবার পাঠ করি।...মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গ-লেখা এখনও সেই শৈল উপত্যকার শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত এবং মহাভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার প্রথমাংশ রচিত হইল।" পরে আরও বিস্তৃতভাবে আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"আমি

ঘোরতর বিপন্ন হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র বদলী না হইলে আমার সেই যৌবন-সুলভ বিলাস-বাসনা-পূর্ণ-হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র ছায়া পতিত হইত না ;...আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না।...সেখানে বসিয়া আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। এ উদ্বেলিত হৃদয়ে আমি শ্রীক্ষেত্র হইতে মাদারীপুর, মাদারীপুর হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বেহার সবডিভিসনে স্থানান্তরিত হইয়া যাই। বেহার বুদ্ধদেবের আদিলীলাভূমি।...রাজগিরে শিবিরে বসিয়া মহাভারত পড়িতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য (Stupendous epic) নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য।...তখন দুটি মহামূর্তি আমার হৃদয়-আকাশে পূর্ণিমাসন্ধ্যার পূর্ণ-চন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। বুঝিলাম অন্তর বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম মহাভারত।...এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্মরাজ্য।...একদিকে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এবং অন্যদিকে 'অমিতাভ' অঙ্কুরিত হইল।" [১]

কাব্যত্রয়ীর মধ্যে 'রৈবতক' ১৮৮৭ সালে. 'কুরুক্ষেত্র' ১৮৯৩ সালে এবং 'প্রভাস' ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। রৈবতক ২০ সর্গে, কুরুক্ষেত্র ১৭ সর্গে এবং 'প্রভাস' ১৩ সর্গে সম্পূর্ণ। সুতরাং বাহ্যতঃ তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও একই ভাবঐক্যসূত্রে গ্রথিত এই কাব্যটি বিশালতায় এবং বৈচিত্র্যে বাঙ্গলাসাহিত্যে অনন্য। ইহার রচনাকালও দীর্ঘপ্রসারিত। এইজন্য কেহ কেহ ইহার কাব্য-প্রেরণার বিশুদ্ধিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"বুদ্ধিপ্রধান মননশীল প্রবন্ধ এইভাবে নূতন চিন্তায়, নূতন উপস্থাপনারীতিতে ধীরে ধীরে রচিত হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা (সে প্রেরণা লিরিক হউক বা এপিক হউক) এইভাবে টানিয়া বিস্তারিত করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায়।...নবীনচন্দ্রের প্রেরণা বিশুদ্ধ হইলে তাহা...দীর্ঘ দশবৎসর স্থায়ী হইতে পারিত না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 'Divine vision' শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রেরণা স্বরূপ কাজ করে নবীনচন্দ্রের প্রেরণা সে স্তরের নয়।" [২] উক্ত সমালোচক-নির্দেশিত নবীনচন্দ্রেব প্রেরণাগত ত্রুটি সম্পর্কে আমাদিগকে

একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কৃষ্ণলীলা-কাব্যত্রয়ীর প্রেরণাকাল ১৮৭৭ সাল, যথার্থ কাব্যের প্রস্তাবনা রচিত হয় ১৮৮২ সালে, প্রথম কাব্য 'রৈবতক' রচনা শেষ হয় ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৫। কাব্যের পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার মধ্যে এই কালব্যবধান কি সত্যই কবিপ্রেরণার অবিশুদ্ধি সূচিত করে? সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে 'উদ্দীপন-বিভাব' বলে, তাহা দ্বারা কোন বস্তুর বা ঘটনার রস উদ্দীপনক্ষমতাই বুঝায়; অর্থাৎ সে বস্তু ঘটনা বা কাহিনী কবিচিত্তকে উদ্দীপ্ত বা অনুপ্রেরিত করে। এই বহির্ঘটনাসঞ্জাত প্রেরণাকে ইংরেজীতে experience বলা হয়। "Some phantasy may have flashed into his (poet) mind. But it must be an experience peculiar in one respect; it must be of a kind to take hold of him and to demand utterence"[৩] শ্রীকৃষ্ণের 'অমানুষিক লীলা আমার হৃদয়ে জাগিতে ও নয়নাগ্রে ভাসিতে লাগিল',—কবির এই উক্তিতে প্রকাশিত তদ্গত মনোভাবও কি Experience নয়, এবং উহা কি কবিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া (take hold of him) তাঁহাকে প্রকাশ-ব্যাকুল করিয়া তোলে নাই (demand utterence)? সুতরাং এই তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি নবীনচন্দ্রের কল্পনাপ্রবণচিত্তে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল তাহাকে যথার্থ কবিপ্রেরণা বলিতে বাধা কোথায়? শ্রীক্ষেত্রের revelation কবিকে যে বহুকাল ভক্তি-আবেশে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস্য নয়।

অতঃপর বিলম্বিত রচনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয়, সৃষ্টিমাত্রই যুগপৎ স্বপ্ন ও শিল্প। স্বপ্ন প্রেরণাময়, শিল্প অধ্যবসায়সাপেক্ষ। স্বপ্ন ক্ষণপ্রকাশ, অধ্যবসায় বিলম্বিত ব্যাপার। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। Objective রচনার ক্ষেত্রে—মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাসের ক্ষেত্রে—কাব্যসূচনা ও সম্পূর্ণ কাব্যরূপায়ণের মধ্যে কাল-ব্যবধানের দরুণ মূল প্রেরণার বিশুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়ার বিশেষ কারণ থাকে না। ইংরেজী সাহিত্যেও বহু উল্লেখযোগ্য কাব্যের নানা অংশ দীর্ঘকাল ব্যবধানে রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। বায়রণের 'Childe Harold's Pilgrimage'-এর এক একটি সর্গই তো দীর্ঘকাল পরে পরে রচিত হইয়াছিল; (1st canto—1809, 2nd—1810, 3rd—1816, 4th—1817) তজ্জন্য উহাকে অবিশুদ্ধ প্রেরণাসঞ্জাত বলা হয় নাই। টেনিসনের 'In Memoriam' ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০

খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়, তাহাতে সেই শোক-গাথার নিরবচ্ছিন্ন সুর বিম্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Excursion' পরিকল্পিত হয় ১৭৯৮ সালে, কিন্তু ধীরে ধীরে রচিত হইয়া উহা প্রকাশিত হয় ১৮১৪ সালে; তজ্জন্য তাহা প্রেরণাহীনতার অপবাদ লাভ করে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে মধুসূদনের নয় সর্গবিশিষ্ট 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই মাত্র বৎসরকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, রচনার ক্ষিপ্রগতি একমাত্র মধু-প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য, চারি বৎসরকাল মধ্যেই তো তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যসাধনা ও সিদ্ধি। হেমচন্দ্রের ২৪ সর্গবিশিষ্ট 'বৃত্রসংহার'এর ১ম খণ্ড ১২৮১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৮৪ সালে সম্পূর্ণ হয়। সেই তুলনায় তিনখণ্ডে ৫০ সর্গে প্রসারিত বিরাট 'কাব্যত্রয়' বহুকর্ম-ব্যাপৃত নবীনচন্দ্রকে যদি দীর্ঘকাল নিযুক্ত রাখিয়া থাকে, তবে খুব দোষাবহ মনে হয় না। নানাকারণে নবীনচন্দ্র কখনই একটানা অনেকক্ষণ লিখিতে পারিতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"এমন কি মাসের পর মাস, কখনও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিছুই লিখিবার সময় পাই নাই, কারণ প্রাতঃকাল ভিন্ন অপরাহ্নে কি প্রদীপালোকে আমি একটি অক্ষরও লিখিতে পারি না।······আমার কোন কাব্য আমি অল্পসময়ে লিখিতে পারি নাই।······কেবল 'পলাশির যুদ্ধ'খানি মাত্র তিনমাসে লিখিতে পারিয়াছিলাম। 'রঙ্গমতী লিখিতে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। ······তদ্রূপ 'রৈবতক' লিখিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল।······'কুরুক্ষেত্র লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। 'প্রভাস' লিখিতেও প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল।"[৬] কাব্যত্রয়ীর প্রকৃত রচনাকাল সাড়ে ছয় বৎসর, যদিও প্রকাশকাল হিসাবে দশ বৎসর। তন্মধ্যে 'রৈবতক'ই অধিক সময় লইয়াছে দেখা যায়, কারণ উহা 'ভারত'-কথার গুরুত্বপূর্ণ নবপরিকল্পনার প্রথম কাব্য হওয়ায় তৎসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নবীনচন্দ্রকে উহার রচনাকালেই অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতেও রচনার গতি কিছুটা মন্থর হইয়াছে। যাহা হোক, কাব্যত্রয়ীর এক একটি খণ্ড দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত হইলেও কবির অন্তরে উহা এক অখণ্ড ভাবঐক্য-সূত্রেই বিধৃত ছিল। কাব্যরচনা সম্পর্কে মধুসূদনের উক্তিসমূহের (পত্রাবলীতে ব্যক্ত) আন্তরিকতায় যদি আমরা সন্দেহ না করি, তবে নবীনচন্দ্রের বক্তব্যও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। শ্রীক্ষেত্রে 'কাব্যত্রয়ীর' অনুপ্রেরণালাভ

যেমন Divine vision এর অনুরূপ, তেমনি কাব্যরচনাকালেও তাঁহার আবিষ্ট অবস্থার কথা নবীনচন্দ্র জানাইয়াছেন—"এ তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণরসের উচ্ছ্বাসে কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিত,·· ···আমি চতুর্দশবৎসরব্যাপী ···শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম।····· যখন যে সর্গ লিখিতেছি, উহার দৃশ্য দিনরাত্রি আমার চক্ষের উপর ভাসিত।"[৫] 'প্রভাসের' উপসংহারে এই কাব্যবিষয়-তন্ময়তার কথা গভীর আন্তরিকতার স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে—

চতুর্দশ বর্ষ মাগো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে!
পাইয়াছি শোকে শান্তি, পাইয়াছি দুঃখে সুখ;
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।

নবীনচন্দ্র মহাভারতীয় ঘটনা এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে কী দৃষ্টিতে কোন্ আদর্শে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত আমরা নেপথ্য-ইতিহাসে পাইয়াছি। উক্ত পরিকল্পনার মৌলিকতা সম্পর্কে প্রায় সকল সমালোচকই প্রশংসাসূচক উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশের (১৮৯৩, ১৩০০) প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'নব্যভারত' পত্রিকাই প্রথম নবীনচন্দ্রের মৌলিকতায় সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন—"কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমবাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম ও ধর্মরাজ্যসংস্থাপন। ······কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।"[৬] এই বিষয়ে নবীনচন্দ্রের অধমর্ণত্বের কথা এখনও প্রচারিত আছে, যদিও তখনই উক্ত সমালোচনার উত্তরে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এক প্রবন্ধে[৭] কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 'রঙ্গমতী' কাব্যের (১৮৭৫ সালে রচনা সূচিত এবং ১৮৮০ সালে প্রকাশিত) অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া (এই গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ) দেখাইয়াছিলেন যে, নবীনচন্দ্রের কল্পনায় কৃষ্ণচরিত্র পূর্বেই অনুরূপভাবে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'রঙ্গমতী' সূচনার কিছুপূর্বে, এমন কি 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশেরও মাস-খানেক পূর্বে বঙ্গদর্শনের একটি প্রবন্ধে[৮] প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আভ্যন্তরীণ বিবাদে

বিপর্যস্ত সমাজে—"দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান, এক সমর-বিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রী। এক মল্টকে, দ্বিতীয় বিসমার্ক।......মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।......এখানে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন-বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত।......শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই। ...অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পরবিরোধী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পর নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল।" নবীনচন্দ্র যে এই প্রবন্ধের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহার মন্তব্য হইতে বুঝা যায়।—"রঙ্গমতী যখন রচিত হইতেছিল, তখন বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অন্ধকারপূর্ণ 'বঙ্গদর্শনী' মত প্রচার করিতেছিলেন।"* তিনি আরও বলিয়াছেন, "এতদিন ইংরেজের শিক্ষাত্বের কল্যাণে আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে মহাভারতখানি একটি অদ্ভুত গল্পমাত্র। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তিনি একজন কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র। 'বঙ্গদর্শন' একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিসমার্ক, অর্জুনের রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন।" বঙ্কিম-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র-বৈশিষ্ট্য যে নবীনচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা অগ্রবর্তী হইলেও নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের (বঙ্কিমের অগ্রগামিতার নিদর্শনাত্মক প্রবন্ধটি তখন তিনি লক্ষ্য করেন নাই মনে হয়) পূর্বোক্ত প্রবন্ধের যুক্তিও অনুধাবনযোগ্য—"প্রচার পত্রে"* বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইবার আরম্ভের পর 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' প্রচারিত হয়। অতএব অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, মৌলিক কল্পনার জন্য নবীনবাবু বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।...বঙ্কিমবাবু এইভাবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝিয়াছেন—'যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—বেদে ধর্ম নয়, ধর্ম লোকহিতে,—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।' 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রের' পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, নব্যভারত যাহাকে

কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন—'রৈবতকের'ও মৌলিক কল্পনা।...আর এক কথা। ধর্ম ও ধর্মরাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে এক হইলেও বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ও নবীনবাবুর কৃষ্ণচরিত্র কি এক? কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমবাবু ভাগবতের ব্রজলীলা অনৈতিহাসিক বলিয়া এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমবাবু পূর্বমত পরিহার করিয়া ব্রজলীলার কতকটা ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর স্নেহের পুতুল, ইহার অধিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু নবীনবাবু প্রথম হইতেই ব্রজলীলায় বিশ্বাসবান। নবীনবাবু 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় মুদ্রণের বহুপূর্বে প্রকাশিত 'রৈবতকে'র এক সর্গ...ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণের চিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত করিয়াছেন।......নবীনবাবু সর্বত্রই ভাগবতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা, এই উভয় মিলাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব, বঙ্কিমবাবুর এবং নবীনবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের ধারণা অনেক অংশে বিভিন্ন।" নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পাণ্ডিত্য মনীষা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির আলোকে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন, আর মহত্তর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হৃদয়বান আবেগপ্রবণ কবি নবীনচন্দ্র মহামানব শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে পূর্ণচরিত্র করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। ইতিহাসের এই কাব্যরূপ যে প্রয়োজন ছিল, তাহা বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্রুডের মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"মহৎ ব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা কবিপ্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।...বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে তর্ক যুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে।"[১১] ঠিক বঙ্কিমের অনুসরণ না করিলেও নবীনচন্দ্র যেন সেই প্রত্যাশিত কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভাবনার পূর্বেই এই কৃষ্ণমহিম-গাথা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, নবীনচন্দ্রের রৈবতক' প্রকাশের এক বৎসর পূর্বে। উহার দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। ইহাতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত-পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।" এই মত-পরিবর্তনে 'রৈবতকের' ঐশ্বর্য-মাধুর্যসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণলীলাখ্যাপন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতেও পারে। যাহা হোক, নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' নিকট ঋণী না হইলেও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে—"তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যবলে 'কৃষ্ণচরিত্র' না লিখিলে আমার এই তিনখানি কাব্য বঙ্গসাহিত্যে দাঁড়াইতে পারিত কিনা সন্দেহ।"[১২] বস্তুতঃ, 'কৃষ্ণচরিত্র' পূর্বে প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণ পাঠক তথ্য ও তত্ত্ববহুল 'কৃষ্ণচরিত্রেরই' ভাবাবেগপূর্ণ জীবনরসসিক্ত কাব্যরূপায়ণরূপেই নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ী'কে গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রচলিত ধারণা এই যে—শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মানবিক আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন মনীষী কেশবচন্দ্র সেন, এবং তাঁহারই অনুসরণে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' নামক গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য সাধারণ্যে প্রচার করেন।[১৩] কিন্তু ১২৮১ সালে (১৮৭৫) বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে কেশবচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে কোন উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। কেশব-সহচর গৌরগোবিন্দ রায়ের একটি মন্তব্যে জানিতে পারি—২৭ আগষ্ট, ১৮৭৬ তারিখের কাছাকাছি সময়ে কেশবচন্দ্র অনুরাগীদিগকে মৌখিকভাবে বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সাধারণের যে প্রকার সংস্কার, তাহা সত্য নহে।'[১৪] ইহা হইতে এবং পরবর্তী সময়ের নানা উক্তি হইতে বোঝা যায়, কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণমহিমা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। Indian Mirror, 28 Jan. 1877, সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া কেশবচন্দ্র বলেন—"Krishna preached the religion of the world of the politician and warrior." এইখানে বঙ্কিমের ধারণার সহিত তাঁহার বক্তব্যের মিল রহিয়াছে। কিন্তু পরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে[১৫] দেখিতে পাই—কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা, অবতারত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনুকূল যুক্তিসমূহ প্রচার করিতেছেন। ইহা সত্য যে, ১৮৭৬ সাল হইতেই তিনি তাঁহার অনুগামীদিগকে কৃষ্ণের মানবিক মহিমা বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিয়া

তুলিতেছিলেন। কেশবচন্দ্রের এই উদার দৃষ্টি এবং বিভিন্ন আদর্শ-উপলব্ধির আন্তরিক প্রয়াস তাঁহার সমন্বয়াত্মক জীবনদর্শনেরই পরিচায়ক। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ১লা কার্তিক, ১৭৯৮ শকে (১৮৭৬) 'ধর্মতত্ত্ব'-পত্রিকায় 'কৃষ্ণের জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা', তাহা বিশ্লেষণ করেন এবং ১৮৭৮ সালে স্পষ্টভাবে লিখেন—"কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে এই জানিতে হইবে যে, তিনি অদ্বিতীয় সুন্দর শিশু, বাৎসল্যরস চরিতার্থের গোপাল, প্রিয়তম সখা, চিত্তহারী প্রেমবান সুরসিক যুবা, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ রাজনীতিক মন্ত্রী, তত্ত্বদর্শী যোগাচার্য, ভাবগ্রাহী ভক্তিরসজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে এক একটি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অবতার বল আর মহাপুরুষ বল, ইঁহার মত বিস্তৃত প্রভাব এবং প্রতিভা ভারতবর্ষের মধ্যে কাহারও নাই।"[১০] তৎপর গৌরগোবিন্দ রায় গভীর শ্রদ্ধা ও পাণ্ডিত্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করেন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন—"ভারতের ধর্মমধ্যে এক মহাশক্তি প্রথম হইতে কার্য করিতেছিল।...সেই মহাশক্তি যথাসময়ে একজন ব্যক্তিকে অভ্যুদিত করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে ধর্মের যে উপাদানগুলি ছড়ান আছে, তাহার কোনটিকে তিনি ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িলে তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।...শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে এই বিরোধভঞ্জন করিলেন।...শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিলেন তাহাতে একদেশ ও একজাতির মধ্যে ধর্মের যে সকল উপাদান বিশ্লিষ্টভাবে ছিল তাহা একীভূত হইল।"[১১] সুতরাং সময়ের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় বঙ্কিম কিছুটা অগ্রবর্তী হইলেও দেখা যায়—কেশবচন্দ্র যখন অনুরাগীবৃন্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণমানবতার আদর্শ-বিশ্লেষণ করিতেছেন, তখনও বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণ-গবেষণা 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের ধারণানুরূপ মহিমময় কৃষ্ণের সহিত নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-পরিকল্পনার সাদৃশ্য যেন অধিক মনে হয়।

কাব্যত্রয়ী-রচনার নেপথ্য-ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি—কোথায়, কিভাবে, কোন্ অবস্থায় নবীনচন্দ্রের ভক্তিপ্রবণ হৃদয় কৃষ্ণমহিমার গভীরতর উপলব্ধি-রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনা এবং মহাভারতীয় ঘটনার নবীন উপস্থাপনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা হইতেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শের আপাতঃ পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনখানি কাব্যেরই 'প্রস্তাবনা' রচনা

করিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে দেন। তৎসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে একটি বিষয় লক্ষণীয়—নবীনচন্দ্রের বিশাল কল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করিয়া তিনিই উহাকে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' আখ্যা দিয়াছিলেন, তবে উহার কাব্যরূপায়ণের দুরূহতা-বিষয়ে গোড়াতেই তিনি কবিকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দেন।—"You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্মরামায়ণ। It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you execute with the same grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poem will of course take its rank as the greatest in the language.......I warn you, however, not to be too confident of success; of popularity, I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century.......The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them."[১৮] কালীপ্রসন্ন ঘোষও অনুরূপভাবে সতর্ক করিয়া কবিকে লিখিয়াছিলেন—"conception extraordinarily grand. Execution ঠিক তেমন হইবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। মহাভারত-রূপ কাব্যসমুদ্রকে আবার সাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্ধার কথা, পারিলে অসামান্য সুখের কথা।'"[১৯] মনে রাখিতে হইবে—এ পর্যন্ত কাব্যত্রয়ীর যত বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ এই execution বা উপস্থাপনা লইয়া।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সেই প্রস্তাবনার নানা বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্যও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কবির ইতিহাস-বিরোধিতা সম্পর্কে মন্তব্যই গুরুতর। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি—প্রথমতঃ, নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মসংস্কারক, (Religious Reformer) এবং মহাভারত (The Great Indian Empire) স্থাপনকারী বলিয়া তাঁহাকে নূতন চরিত্র (New character) দিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ,

ইহা (historically and politically untrue) ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক-ভাবে অসত্য যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশক্তির বিরোধী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা অনার্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল।[২০] নবীনচন্দ্র এই মন্তব্যের যে সুদীর্ঘ উত্তর দিয়াছিলেন তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, কেননা, উহা হইতেই কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মহাভারতীয় ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ মর্মবিশ্লেষণ-প্রয়াসের পরিচয় মিলিবে। এই বিশ্লেষণ সর্বথা গ্রহণযোগ্য না হইতেও পারে; কিন্তু যে কৃষ্ণ এবং যে মহাভারত ভাবাবিষ্ট নবীনচন্দ্রের কবি-কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহাকে যুগ-প্রয়োজনানুকূল রূপ-দানের যে ব্যাকুলতা কবিচিত্তে জাগিয়াছিল, তাহার সত্যতা এবং গুরুত্ব তথ্যনিষ্ঠা হইতে বড়। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"যদি ধর্মসংস্কার বা ধর্ম সংস্থাপন, এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল না, তবে তাঁহার লক্ষ্য কি ছিল? ভাগবতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরেই বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ঘোরতর কর্মবাদ প্রচার করেন। ইহার অর্থ যদি ধর্মসংস্কার না হয়, তবে কি? কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সমর্থনকারী (champion) হইলে ভাগবতের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত কিশোর-কৃষ্ণকে একমুষ্টি অন্ন পর্যন্ত ভিক্ষা দিয়াছিল না কেন? কৃষ্ণসখা বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্বাসা ঋষির সশিষ্য অন্ন করিতে যাওয়ার, এবং কৃষ্ণের শাক ভোজনে তাঁহার পরাভবের অর্থ কি? ভৃগুমুনির কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার অর্থ কি? কৃষ্ণ-পাণ্ডবদের পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা পর্যন্ত নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাইয়া ভারত নিঃক্ষত্রিয় করিল কে?—কর্ণ। কর্ণ কে? দুর্বাসার মন্ত্রজাত কুন্তীর কানীন পুত্র। এই মন্ত্রজাত পুত্রের অর্থ কি? সূর্য কি মানুষীর গর্ভে এরূপ পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুরদের অভিশাপে ক্ষত্রিয়াবশিষ্ট কৃষ্ণের বংশের ধ্বংসের এবং দুর্বাসার অভিশাপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর অর্থ কি? মুষলের ও দুর্বাসার পায়সের গল্প কি বঙ্কিমবাবু বিশ্বাস করেন? আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃষ্ণের অপমৃত্যু ঘটাইল কে?—অনার্য জরাব্যাধ। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের ফলভোগ হইল কেন?—আবার অনার্য ব্যাধেরা যাদবদের সর্বস্ব এমনকি রমণীদের পর্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল কেন? তাহার পর ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতকে হত্যা করিল কে?—তক্ষক। তক্ষক কি সর্প, না অনার্য নাগপতি তক্ষক? অনার্য তক্ষক পরীক্ষিতকে হত্যা করিলেন কেন? তাহাও আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে। এরূপ সর্বত্রই ব্রাহ্মণের

অভিশাপ কার্যে পরিণত করিবার অস্ত্র—অনার্য। ইহার কারণ কি? সর্বশেষ জনমেজয়ের সর্পসত্রের অর্থ কি সাপ পোড়ান, না পিতৃহন্তা নাগপতির সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ? এই যুদ্ধে নাগজাতিকে কে রক্ষা করিয়াছিল? —আস্তিক। আস্তিক কে? ব্রাহ্মণ জরৎকারু ঋষির পুত্র। তাহার মাতা কে? অনার্য নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু। ব্রাহ্মণ ঋষি-ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি কি সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সাপের গর্ভে কি মানুষ আস্তিক জন্মাইয়াছিলেন? এবম্বিধ ঘটনাবলীর অর্থ কি এই নয় যে, দুর্বাসাপ্রমুখ এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন, এবং অনার্য জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া সবংশ তাঁহার বংশের এবং সমগ্র ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন? দুর্বাসা যে কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্কিমবাবু একথা পরে কৃষ্ণচরিত্রে স্বীকার করিয়াছেন।...উপসংহারে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি যখন এরূপ তীব্রভাবে এ কাব্য লিখিতে বারণ করিতেছেন, তখন উহা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আমি পরিত্যাগ করিলাম।"[২১] বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কখনই 'কাব্য লিখিতে বারণ করেন নাই'। পূর্বোদ্ধৃত পত্রে যেমন তিনি লিখিয়াছিলেন—'I do not write to dissuade you from the attempt'. তেমনি পরেও ভগ্নোদ্যম নবীনচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া তিনি যে পত্র লিখেন, তাহাতেও মনে হয়, এই নূতন পরিকল্পনার কাব্যরূপায়ণ তাঁহারও অভিপ্রেত ছিল।—"I do not quite understand why you should feel diffident in carrying on the Raibatak. My own plan is never to seek the opinions of others.···Genius—even more latent,—must work out its conception."[২২]

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা মূলতঃ নবীনচন্দ্র হইতে ভিন্নতর বলিয়া মনে হয় না। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে দেখা যায়—বঙ্কিমের দৃষ্টিতে 'শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্, সাম্রাজ্যের গঠনবিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য।' মহাভারতের যুগে বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত রাজগণকে একচ্ছত্রাধীন করার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনীতিকুশল নায়কের, তাই বঙ্কিম বিসমার্কের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্বের তুলনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীও ছিল শিথিল ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ পরস্পর কলহমত্ত ৩০টি স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি। এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় সেখানে বিসমার্ক ছিলেন

—"The greatest man the age produced, greatest in the political manifestations of his powers and in the influence which his achievements have exercised in the history of the world.... He created the German Empire."[২০] শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে মুখ্যতঃ ক্রূরকর্মা, দূরদর্শী রাজনীতি-বিশারদ রূপে দেখা নবীনচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। কেননা, বঙ্কিমের কৃষ্ণ সকলকে একচ্ছত্রাধীন করার জন্ত প্রথমে পরস্পর-বিরোধী রাজগণের ধ্বংস কাম্য মনে করেন। ইহা যেন ইউরোপীয় পদ্ধতির unification. অথচ মহাভারতের যুগের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের কাব্যেও দেখি তাই,—

যতদিন খণ্ডরাজ্য রহিবে ভারতে, আর্য
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়;
রহিবে এ রাজ্যভেদে ধর্মভেদময়। (রৈবতক—১৭শ)

এই বিচিত্রভেদ দূরীকরণের জন্ম নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণও মনে করেন—'সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়।' যদিও তাঁহার আন্তরিক বাসনা—'চিরশান্তি, নহে সখে সমর দুর্বার।' তাই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ঐক্যবিধানপূর্বক নব্য ভারতগঠন এবং ধর্মসংস্থাপন-প্রয়াস এবং সেইসঙ্গে সর্বভূতহিত ও নিষ্কামধর্ম সাধনা নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণেরও আদর্শ ছিল,—

এক ধর্ম এক জাতি এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম, লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ম্, করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্মরাজ্য, 'মহাভারত' স্থাপিত। (ঐ)

নবীনচন্দ্রের এই 'মহাভারত-স্থাপক' ও 'ধর্মসংস্কারক' শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তির কারণ ঠিক বোঝা যায় না। কেননা, বঙ্কিম নিজেও তো পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই শ্রীকৃষ্ণকে 'সাম্রাজ্যের গঠন-বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য' বলিয়াছেন। এই সাম্রাজ্যও কি সেই একীভূত সাম্রাজ্য বা ধর্মরাজ্য নহে? পরে 'কৃষ্ণচরিত্রে' অবশ্য বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ্‌রূপে দেখেন নাই; দেখিয়াছেন সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ-সংস্পর্শশূন্য, আদর্শ মানব-চরিত্ররূপে। তিনি বলিয়াছেন—"ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। ......তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি—ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্মপ্রচার।"[২১]

নবীনচন্দ্রও তো শ্রীকৃষ্ণের এই দুই কীর্তির উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন; চির-প্রচলিত 'ইন্দ্রযজ্ঞ'-বিরোধিতা ভিন্ন অন্য কোন ধর্মসংস্কারের উল্লেখও তিনি করেন নাই। কৃষ্ণের 'ধর্মপ্রচার' অর্থে বঙ্কিম গীতার বাণী প্রচার বুঝিয়াছেন। নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের মুখে যে যুক্তিবাদী সংস্কারবিমুক্ত জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-প্রধান ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও ভিত্তি 'গীতা'। সুতরাং এখানে কৃষ্ণের Mission বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ধারণা বস্তুতঃ অভিন্ন; যদিও বঙ্কিমের কৃষ্ণ প্রধানতঃ ঐশ্বর্যময় intellectual, নবীনের কৃষ্ণ লীলাময় মাধুর্যময় emotional. কৃষ্ণচরিত্র-উপলব্ধিতে বঙ্কিম যুক্তির পথে আর নবীন ভক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশক্তির বিরোধী ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়-দমনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা অনার্যের সহিত মিলিত হইয়াছিল—নবীনচন্দ্রের এই প্রতিপাদ্য ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে সত্য নহে বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন। নবীনচন্দ্র পৌরাণিক উদাহরণসহ উহার যে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার ঐতিহাসিক ভিত্তি হয়ত খুব সুদৃঢ় নয়, কিন্তু প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ যে উগ্র ছিল, তাহা ইতিহাসেও স্বীকৃত হইয়াছে—"We may therefore suggest that revolts against the Brahman doctrines date from a much more remote age than the time of Buddha and Mahavira. ...Not only these two religious teachers but also a number of others, of whom we know little or nothing more than a name, preached in a spirit of most conscientious and determined contradiction against the sanctity of vedic lore, the sacrificial prescriptions of the ritualists, and the claims of spiritual superiority asserted by the Brahmans."[8] সেই সংঘর্ষের প্রকৃতি পরে রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দরভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।—"একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগ্‌লাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন।......এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে

অপরা বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।"[৩০] ক্ষত্রিয়দের এই সংস্কারমুক্ত উদার জীবনদর্শনের সহিত প্রাধান্যগর্বী ব্রাহ্মণদের সংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রদৃষ্টির ইঙ্গিতময় সংঘাত-চিত্র দ্বারা 'রৈবতকের' সূচনা করিয়া নবীনচন্দ্র উক্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকেই স্ফুটতর করিয়াছেন। কাজেই কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, নীতি ও আদর্শগত; কৃষ্ণ ও দুর্বাসা দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিনিধি, যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির বিরোধ। উহা প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘাত, লোকধর্মের সহিত সত্যধর্মের সংঘাত; মহাভারতের যুগে যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশেও (রাধাকান্তগোষ্ঠীর সহিত রামমোহন গোষ্ঠীর সংঘাতে) তেমনি উহা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবে সত্য।

এতদ্‌ভিন্ন কেবল কুরুপাণ্ডবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে বিরোধ নয়, আর্য-অনার্যের ঐতিহাসিক সংঘর্ষও নবীনচন্দ্রের কাব্যকাহিনীর অন্যতম ভিত্তি। নবীনচন্দ্র নাগজাতিকে অনার্যের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইতিহাসও বলে—"Asuras, Daityas, Dānavas and Nāgas denoted peoples of different cultures in various stages of civilization ranging from the rude, aboriginal, uncivilized tribes to the semi-civilized races, offering strong resistance to the spread of Aryan Culture.......The Nāgas appear to be partially civilied people."[৩১] নবীনচন্দ্র উক্ত বিরোধের যৌক্তিকতাও ব্যক্ত করিয়াছেন—

একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী ভিক্ষা ব্যবসায়ী, (রৈবতক—৩য়)

তাহাদের বিরুদ্ধে অনার্যদের ক্ষোভ থাকিবেই। কিন্তু এই বিরোধের সমাধান বিদ্বেষ-বিগ্রহের মধ্য দিয়া নয়, প্রেম ও শান্তির মধ্য দিয়াই সেযুগে সম্ভব হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ব্যাসের মুখে এই সত্যোপলব্ধির আভাস পাই—

যেইরূপে আর্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য দুর্বলে,

সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
একদিন। বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি কিম্বা হে কংসারি! নিয়ম ইহার!
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায় রাজ্য রাজত্ব নীতির। (রৈবতক, ৩য়)

কৃষ্ণ তাই প্রেমের দ্বারাই বিরোধের সমন্বয় করিলেন—

নিবি নাগ-যজ্ঞানল, কৃষ্ণপ্রেমে চারিযুগে
হল আর্য-অনার্যের পূর্ণ সম্মিলন। (প্রভাস, ১৩শ)

এই মিলনের বাধা ছিল কোথায় তাহা অনার্য বাসুকিই বলিয়াছে—

যেই নীতিচক্রে
হতেছে অনার্য জাতি এত নিষ্পেষিত,
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ; (রৈবতক, ৪র্থ)

সুতরাং প্রেমের পথে আর্য-অনার্য সম্মিলনের দ্বারা 'মহাভারত' স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ঐ আর্য বিধি-বিধানের কঠোর রক্ষক (custodian) ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনা অসত্য বা সঙ্গতিহীন মনে হয় না। তেমনি ক্ষত্রিয়-দমনের উদ্দেশ্যে অনার্যের সহিত ব্রাহ্মণের (বাসুকি-দুর্বাসার) মিলন ও ষড়যন্ত্র ব্যাপারে ইতিহাসের সমর্থন নাও থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রতিপাদ্যকে (আর্য-অনার্য সংঘাত ও সম্মিলনকে) বিচিত্র জটিলতার মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া সুষ্ঠু পরিণতি দানের জন্য উহার অবতারণা নবীন চন্দ্রের কাহিনীগ্রন্থন-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ী'র পরিকল্পনা, কাহিনীগঠন কৌশল, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে (১৯৫৪ সালে প্রকাশিত) কিছুটা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় সাহিত্যতত্ত্বানুরক্তি ও বিচার-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়; তবু উহাতে দোষোদ্ঘাটনের উদ্যম যত অধিক, গুণগ্রাহিতার আগ্রহ সেই তুলনায় অতি সামান্যই বলিতে হইবে। কৌতূহলী পাঠক নবীনচন্দ্রের পুরাণ-ইতিহাসগত ত্রুটি-বিচ্যুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য ১৮৯৭ সালে

প্রকাশিত বীরেশ্বর পাঁড়ে রচিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' গ্রন্থটি, এবং কাব্যউপস্থাপনা ও গঠনক্রটির বিশ্লেষণের জন্ত তারাপদবাবুর উক্ত গ্রন্থটি দেখিতে পারেন; যদিও তাহা দ্বারা নবীনচন্দ্রের কবিমানসের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। নবীনচন্দ্রের কাব্যাদর্শহীনতা, মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, অসংযত প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি ক্রটি এত সুবিদিত ও স্বীকৃত যে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিরর্থক মনে হয়। কাব্যালোচনাকালে আমরা তারাপদবাবুর কিছু কিছু মন্তব্য বিচার করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের গ্রন্থটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রটিপ্রদর্শনের উদ্যমশীল প্রয়াস মাত্র, তাহাও পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের পারম্পর্য এবং সঙ্গতি-সম্পর্কিত, সাহিত্যরস-ঘটিত নহে। তাঁহার আপত্তিসমূহ খণ্ডনের চেষ্টা এখানে নিরর্থক; কেন না, আমরা জানি—নবীনচন্দ্র নূতন যুগদৃষ্টির আলোকে মহাভারতের যে নূতন তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত ক্রটি তাহাকে বিশেষ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটি আপত্তির কথাই শুধু বলিতেছি। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, —'প্রভাসে' যে জরৎকারু রূপের আগুনে শ্রেষ্ঠ যাদবদের দগ্ধ করিতেছে, বস্তুতঃ তখন তাহার সম্পূর্ণ বৃদ্ধাবস্থা। কৌতূহলের বিষয় এই যে, এইরূপ আপত্তি হোমারের Iliad-এর নায়িকা অতুলনীয়া রূপসী হেলেন-সম্পর্কেও একদা উঠিয়াছিল—"Pierre Bayle......Calculated that (on the assumption all the legends about Helen of Troy were true) she must have been at least sixty, and probably 100, at the time of Trojan War—scarcely worth fighting for."[২৮] এই ধরণের ক্রটিতে হোমারের মহাকাব্য কলুষিত হইয়াছে—একথা কেহই বলেন না। নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রে পাঁড়ে মহাশয়ের আপত্তির উত্তরও অনুরূপ। পূর্বেই বলিয়াছি—মধুসূদনের কাব্যশিল্প ও উপস্থাপনারীতি এবং ক্লাসিক কাব্যের রূপাদর্শ কঠোরভাবে আঁকড়াইয়া থাকিলে নবীনচন্দ্রের ভিন্নপ্রকৃতির কবি-প্রতিভা ও কাব্যসৃষ্টির স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধ হইবে না।

২

আখ্যায়িকা-কাব্যে পরিজ্ঞাত কোন কাহিনীকে যথাযথভাবেই অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু সেই মূল কাহিনীর সহিত সামান্ত সামান্ত ঘটনার অর্থময় সংযোগসাধন কিম্বা নূতন সৃষ্ট উপঘটনার গ্রন্থনেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

'মহাভারতে' ঋষি দুর্বাসার ভূমিকা কেবলমাত্র 'বনপর্বে' দুর্যোধনের প্ররোচনায় তাঁহার সশিষ্য যুধিষ্ঠিরের আতিথ্যগ্রহণে, বাসুকি এবং জরৎকারু তো মহাভারতে আরও অস্পষ্ট। নবীনচন্দ্র সুকৌশলে ইহাদিগকে তাঁহার কাহিনী-মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জটিলতার ঊর্ণজাল রচনা করিলেন, নতুবা আবর্তহীন যুদ্ধকাহিনী একান্তই বিবর্ণ মনে হইত। কেননা, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মত 'বীররসে ভাসি মহাগীত' বা Heroic Poetryর পরিকল্পনা নবীনচন্দ্র করেন নাই। মহাভারতের মূলঘটনার রূপকাশ্রয়ে এযুগের বিভিন্ন জীবন-সমস্যা ও আদর্শ-সংঘাতকেই তিনি প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন, তাই যুগ-প্রবৃত্তির অনুকূল ঔপন্যাসিক-জটিলতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার কাহিনী-গ্রন্থনে আসিয়া পড়িয়াছে। 'রৈবতকের' প্রথম সর্গেই নিসর্গসৌন্দর্যে তন্ময় কৃষ্ণ কর্তৃক কোপনস্বভাব দুর্বাসার অপমান-ঘটনা সৃষ্টিদ্বারা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দুর্বাসার অভিশাপও কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের অভিশাপের ন্যায় কবির মৌলিক কল্পনা। 'যাদব-কৌরবকুল হইবে বিনাশ'—দুর্বাসার এই অভিশাপেরই চরম পরিণতি কাব্যে দেখাইয়া নবীনচন্দ্র যেন দুর্বাসাকে শক্তিমান প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত করিলেন। 'আদিপর্বে' বর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণের গাভী-অপহরণকারী দস্যুরূপে নাগরাজ চন্দ্রচূড়কে উপস্থিত করিয়া কবি আর্যজাতির বিরুদ্ধে পরাভূত অনার্যজাতির ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিলেন, এবং তাহারই কন্যা শৈলজাকে (কবিকল্পনার সৃষ্টি) নিযুক্ত করা হইল পিতৃহন্তা অর্জুনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য। কংস-বধে বাসুকির সহায়তা-ঘটনা সৃষ্টির প্রয়োজন হইল বাসুকির রাজ্যবাসনায় ইন্ধন যোগাইতে। জরৎকারু মুনির সহিত বাসুকি-ভগ্নী জরৎকারুর পরিণয় 'আদি-পর্বের' অতি ক্ষুদ্র এক ঘটনা, তাহার উদ্দেশ্যও ভিন্ন ; কিন্তু এখানে জরৎকারু মুনি ও দুর্বাসাকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-অনার্য মিলন এবং ষড়যন্ত্রের প্রয়োজনে উক্ত ঘটনাকে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কবি-কল্পিত প্রেমবঞ্চিতা জরৎকারুর কৃষ্ণপ্রেম এবং বাসুকির ভদ্রাসক্তি আর্য-অনার্য সংঘর্ষে জটিল নাটকীয় আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে, দুর্বাসা তাহাকে নিজ প্রয়োজনে আরও সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। মূল মহাভারতে সুভদ্রা-হরণ ঘটনায় বলরাম কর্তৃক সুভদ্রাকে দুর্যোধনের সহিত বিবাহ দিবার উদ্যোগের কথা নাই, নবীনচন্দ্র উহা কাশীরাম দাস হইতে গ্রহণ করিয়া সম্ভাব্য যাদব-

পাণ্ডব বিরোধের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন। আবার 'আদিপর্বের' দুর্বাসা-কুন্তী প্রসঙ্গের ক্ষীণসূত্র ধরিয়া কর্ণের রহস্যাবৃত জন্মকথা প্রকাশ পাইল দুর্বাসা-কর্তৃক কর্ণকে অভিমন্যুবধে প্ররোচিত করার জন্য। তেমনি 'মুষলপর্বে' যদুকুলের আত্মহনন-ঘটনার সূত্রে আসবোন্মত্ত যাদবদিগকে প্রলুব্ধ করা হইল জরৎকারুর রূপমোহে, এই মৌলিক কল্পনা দ্বারা তাহাদের পতনের একটা সঙ্গত কারণও নির্দেশিত হইল। আবার 'মুষলপর্বে' বর্ণিত কৃষ্ণের হত্যাকারী জরাব্যাধকে রূপান্তরিত করা হইল জরৎকারুতে। দেখা যায়—মহাভারতের বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে নূতন আলোকে ও অর্থসংগতিতে উজ্জ্বল করিয়া মূল ঘটনার সহিত অপূর্ব কৌশলে নবীনচন্দ্র যুক্ত করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনা অর্থাৎ—আর্যে-অনার্যে, ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ে-ব্রাহ্মণে সংঘর্ষ ও তদ্দরুণ সর্বব্যাপী সামাজিক বিপর্যয়কালে কৃষ্ণের মহানেতৃত্ব ও সমন্বয়-সাধনা দ্বারা 'ধর্মরাজ্য মহাভারত' সৃষ্টি—গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেবলমাত্র কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ-ঘটনার বিবৃতিতে এবং 'গীতা'-ব্যাখ্যায় তাহা সম্ভব হইত না। এযুগের প্রত্যেক কবিই পুরাণ-কাহিনীর প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাতে নূতন রস, নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা কবিমানস ও যুগমানসের নিগূঢ় অভিপ্রায় চরিতার্থ হইয়া থাকে। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, এমন কি পরে রবীন্দ্রনাথও তাহা করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র বিরাট মহাভারতের আনুপূর্বিক ঘটনা অবলম্বন করেন নাই। কেবলমাত্র আদিপর্বের অন্তর্গত সুভদ্রাহরণ-পর্বাধ্যায়ের 'সুভদ্রাহরণ' ঘটনা, দ্রোণপর্বের অন্তর্গত অভিমন্যুবধ-পর্বাধ্যায়ের 'অভিমন্যুবধ' ঘটনা, এবং মৌষলপর্বের সমগ্র 'যদুবংশধ্বংস' ঘটনা—বাছিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও কাল্পনিক ক্ষুদ্র ঘটনা যুক্ত করিয়া তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থে মুখ্যতঃ কাব্য-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আদি-মধ্য-অন্ত্যলীলা পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। তথাপি নবীনচন্দ্র উক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকয়টিকে পৌর্বাপর্যসূত্রে বিধৃত করিবার জন্য 'রৈবতকে'র তৃতীয় সর্গে অর্জুনের মুখে বনবাসান্তে পাণ্ডবগণের পুনর্রাজ্যলাভ পর্যন্ত ঘটনা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। (মধুসূদন যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতার মুখে সুকৌশলে সীতাহরণের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া রামায়ণ কাহিনীর সূত্র ধরিয়া দিয়াছেন) অন্যদিকে 'মহাভারতে' পূর্ণযৌবন কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর উপলক্ষ্যে,

কিন্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় আস্থাবান নবীনচন্দ্র পূর্ণাবয়ব কৃষ্ণচরিত্র-গঠনের উদ্দেশ্যে 'ভাগবতে' বর্ণিত বাল্য-কৈশোরলীলা, কংসবধ, রৈবতকে দুর্গনির্মাণ প্রভৃতি ঘটনা 'রৈবতকে'র সপ্তম সর্গে কৃষ্ণের মুখে স্মৃতিরোমন্থনসূত্রে বিবৃত করিয়াছেন। এই পূর্বসূত্রদ্বয় কাব্যে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সুন্দর পটভূমি রচনা করিয়াছে। কবি-কল্পিত শৈল-কাহিনীর সংযোগের জন্য অর্জুনের অজ্ঞাত-বাসের সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি কবি-কল্পিত বাসুকী ও জরৎকারুর ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী সংযুক্তির জন্য কৃষ্ণের 'মহাভারত'-পূর্বজীবনের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখও অপরিহার্য।

'রৈবতকে' সুভদ্রা-হরণ ঘটনাটিকে মুখ্যভাবে গ্রহণের যৌক্তিকতা কেহ কেহ[২] এই কারণে স্বীকার করেন নাই যে, যাদব ও পাণ্ডবের মধ্যে সম্প্রীতিই বিদ্যমান ছিল; সুতরাং আর্য-অনার্য, কুরু-পাণ্ডব, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়—কোন সংঘর্ষের সম্মুখীন হইবার জন্যই তাহাদের মিলন-সম্বন্ধের উপর নূতন করিয়া গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—যাদব-পাণ্ডব সম্পর্কও যে সুভদ্রাহরণকে কেন্দ্র করিয়াই কিছুটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ব্যাস-মহাভারতে উক্ত আছে। বলরাম দুর্যোধনকেই সুভদ্রার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে রৈবতকে আহ্বান করিয়াছিলেন,—এই তথ্যটুকু নবীনচন্দ্র কাশীদাসী মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এই ঘটনাসূত্রে দুর্যোধন এবং বলরামের যোগাযোগ-সাধনে দুর্বাসার দৌত্যও কবি-কল্পিত) কৃষ্ণের মানসশিষ্যা সুভদ্রার সহিত অর্জুনের পরিণয় ছিল কৃষ্ণেরও অভিপ্রেত, কেননা তাঁহার ধর্মরাজ্য-স্থাপন আদর্শের বহিরঙ্গ শক্তি অর্জুন, অন্তরঙ্গ শক্তি সুভদ্রা; তাই বীর্যবত্তার সহিত হৃদয়বত্তার মিলন ছিল প্রার্থিত। সুতরাং নবোদ্ভূত সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ এবং যাদবগণের সহিত সাময়িক সংঘর্ষ। এই ঘটনা দুর্বাসাকে তাহার ক্ষত্রিয়-বৈরিতা সাধনের বিচিত্র সুযোগ দিয়াছে, দুর্যোধনের এই অপমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইন্ধন যোগাইয়াছে। সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রণয়-পরিণয় যেমন ভদ্রাসক্ত বাসুকিকে প্রতিশোধগ্রহণে আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তেমনি কিশোরী শৈলের অর্জুনের প্রতি উদগত প্রেমকেও ভিন্নমুখী করিয়া দিয়া তাহাকে কৃষ্ণ-সুভদ্রা-অর্জুনের আদর্শানুগামিনী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং সমস্ত জটিলতার উৎস-ঘটনারূপে সুভদ্রা-হরণকে কাব্যের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করা অযৌক্তিক হইয়াছে মনে হয় না। সুভদ্রা-হরণ যে

শুধুমাত্র অর্জুনের রৈবতক-প্রবাসের মুখ্য ঘটনা নয়, সমগ্র মহাভারতেরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন।[৩০]

ব্যাস-মহাভারতে দেখি—সুভদ্রার রূপমুগ্ধ অর্জুনই বিবাহ প্রস্তাব করেন এবং কৃষ্ণ তাহাতে সম্মতি দেন। কিন্তু কাশীদাসী-মহাভারতে সুভদ্রাই প্রধানতঃ অর্জুনের প্রেমে ব্যাকুলা হন এবং সত্যভামার সহায়তায় পরিণয়-উদ্যোগ হয়। নবীনচন্দ্র মূলতঃ কাশীদাসকে অবলম্বন করিয়া পারস্পরিক আকর্ষণ দেখাইয়াছেন, এবং কাশীদাসী-আদর্শেই সুভদ্রা-অর্জুনের প্রেম-ব্যাকুলতা বিবৃত করিতে গিয়া একাধিক সর্গে (৫ম, ৬ষ্ঠ) যে রোমান্স-বিলাসের বাহুল্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন তাহা যেমন কাহিনীর ভারসাম্য বিচলিত করিয়াছে, তেমনি কাব্যবিষয়ের গুরুত্বও লাঘব করিয়াছে। একটিমাত্র সর্গেই ঐ অনুরাগচিত্র সংযম ও নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইলে শোভন হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়, একাদশ সর্গে এই সুভদ্রা-অর্জুন পরিণয় প্রস্তাব উপলক্ষে কৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার কপট অভিমানের তরল রঙ্গরসপ্রধান চিত্র মূল কাহিনীর কোন প্রয়োজন সাধন করে নাই, বরং উহা পাঠকের মনে বিরক্তিই সঞ্চার করিয়াছে। তেমনি পঞ্চদশ সর্গেও ঐ সুভদ্রা-প্রণয় প্রস্তাব উপলক্ষে রুক্মিণী ও সত্যভামার পতিপরায়ণতা প্রকাশকালীন রসকৌতুক নিরর্থক, অবান্তর। 'ভাগবতে' লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য-ধর্ম পালনের উল্লেখ আছে।[৩১] মনে হয়, নবীনচন্দ্র ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণমানব, মহত্তর মানবপ্রেমের সহিত গার্হস্থ্যপ্রেমও যে তাঁহার সাধ্যবস্তু, তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। (বঙ্কিমের মতেও 'কৃষ্ণ গৃহী, সংসারী, ...তপস্বী ও ধর্মপ্রচারক—সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।') 'রৈবতক'এর কৃষ্ণের জীবনে রুক্মিণী ও সত্যভামা যে উপলব্ধি জাগাইয়াছে তাহা এই—

জীবনে যে আছে মিশি
অর্ধ দিবা অর্ধ নিশি,
অর্ধেক আতপ, অর্ধ জ্যোৎস্না আবার,
মানব জীবন,—চিত্র শান্তি পিপাসার। (রৈবতক—১১শ)

গৃহী কৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে রুক্মিণী ও সত্যভামা যদি কাব্যে কোন সামান্য প্রয়োজনও সাধন করিয়া থাকে তবে তাহা এই যে—উভয়েই বাহ্যিক প্রকৃতি-বৈষম্য এবং আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণের নিষ্কাম-সকাম প্রেমধর্মের

সমন্বিত রূপটি ব্যক্ত করিয়াছে। সরলা পতিগতপ্রাণা সূর্যমুখীসদৃশা রুক্মিণী এবং রূপচঞ্চলা কপট অভিমান-কুপিতা সত্যভামার চরিত্রের ইঙ্গিতময় বর্ণনা কবি কৃষ্ণের মুখে দিয়াছেন—

একদিকে শান্তি, দ্বিতীয়ে সমর!
একদিকে বারি অন্যে বৈশ্বানর!
একদিকে কুলুকুলু নির্ঝরিণী!
অন্যদিকে বিধূনিত তরঙ্গিণী!

* * *

এক বিনয়ের কুসুমহার!
অন্য অভিমান হিমাদ্রিভার! (রৈবতক—১৫শ)

অথচ উভয়েরই বিপরীত প্রকৃতি এক অনাবিল পতিপ্রেমে যুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলেন—

রুক্মিণী ও সত্যভামা নিষ্কাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধারায়,—
পবিত্র যমুনাগঙ্গা,— বহে এক সিন্ধুমুখে,
আমি সেই পুণ্য পারাবার। (রৈবতক—১৫শ)

পূর্বেই বলিয়াছি,—কৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর এবং অর্জুনের প্রতি শৈল-র প্রণয়কাহিনী নবীনচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি। অষ্টম সর্গে স্মৃতিচারণসূত্রে জরৎকারুর কৃষ্ণ-প্রণয়ার্তির আবেগবিহ্বল বর্ণনা ভাষাসৌন্দর্যে ব্যঞ্জনাময়তায় ও গীতিরসে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে, এসব ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের কল্পনা মধুর স্বাচ্ছন্দ্যে বিলসিত। পরিপূর্ণ-যৌবনা জরৎকারুর রূপের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটুকু রবীন্দ্রযুগের যে-কোন প্রখ্যাত কবির পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় মনে হইবে,—

কি গঠন ক্ষীণ কটি! হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায় আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস! (রৈবতক—৮ম)

এই প্রেমবিদীর্ণা নারীর গভীর বেদনা-ক্ষত উদ্ঘাটনে, এবং অষ্টাদশ সর্গে দুর্বাসার সহিত তাহার ব্যর্থ-পরিণয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণে নবীনচন্দ্র ঔপন্যাসিক মনোবিকলন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, ক্লাসিক মহাকাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠামোয় উহা সঙ্গত মনে করা হয় না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্য ক্লাসিক-রীতির

চাইতেও শিথিলবদ্ধ রোমাণ্টিক রীতির অধিক অনুবর্তী,—একথা আগে বলা হইয়াছে। উক্ত প্রণয়-কথা আপাতঃদৃষ্টিতে কৃষ্ণচরিত্রের গৌরববর্ধন না করিলেও আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে আর একটি জটিল গ্রন্থিরূপে মূল কাহিনীর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। তবু মনে হয়—তিনটি কাব্যগ্রন্থেই এই প্রণয়বঞ্চিতা রমণীর মর্মভেদী হাহাকার আরও পরিমিত পরিসরে সুসংযতভাবে প্রকাশিত হইলেই মনোজ্ঞ হইত, যেহেতু এই চরিত্রটিই কাব্যে সর্বাধিক জীবন-রস সঞ্চার করিয়াছে। আবার অন্যদিকে নবম ও উনবিংশ সর্গে বিবৃত অর্জুনের প্রতি শৈলের প্রেম প্রথম হইতেই ছদ্মবেশের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ও অনুচ্ছ্বসিত বলিয়া উহার প্রকাশ মোটামুটি সীমিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে রোমান্সের প্রবল আবেগ না থাকায় নবীনচন্দ্রকে সংযত হইতে হইয়াছে।

মনে হয়, এই প্রণয়কাহিনীসমূহ অবতারণার পশ্চাতে নবীনচন্দ্রের একটি দৃঢ় বিশ্বাস কাজ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি—এই কাব্যত্রয়ী রচনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা রোমাণ্টিক উপন্যাসের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবীনের কাব্যপ্রয়াস কাব্য এবং উপন্যাসের সমন্বিত রূপ। উহা Heroic Poetry নয়, ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা ও আদর্শের সংঘর্ষ-কাহিনী; ইহাতে প্রকাশ্য যুদ্ধের চাইতেও অন্তর্যুদ্ধের গুরুত্ব অধিক। নারী-প্রেম সেই সংগ্রামে শক্তি যোগাইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রেমের ধারণা ও প্রকাশরীতি নবীনচন্দ্র প্রাচ্য-আদর্শের অনুকূল নহে বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার মতে উহা 'ইংরাজী পীরিতের ছায়া।'[৩২] তাই নবীনচন্দ্র বুঝি তাঁহার কাব্যে প্রেমের বিচিত্র আদর্শ-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তিনটি প্রণয়-বৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন। জরৎকারুর প্রেমের প্রকৃতি যেন hectic ও sensual. সুভদ্রার প্রণয় didactic ও etherial. আর শৈলের প্রণয় platonic ও devotional। প্রথমটিতে ইন্দ্রিয়তাড়নায় আত্মক্ষয়, দ্বিতীয়টিতে আদর্শনিষ্ঠার ফলে আত্মজয়, তৃতীয়টিতে ভক্তিসাধনার পথে আত্মবিলয়। এই আদর্শ উদ্দিষ্ট চরিত্রসমূহের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা ভিন্ন কথা, কিন্তু ভারতীয় জীবনসাধনায় প্রেমের উর্ধ্বায়ন (sublimation) সম্ভব—এই বিশ্বাস লইয়াই নবীনচন্দ্র তিনটি বিভিন্ন প্রেম-আদর্শ তাঁহার 'নব-মহাভারত' পরিকল্পনার বিশিষ্ট অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার—'কামপ্রেম দোহাকার বহুত

অন্তর', এই ধারণা বৈষ্ণবীয়। কামের প্রেমে উন্নয়ন কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাসক বৈষ্ণবের প্রিয় সাধনা। এই সাধনার ইতিহাসই বৈষ্ণবভাবপ্রবণ নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের কয়েকটি নারী-চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে—এই অনুমানও একান্ত স্বাভাবিক।

প্রণয়কাহিনী কয়টির আলোচনাপ্রসঙ্গে 'রৈবতক'-এর কয়েকটি সর্গের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—উহাদের বক্তব্য অনেক সংক্ষেপে কাব্য-সৌন্দর্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বলা চলিত, কিন্তু নবীনচন্দ্রের মধ্যে সেই পরিমিতি-বোধের অভাব ছিল। যাহা হোক, 'রৈবতক'-এর কতিপয় সর্গের কাব্যোপ-যোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। তিনটি কাব্যে প্রসারিত বিশাল কাহিনী-পরিকল্পনার প্রথম কাব্য বলিয়া 'রৈবতক'-এ সব কয়টি সমস্যারই—ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ, আর্য-অনার্যে বিরোধ—স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে এবং সেই সমস্যার সহিত জড়িত চরিত্রসমূহের প্রকৃতি ও ক্রিয়া-কলাপের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম সর্গের প্রভাত বর্ণনার শান্তোজ্জ্বল উদার মহিমা সমগ্র কাব্যের কল্পনা-সমুন্নতিই সূচিত করে, আর ঐ পরিবেশে নিসর্গরসমগ্ন, বিশ্বরহস্যে অভিভূত, মানবগৌরবে উদ্দীপ্ত নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করিয়া কবি কাব্যের সুর যেন উচ্চগ্রামেই বাঁধিয়া দিলেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে
সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক করি অভিনয়,
দেখ পার্থ, সিন্ধুগর্ভে উঠিছে কেমন।

* * *

নীলসিন্ধু, শ্বেত বেলা, ধূসর আকাশ!
দেখ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ কেমন
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে—বিরাট মূরতি!
সত্ত্ব ব্যোম, রজঃ বেলা, তমঃ পারাবার!

* * *

হায় অন্ধ উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,

সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস!

লক্ষণীয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণের নিসর্গ-রসানুভূতি মৌলিক ও আন্তরিক, ঋষিদের প্রকৃতি-প্রশস্তি গতানুগতিক। আর্য-অনার্যের সংঘাত ও মিলন কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য হইলেও প্রথম সর্গেই কৃষ্ণ ও দুর্বাসার মধ্যে অর্থাৎ নব-মানবধর্ম ও প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে বিরোধ উপস্থাপনার তাৎপর্য এই যে, নায়ক শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ও কর্ম অতঃপর কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে তাহার ইঙ্গিত ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় সর্গে ব্যাসাশ্রমের স্নিগ্ধ গম্ভীর আরণ্য-পরিবেশ সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পবিত্র আশ্রম! দেখ পবিত্র শিখর
রৈবতক স্থিরভাবে,
সুনীল আকাশপটে
স্থাপিয়া শ্যামল বপু,—শান্ত প্রীতিকর,—
সমাধিস্থ প্রকৃতির মহা যোগিবর।

*　　　*　　　*

ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব।
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস।
সংসার-সমুদ্রে তীর; আকাঙ্ক্ষা লহরী—
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।

এখানে সুভদ্রা সম্পর্কে অর্জুনের মনে প্রীতি, সম্ভ্রম ও আগ্রহ সঞ্চার করিয়া এই কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা সুভদ্রা-হরণের 'ভিত্তি' রচনা করা হইয়াছে। বক্তব্য সামান্যই, তবু অযথা বর্ণনাবাহুল্য দ্বারা কবি পূর্বসৃষ্ট পরিবেশ কিছুটা নষ্ট করিয়াছেন। এইজন্যই বুঝি বঙ্কিমচন্দ্র এই সর্গটি সংক্ষিপ্ত করিতে বলিয়াছিলেন।[৩৩]

তৃতীয় সর্গে বিজেতা আর্যজাতির বিরুদ্ধে বিজিত অনার্যজাতির ক্ষোভের সঙ্গত কারণ তীব্র শ্লেষপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে চন্দ্রচূড়ের মুখে—

একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী ভিক্ষাব্যবসায়ী;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—

সাধু তারা! আর যেই জাতি বিদলিত,
আপনার রাজ্যে চাহে মুষ্টিভিক্ষা যদি,—
তস্কর তাহারা। এই আর্য-ধর্মনীতি
অসভ্য অনার্য জাতি বুঝিবে কেমনে।

পূর্বে (২৯ পৃঃ দ্রঃ) বলিয়াছি, উদ্ধৃত অংশে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর পরবশ্যতার বেদনাই যেন অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানেই আবার মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডব-বিরোধের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তৎসূত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংঘর্ষ-প্রস্তুতির আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের 'এক মহারাজ্য…এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন' সংকল্পগ্রহণ; তাঁহার সহায়—'ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জুনের,' অর্থাৎ নৈতিক (Moral—কৃষ্ণ), আধ্যাত্মিক (Intellectual—ব্যাস) ও শারীরিক (Physical—অর্জুন) শক্তির মিলন। উক্ত তৃতীয় সর্গের মত চতুর্থ সর্গের গুরুত্বও কম নয়। এখানে শক্তিমান ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ (দুর্বাসা) তাহার মর্যাদা ও আধিপত্য-লোপের আশঙ্কা লইয়া, এবং অনার্য (বাসুকি) তাহার পরাধীনতার ক্ষোভ লইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া, 'মহাসন্ধি' করিয়াছে।

এই সন্ধিবলে
আর্য-অনার্যের ধর্ম জাতি উভয়ের
পবিত্র প্রণয়সূত্রে করিয়া বন্ধন,
নাস্তিক এ নবধর্ম নাশিয়া অঙ্কুরে,
নাশিয়া ক্ষত্রিয় জাতি, করহ স্থাপন
অনার্যের মহারাজ্য।

এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিলনকে আরও ঘনীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই পরে অষ্টম সর্গে বাসুকি-ভগ্নী জরৎকারুর সহিত দুর্বাসার পরিণয়-আয়োজন। উক্ত কুটিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী এক ভয়ঙ্কর পরিবেশও কবি চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে রচনা করিয়াছেন। রৈবতকের—

পূরব-উত্তর প্রান্তে, শিলাকক্ষে এক
নিবিড় নিশীথে, ঘন নিবিড় কাননে,
বসিয়া দুর্বাসা ঋষি ধ্যানে নিমজ্জিত।

অতি দুরারোহ কক্ষ ; স্বভাব-সৃজিত
বিশাল প্রস্তরখণ্ডে ; প্রবেশের দ্বার
সংকীর্ণ সঙ্কটময় বিবরের মত।

সপ্তম সর্গ শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্বস্মৃতি' নিঃসন্দেহে রৈবতকের শ্রেষ্ঠ অংশ। প্রকৃতি-বর্ণনার সৌন্দর্যরসে উহা অপূর্ব স্নিগ্ধ।

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন-বিভায়
দিবসান্তে আতপের,—মিশিতেছে ধীরে
সুখ শান্তি ছায়া যেন সন্তাপ-শিখায়।
উঠিছে পূরবে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর, নীলাম্বরে শুক্ল শশধর।

এখানে নবীনচন্দ্রের আদর্শ-মানব শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মহত্ত্ব-লক্ষণ—তাঁহার স্থৈর্য, দূরদৃষ্টি, মনুষ্যত্বনিষ্ঠা, অধ্যাত্ম-চেতনা—সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মহর্ষি গর্গের ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক করিবার যোগ্যতা এবং দিব্য জ্যোতিদর্শনের যোগদৃষ্টি তিনি যেন কৈশোরেই অর্জন করিয়াছিলেন। এই সর্গে নবীনচন্দ্র ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরলীলা বিবৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক অলৌকিকতা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মানবরূপের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাই অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত কিশোর কৃষ্ণ কর্তৃক হত অঘ, বক, প্রলম্ব, পুতনা প্রভৃতি 'হিংসাকারী পশুপক্ষী' ; তৎকর্তৃক দমিত কালীয় নাগ 'অনার্য তস্কর'।

নবম ও দশম সর্গে পিতৃহন্তা অর্জুনকে হত্যা করার জন্য বাসুকি কর্তৃক অর্জুন-সেবায় নিয়োজিতা কিশোরী শৈল অর্জুনের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রেম ও শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হইয়া কুমারী-ব্রতে অর্জুন-প্রেয়সী সুভদ্রাকে দস্যুরূপী বাসুকির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল। অনুরূপ এক উৎসবের উল্লেখমাত্র মহাভারতে আছে, তৎসঙ্গে সুভদ্রা-শৈল-বাসুকির যোগসাধন কবির মৌলিক কল্পনা। কিন্তু দশম সর্গ পর্যন্ত এই উৎসবলীলার বর্ণনা অহেতুকভাবে বিস্তৃত করিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার অসংযত কল্পনাবিলাসেরই পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণ 'এক ধর্মরাজ্য' গঠনের যে সংকল্পমাত্র করিয়াছিলেন, দ্বাদশ সর্গে ('সোহং') উহা কর্মে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। এখানে রাষ্ট্রনায়ক এবং ভাবনায়ক শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ই পরিস্ফুট। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

রাজ্যসমূহ ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধায়োজনে প্রমত্ত, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতি ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ গভীর উদ্বেগে অস্থির—

এ রাষ্ট্রবিপ্লব, এই ঘোর নির্যাতন
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দশা,
অসাধুর আধিপত্য, ধর্মের বিলোপ,—
সহিব কেমনে শৈলপ্রতিমূর্তি মত ?

এখানে সঙ্গতভাবেই গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের আন্তর-স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া নবীনচন্দ্র কুরুক্ষেত্রে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভিত্তিরচনা করিলেন। এই সূত্রেই সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-শাসিত ধর্মের সহিত কৃষ্ণের নব মানবধর্মের সংঘাত যে কত গভীরতর হইয়া উঠিতেছে তাহা ব্যাসের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে—

শঙ্কিত কুরঙ্গমত গ্রীবা ঊর্ধ্ব করি
গৃহবাসী বিপ্রগণ, বনবাসী ঋষি,
ঊর্ধ্ব কর্ণে তব কার্য করিছে শ্রবণ,
ঘ্রাণিতেছে অভিসন্ধি ; ভাবিছে বিপ্লব
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্মে, উদ্দেশ্য তোমার,
তুমি এ বিপ্লবকারী।

বিরুদ্ধ পক্ষের এই কঠোর বিরূপ ধারণার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

আমি এ বিপ্লবকারী ! মহর্ষি ! মহর্ষি !
সরল বৈদিক ধর্ম, পূজা প্রকৃতির,
সারল্য সৌন্দর্যমাখা, আর্য শৈশবের,
—সে তরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ,—
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত,

*　　　*　　　*

কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ,—মূরতি প্রীতির,—
করিতেছে চারি খণ্ড,

*　　　*　　　*

নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের

করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা,—
মহর্ষি! বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?

সুতরাং ভাবী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে কেবল রাজনৈতিক নয়, ধর্মযুদ্ধও; জাতিভেদ-হীন মানুষের মধ্যে সত্য সাম্য ও প্রেমধর্মের প্রবর্তনের জন্ম ভিত্তিরচনা, তাহারও আভাস দেওয়া প্রয়োজন। সপ্তদশ সর্গ পূর্বোক্ত দ্বাদশ সর্গেরই পরিপূরক। ভাবী মহাভারতের চিত্র এখানে কল্পনায় উদ্‌ঘাটিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের মাতৃরূপা ভারতের যে চিত্র ভাবনেত্রে নিরীক্ষণ করাইলেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দ কর্তৃক মহেন্দ্রের মাতৃমূর্তি দর্শনের অনুরূপ।

সত্যযুগে রণমূর্তি, ত্রেতায় বিজয়!
দ্বাপরে বল তারিণী এরূপে আত্মঘাতিনী
হইবে কি? মা! আমরা যত কুলাঙ্গার,
বিফলিব দু'যুগের শ্রম কি তোমার?

* * *

পার্থ! জগন্মাতা-রূপ দেখ নেত্র ভরি',—
মহাভারতের চিত্র রাজরাজেশ্বরী।

এই সর্গে সুভদ্রা-অর্জুনের পরিণয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিজ্ঞাপন এবং সুভদ্রা-হরণ প্রস্তাব সমর্থন কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য কিছু নয়।

ত্রয়োদশ সর্গের (দুর্বাসার দৌত্য) যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এইমাত্র যে, এখানে দুর্বাসা বলরামকে দুর্যোধন-সুভদ্রা পরিণয়-প্রস্তাবে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু বলরাম এবং দুর্বাসা উভয় চরিত্রকেই এখানে একান্ত হাস্যকর করিয়া তোলা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র যদি নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ comic element-এর অনুরূপ কিছু এখানে সৃষ্টি করিতে চাহিয়া থাকেন, তবে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ তাঁহার পরিকল্পিত কাব্য বস্তুতঃ যতই শিথিলবন্ধ হোক না কেন, উহার ধারণা (conception) ও কায়াগঠনে (structure) প্রণয়রসের স্থান তবু কিছুটা হইতে পারে, কিন্তু হাস্যরস কখনই নয়। সুতরাং এই দুর্বল রচনাংশ পাঠকের মনে শুধু বিতৃষ্ণাই জাগায়। চতুর্দশ সর্গে (ঊর্ণনাভ) দুর্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্র যে জটিলতার পথে অগ্রসরমান, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় এই, ব্রাহ্মণ-অনার্য-সম্মিলন যে একান্তভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনে, তাহা

চতুর্থ সর্গ এবং এই সর্গে সুস্পষ্ট; হৃদয়ের যোগাযোগ বা মহত্তর আদর্শের প্রণোদনা তাহাতে নাই। শুধু জাতিধর্মে নয়, স্বভাবধর্মেও দুর্বাসা এবং বাসুকির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দুরতিক্রমণীয়। বাসুকির প্রতি দুর্বাসার ঘৃণা, দুর্বাসার প্রতি বাসুকির অশ্রদ্ধা প্রবল। ক্ষণে ক্ষণে বাসুকির বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ ঐ মিলনের ব্যর্থতাই সূচিত করে।

ষোড়শ সর্গ (রাখিবন্ধন) বাহুল্যমাত্র। সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রস্তাবিত পরিণয় যে মানবমঙ্গলের মহৎ আদর্শপ্রণোদিত, তাহা 'হরণ'-আয়োজনের পূর্বে উভয়েই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিল—এইমাত্র বক্তব্য। সেই উপলব্ধিকে আরও গুরুত্বদানের জন্যই বোধ হয় নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকে বিষ্ণু-অবতাররূপে তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন—

শত সুধাকর-কান্তি, শঙ্খ-চক্র-কর,
আনন্দাশ্রু দু'নয়নে, অধরে সুহাসি।
ওই দেখ ভ্রাতা মম বিষ্ণু-অবতার !

কিন্তু কৃষ্ণমহিমা-খ্যাপনের জন্য অলৌকিকতার সৃষ্টি অন্ততঃ এখানে নিরর্থক, এবং উহা কবির মানবিক পরিকল্পনার বিরোধী।

শেষ বিংশ সর্গ (অঙ্কুর) সুভদ্রা-হরণ কাহিনী। ইহাই কাব্যের কেন্দ্র ঘটনা এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের (যে যুদ্ধ-সম্ভাবনার আভাস ৩য়, ১২শ ও ১৭শ সর্গে দেওয়া হইয়াছে) ইন্ধন স্বরূপ বলিয়া কবি অর্জুন ও সুভদ্রার বীরত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, এবং এই মিলনের গভীরতর উদ্দেশ্য ও 'অঙ্কুর' নামকরণের সার্থকতা কৃষ্ণমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

আজি শুভক্ষণে নাথ ! তোমার করুণাবলে
যে অঙ্কুর হইল রোপিত।
দেও শক্তি সে অঙ্কুরে, করিব শান্তির ছায়া
নাথ ! 'মহাভারত' স্থাপিত।

কিন্তু বর্ণনাবাহুল্যে এবং বিভিন্ন ছন্দের অবতারণায় এই সর্গের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

৩

দ্বিতীয় কাব্য 'কুরুক্ষেত্রে' শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যলীলা বিবৃত হইয়াছে। সর্বগুণান্বিত পূর্ণমানব শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবক্ষেত্রে মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার প্রয়োগভূমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। নবীনচন্দ্র ঐ যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের সমগ্র

ঘটনা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই কাব্যে 'অভিমন্যুবধ' ঘটনাকেই মুখ্য করা হইয়াছে। ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"The death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage, viz. establishment of the empire."[৩৪] Main action অর্থ যদি হয় আর্য-অনার্য বিরোধ, তবে তাহার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র-ধর্মযুদ্ধের সম্পর্ক গৌণ, তাই কাহারও কাহারও মত এই যে, 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য কাহিনীসূত্রে 'রৈবতক' হইতে বিচ্ছিন্ন।[৩৫] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—গীতার শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের নেপথ্য-নায়ক শ্রীকৃষ্ণই নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্য-পরিকল্পনার স্থির কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—"বুঝিলাম, অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মহাভারত।......এই সাম্রাজ্যের নাম ধর্মরাজ্য। ......যে মহাক্ষেত্রে উহা স্থাপিত হয় তাহার নাম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র।"[৩৬] এই যুদ্ধ সম্ভাবনার পটভূমি ব্যাখ্যাত হইয়াছে 'রৈবতক'-এর ৩য়, ১২শ ও ১৭শ সর্গে। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ আদর্শ-সংঘর্ষও যে এই মহা সংক্ষোভের সহিত জড়িত, তাহা ১২শ সর্গে উক্ত হইয়াছে। অনার্যগণ যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—উভয় কর্তৃক, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে আর্য-কর্তৃক নির্যাতিত, তাহাও ৩য় এবং ৪র্থ সর্গে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ব্যাস বলিতেছেন—

যেইরূপে আর্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য দুর্বলে,
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
একদিন। বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ।

* * *

বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায়রাজ্য রাজত্ব নীতির।

* * *

হেন মহারাজ্য
যতদিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপিত,

ততদিন আর্যরাজ্য জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ কালের স্রোতে বালির বন্ধন।

'রৈবতকে'র উক্ত উদ্ধৃতিতে আভাসিত ওই প্রতিঘাতই 'যুদ্ধ', আর 'আর্য-রাজ্য'কে 'ন্যায় ও প্রীতির মহারাজ্য' (বিশ্বরাজ্যের অনুরূপ) রূপে গঠনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তুতি। আমাদের বিবেচনায় সমগ্র কাব্যের main action কুরুপাণ্ডব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত, আর তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের আদর্শ-সংঘাত ও আর্য-অনার্যে সামাজিক-সংঘাত। 'কুরুক্ষেত্রে' সুভদ্রার মুখে তাহা সুব্যক্ত—

ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! ঘৃণিয়া অনার্যগণে
আজি পরস্পরে ঘৃণা করিছে কেমন,
ওই দেখ আর্যজাতি! দেখ মহা আত্মহত্যা
অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের পতন।

তাই 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য 'রৈবতক' হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে আলোড়িত সমস্যাসমূহের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় 'রৈবতকে'।

ধর্মরাজ্য-স্থাপনার্থ সংঘটিত কুরুক্ষেত্র-ধর্মযুদ্ধের প্রধান ঘটনা 'অভিমন্যুবধ'। কেননা, উহা 'ধর্মস্য গ্লানি' এবং 'অধর্মস্য অভ্যুত্থান'-এর জ্বলন্ত নিদর্শন।

ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,
প্রহারিল গদা অর্ধ-উত্থিত মস্তকে,
ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।
'অধর্ম! অধর্ম! ঘোর'—ঘোর হাহাকার
জলধি-কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে। (১৫শ সর্গ)

অর্জুনকে এই ধর্মযুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার জন্য কেবল গীতা-উপদেশই যথেষ্ট ছিল না, তাহার স্নেহ-তন্ত্রীতে এক কঠিন আঘাতেরই অধিক প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণেরও তাহাই অভিপ্রেত ছিল,—

নয়নে অনল, হৃদে জল সুশীতল,
বাহুতে অজেয় বল, হৃদয় দুর্বল।
যদি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ-কঠিন
এইরূপে দ্রোণাচার্য মৃত্যু-অভিনয়
বিভীষণ! করিবেক আরো কতদিন! (১২শ সর্গ)

অর্জুন-হৃদয়ে সেই কুলিশাঘাত 'অভিমন্যুবধ'। ('মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইবার জন্য যেমন ইন্দ্রজিৎ-নিধনের প্রয়োজন ছিল)। ঘটনাটি যে গুরুত্বপূর্ণ, তাহা যুদ্ধের গতি হইতেও বোঝা যায়। ভীষ্ম ও দ্রোণের যুদ্ধ যথাক্রমে দশদিন ও দুইদিন, তৎপর অভিমন্যুবধের পরে ছয়দিনেই যুদ্ধ শেষ। অভিমন্যুর আত্মোৎসর্গ যে 'establishment of empire'এ সহায়তা করিয়াছে তাহা অর্জুনের উক্তি ও সংকল্পে সুস্পষ্ট—

পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান।
বাজাও বিজয়-শঙ্খ মহারথিগণ!
কালি জয়দ্রথে বধি, ষষ্টাহ অতীত
না হইতে অরিকুল করি নির্মূলিত,
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত। (১৫শ সর্গ)

সুতরাং 'অভিমন্যুবধ' ঘটনাটিতে যে সমগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পরিস্ফুট, তাহা নবীনচন্দ্র নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই অভিমন্যুবধে কর্ণকে প্ররোচিত করার পশ্চাতে দুর্বাসার গোপন ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দিবার জন্য সুকৌশলে মহাভারতের আদিপর্বের দুর্বাসা-কুন্তী প্রসঙ্গ-টুকুর সঙ্গে কর্ণ—'কুন্তীর কানীন-পুত্র, পুত্র দুর্বাসার'—এই নূতন তথ্য যুক্ত করিয়া দিলেন, এবং এই চক্রান্তে অনার্যা জরৎকারুকেও নিয়োজিত করিলেন। এইভাবে ঘটনার মূল স্রোতের সহিত অপর স্রোতদ্বয় আসিয়া মিলিল।

তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কাহিনী-গ্রন্থন এই কাব্যে শিথিল; কেননা, দুর্বাসা-বাসুকি-জরৎকারুর বিরোধিতা এখানে সুস্পষ্টভাবে মূল-কাহিনীকে আঘাত করে নাই। নানাস্থানে দীর্ঘ গীতাতত্ত্বব্যাখ্যা যেমন কাহিনীর গতিকে রুদ্ধ করিয়াছে, তেমনি উত্তরা-অভিমন্যুর দাম্পত্য-জীবনের সুখচিত্রও কাহিনীর অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করে নাই। 'রৈবতকে' অর্জুন-সুভদ্রার প্রণয়লীলার উচ্ছ্বসিত বর্ণনাবাহুল্য কাব্যের গুরুত্বকে যেভাবে লাঘব করিয়াছে, উত্তরা-অভিমন্যু প্রসঙ্গও ঠিক তাই। দ্বিতীয় সর্গে উভয়ের কৈশোর-চাপল্যের ঘরোয়া-চিত্র কাব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়াছে। একাদশ ও চতুর্দশ সর্গে যুদ্ধগমনোদ্যত অভিমন্যুর উত্তরার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ চিত্র অঙ্কনকালে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' তৃতীয় সর্গে মেঘনাদ-প্রমীলার বীররসাশ্রিত দাম্পত্য-প্রণয়চিত্র সম্ভবতঃ নবীনচন্দ্রের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ছিল। কিন্তু

প্রধানতঃ বর্ণনাবাহুল্যে ও আটপৌরে জীবনের ছায়াসম্পাতে উহা 'মেঘনাদ-বধকাব্যের' উক্ত সর্গের স্নিগ্ধ মাধুর্য ও পৌরুষ-দীপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তা'ছাড়া, উত্তরা মুখে (প্রমীলার অনুরূপ ভঙ্গিতে) যতই বলুক না কেন—

আমিই কি ডরি রণে? নহি কি ক্ষত্রিয়া?
বিরাট-তনয়া আমি অভিমন্যুপ্রিয়া?
অর্জুনের শিষ্যা আমি, সেই নাট্যঘরে
শিখালেন অস্ত্রবিদ্যা কতই আদরে।

বস্তুতঃ, তাহার অন্তরের কথা হইল—

এই পোড়া যুদ্ধ নাথ! কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার।
ইচ্ছা করে রাজ্য-আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যতে চলি।
মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে।

সুতরাং প্রমীলার সহিত তাহার মানস-গঠনেরও পার্থক্য আছে।

ষষ্ঠ সর্গে (কুরুক্ষেত্রে পুতুলখেলা) বিরাট ও সুলোচনার রঙ্গরহস্য শুধু অবান্তর নয়, বিরক্তিকর; 'রৈবতকের' ত্রয়োদশ সর্গে দুর্বাসা-বলরাম প্রসঙ্গের মতই কবি এখানে সম্ভবতঃ যুদ্ধ-কঠোরতার মধ্যে relief বা comic element রূপে এইটুকু যোজনা করিয়াছেন। এই ব্যর্থ রচনাংশটুকু কাব্যের রসহানি ঘটাইয়াছে।

সপ্তম ও অষ্টম সর্গে প্রেমবঞ্চিতা জরৎকারুর বিদীর্ণচিত্ত 'রৈবতকে'র চাইতেও অধিক ঔপন্যাসিক আত্মবিশ্লেষণরীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং নবীনচন্দ্রের সহৃদয়তার স্পর্শে ও মানবিক রস-সঞ্চারকুশলতায় অষ্টম সর্গটির রচনা প্রশংসার দাবী রাখে। এখানে যেন বহুপূর্বে রচিত 'ক্লিওপেট্রার' আর্তধ্বনি শ্রুত হয়। জরৎকারুর মানসদ্বন্দ্ব বিচিত্রমুখী। একদিকে—

পশু পক্ষী যেই দয়া পায় আর্যদের কাছে,
আমরা অনার্য নাহি পাই বিন্দু তার।

অন্যদিকে—

কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন ?

জরৎকারুর কৃষ্ণাসক্তি অপ্রতিরোধ্য, দুর্বাসার ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হইতে গিয়া সে কৃষ্ণ-সুভদ্রার সেবা-মহিমার স্পর্শ লাভ করিল, কিন্তু শৈলের মত (১৩শ সর্গে) আত্মসমর্পণ করিল না, কেননা—

কিশোরীর প্রত্যাখ্যান, যুবতীর এ যন্ত্রণা,
জ্বালাইল অভিমান প্রচণ্ড অনল।

স্বতন্ত্রভাবে এই চিত্র পাঠককে অভিভূত করে, কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যকাহিনীতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা সঞ্জীবিত রাখার প্রয়োজনে জরৎকারুকে নিয়োজিত করা হইলেও তাহার এই দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ অভিমন্যুবধের ভূমিকা-রচনায় বিশেষ সহায়তা করে নাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদর্শ 'গীতায়' বিধৃত, তাই ব্যাস-কর্তৃক গীতা-সংকলন দ্বারাই 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য সূচিত হইয়াছে। অনার্যা শৈল 'রৈবতকে'ই জাতিগত বিরোধিতা পরিহার করিয়া আর্যমহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফলশ্রুতি—আর্য-অনার্য সম্মিলিত ধর্মরাজ্যের মহিমা-ঘোষণার জন্য কবি এই কাব্যে শৈলকে ব্যাসশিষ্যরূপে উপস্থিত করিলেন। আবার সুভদ্রা সূচনা হইতেই সর্বজীবে করুণারূপিণী,—সুতরাং স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণা অনুভূতিশীলা এই দুইটি রমণীর উপরই কবি হৃদয়-নির্ভর প্রেমধর্ম ও জাতিবর্ণহীন মানবধর্ম প্রচারের ভার দিবেন বলিয়া তাহাদের প্রস্তুতি। সুভদ্রার 'নারীধর্ম' ব্যাখ্যা (৩য় সর্গে), পুত্র অভিমন্যুকে গীতামাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ করা (৪র্থ সর্গে), শৈল (১৩শ সর্গে) এবং জরৎকারুর নিকট মনুষ্যত্ব-আদর্শব্যাখ্যা (৮ম সর্গ)—এই সকলের উদ্দেশ্য এই যে, অভিমন্যুবধের মহাশোককে বিশ্বমাতৃত্বের বিরাট উপলব্ধি দ্বারা অটল ধৈর্যে গ্রহণ করিবার মত ক্ষমতায় সুভদ্রাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবমূর্তিস্বরূপা সুভদ্রার আন্তরশক্তিকে মহত্তর আদর্শপ্রচারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নবম সর্গে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত ব্যাস ও কৃষ্ণের তত্ত্বালোচনা ও ভীষ্মের মানব-মহিমা-অনুধ্যান বর্ণনার সার্থকতা এই যে, প্রথম দশদিনের যুদ্ধের প্রধান নায়ক বীরোত্তম ভীষ্ম, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যেই দুইজন বীরের

আত্মত্যাগের গৌরবে সমুজ্জ্বল, তন্মধ্যে ভীষ্ম অন্যতম। অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণ এই দুইটি আত্মত্যাগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র, কিন্তু কত রূপান্তর,
বীরব্রতে প্রৌঢ়ের সে সমর্পণপ্রাণ।
নরহিতে শিশুর এ আত্মবলিদান। (১৬শ সর্গ)

'কুরুক্ষেত্রে' ঘটনা স্বল্প এবং প্রায় একমুখীন, দশম সর্গ হইতেই প্রত্যাসন্ন অভিমন্যুবধের অভিমুখে সমগ্র ঘটনা ছুটিয়া চলিয়াছে। দশম সর্গে দুর্বাসা কর্তৃক কর্ণকে অভিমন্যুবধে প্ররোচনা দান, একাদশ সর্গে অভিমন্যুর যুদ্ধোদ্যম, দ্বাদশ সর্গে অর্জুনের উদ্দীপ্তির জন্য শোকাঘাতের প্রয়োজনীয়তা কৃষ্ণ কর্তৃক উপলব্ধি, ত্রয়োদশ সর্গে কৌরব-মন্ত্রণার কথা শৈল কর্তৃক সুভদ্রাকে জ্ঞাপন, চতুর্দশ সর্গে অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা, পঞ্চদশ সর্গে অভিমন্যুবধ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গে তাহার পরিণতি। পঞ্চদশ সর্গ (বীরের শোক) নিঃসন্দেহে 'কুরুক্ষেত্রে'র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুলিখিত অংশ। অর্জুন-সুভদ্রা-কৃষ্ণ,—প্রত্যেকের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য এখানে সুন্দর প্রতিভাত হইয়াছে। বীরত্ব-সমুজ্জ্বল আত্মত্যাগের জন্য বীরধর্মী নরনারীর পুঞ্জিত শোক এখানে স্তম্ভিত গাম্ভীর্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তবে আরও সংক্ষিপ্ত ও সংহত বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিলে সর্গটির রচিত পরিবেশ অটুট থাকিত। যে পরিবেশ শোকচিত্রে—

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা।

যে পরিবেশ বীরত্ব-ব্যঞ্জনায়—

অর্জুন! অর্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম রণ।

অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীর-শোক অশ্রু নহে অসির ঝঙ্কার।

তাহা অহেতুক দৈর্ঘ্যে নষ্ট হইয়াছে। তবু এই সর্গের বেদনা-গম্ভীর মহিমা অনস্বীকার্য।

ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গের বক্তব্য—অর্জুনের প্রতিজ্ঞাপূরণ এবং 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত—একটিমাত্র ক্ষুদ্র সর্গে বিবৃত হইলে আবেগের প্রাবল্যে পূর্ব সর্গের শোকছায়াচ্ছন্ন স্তম্ভিত গাম্ভীর্য ভাসিয়া যাইত না। নবীনচন্দ্র নিজ পরিবারে এবং সংসারক্ষেত্রে পুত্রবিয়োগবেদনার নিদারুণতায় অন্তরে বাহিরে যে শোকের ঝড় উঠিতে দেখিয়াছেন, শোকবিধুর পিতামাতা-পরিজনের যে দুঃসহ বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারই অনুভূতি এখানে উচ্ছ্বসিত আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম সর্গে বীরবাহুর পতনে রাবণের শোক, পুত্রবীরত্ব শ্রবণ, বীর উদ্দীপনা এবং নবম সর্গে মেঘনাদের শ্মশানদৃশ্যের শোকোচ্ছ্বাস যথাক্রমে কুরুক্ষেত্রের পঞ্চদশ ও সপ্তদশ সর্গ রচনাকালে নবীনচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল মনে হয়।

৪

তৃতীয় কাব্য 'প্রভাসে' মহাভারতের সম্পূর্ণ 'মৌষল' পর্ব এবং 'মহাপ্রস্থানিক' পর্বের মূল বক্তব্য কাহিনীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, উহাতে কৃষ্ণলীলার অবসান এবং কৃষ্ণ-কুল অর্থাৎ যদু-কুলের ধ্বংস-ইতিহাস বিবৃত আছে। 'রৈবতক'-এ সূচিত আর্যরাজন্যদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ইঙ্গিতপূর্ণ সমাধান দেখান হইয়াছে 'কুরুক্ষেত্রে' আর আর্যদের সহিত অনার্য ও ব্রাহ্মণের বিরোধিতার সমন্বয়াত্মক সমাধান দেখান হইয়াছে 'প্রভাসে'। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও শক্তিতে সমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি ও সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—

এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি মঙ্গল
দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।

দুর্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্য-অনার্যের সন্ধি,—
আমার নীতির ক্রীড়া, নহে দুর্বাসার,
তুমি ও দুর্বাসা মাত্র, নিমিত্ত তাহার। (৯ম সর্গ)

তেমনি কৃষ্ণ-বিরোধী-শক্তির নায়ক দুর্বাসাও দাবী করিয়াছেন—

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা দুর্বাসার।

* * * *

ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক
পোড়াইয়া, আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে, করিয়া সেই যজ্ঞ নরমেধ
স্থাপিলাম এই শান্তি আসিন্ধু অচল,—
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন। (২য় সর্গ)

'রৈবতক'-এর সূচনায় কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দুর্বাসার অভিশাপ—'যাদব-কৌরবকুল হইবে বিনাশ'—যে একেবারে শূন্যগর্ভ নয়, শ্রীকৃষ্ণের অমিত শক্তি এবং প্রভাব সত্ত্বেও দুর্বাসার কূটকৌশল যে ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, তাহা এখানে কবি তুলিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

অনার্যার তীব্র সুরা, অনার্যার তীব্ররূপ,—
কামানলে মত্ত যদুকুল।
কামানলে ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেইরূপে,
যদুকুল হইবে নির্মূল। (৪র্থ সর্গ)

'প্রভাসে' কাহিনী-অংশ আরও সামান্য এবং একমুখী। মূল আখ্যানের প্রধান কথা—পাপমগ্ন যদুবংশের ধ্বংস যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত, ইহা কবি যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনানিচয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-অনার্য মিলিত-ষড়যন্ত্রের ঘটনাটুকুও কৌশলে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম সর্গে রুক্মিণী-সত্যভামার আশঙ্কা উদ্বেগের মধ্য দিয়া ধ্বংসোন্মুখ যদুবংশের সুস্পষ্ট চিত্র পাই, কর্মফলবিশ্বাসী শ্রীকৃষ্ণ মানবকল্যাণের জন্যই নিজ বংশের ধ্বংস রোধ করিতে অনিচ্ছুক।

অধর্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান,
সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।

এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল ;
কেমনে নিবারি'—কেন নিবারিব আমি ?
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী !

'মানবের স্বামী' রূপে শ্রীকৃষ্ণ 'প্রভাসে' দেবমূর্তিতে প্রকাশিত, যোগস্থ থাকিয়া তিনি যেন মানবভাগ্য ও আত্মপরিণাম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। অন্যদিকে দেখি—দ্বিতীয় সর্গে দুর্বাসার কূটচক্র সমান ঘূর্ণ্যমান। দুর্বাসা-শিষ্যদের মুখে 'মহাভারতের' যে চিত্র পাই, তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই কীর্তিবিবর্ধক ও আদর্শসাফল্যের সূচক,—

প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য। ব্যাপিয়া ভারত
এক মহারাজ্যছত্র। ছায়ায় তাহার
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
শান্তির কোমল অঙ্কে ; হতেছে চালিত
শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ। সৌরশক্তি মত
করিয়াছে নবধর্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত ;
করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সঞ্চালিত !

কিন্তু তন্মধ্যেই দুর্বাসা-শিষ্যেরা যদুবালকদিগকে মুষলপ্রসব ও ধ্বংসের অভিশাপ দিয়া আসিয়াছে। 'মহাভারত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' মতে এই শাপ দিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ। 'ভাগবতে' এই সঙ্গে দুর্বাসার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র সেই কার্যভার দুর্বাসা-শিষ্যদের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

জরৎকারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব 'প্রভাসে' আরও গভীর এবং সক্রিয়। তৃতীয় সর্গে শৈলের সহিত কথোপকথনে জানা গেল—যাদবপুরীকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া গভীর নিশীথে সে দয়িত শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত ;

ভীমা উন্মাদিনী আমি !
জ্বলি সে জ্বালায়—কি দারুণ জ্বালা
জানেন অন্তরযামী !
মস্তকের মণি খুঁজিতে ফণিনী
বেড়াইত কক্ষে কক্ষে,

দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা,
কভু রুক্মিণীর বক্ষে।

আবার ষষ্ঠ সর্গে দেখি—দুর্বাসার প্ররোচনায় এবং স্বীয় ব্যর্থপ্রণয়ের প্রতিশোধস্পৃহায় সে জলন্ত রূপ-মোহ সৃষ্টি করিয়া যদুবংশে আত্মহননের সূচনা করিয়াছে। নবীনচন্দ্র যদুবংশে পাপলীলাসৃষ্টির দায়িত্ব জরৎকারুর উপর দিয়া তাহার সক্রিয় বিরোধিতাকে গুরুত্ব দিয়াছেন; তেমনি 'মহাভারতের' জরাব্যাধ কর্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণের ইহলীলা-সম্বরণ-ঘটনাকে নবম সর্গে জরৎকারু কর্তৃক কৃষ্ণকে শরাঘাত রূপে বর্ণনা করিয়া কবি জরৎকারুর জীবনব্যাপী বিরুদ্ধতাকে পূর্ণতা দিলেন। 'বীণা পূর্ণতান' নামক এই সর্গটি লিখিবার সময় কবি নাকি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।[৩৭] ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা করিতে গিয়া মধুসূদনের অনুরূপ অশ্রুবর্ষণের উক্তিটি এই সূত্রে মনে পড়ে। এইভাবে নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়া উহা আরও করুণ মধুর হইয়া উঠিয়াছে। 'কুরুক্ষেত্রে' যেমন শেষার্ধে শোকোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, 'প্রভাসে' তেমনি প্রথম হইতেই ভক্তিভাবের আধিক্য; সেই হিসাবে এই একটিমাত্র সর্গই 'প্রভাসে'র বক্তব্য ও রসপ্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট। ইহার রচনা অত্যন্ত আবেগপ্রধান হইলেও পাঠকের হৃদয়কে আপ্লুত করে।

বাসুকির বিরোধিতা 'কুরুক্ষেত্রেই' নিস্তেজ, 'প্রভাসে' সে কৃষ্ণমহিমায় আচ্ছন্ন। তাই চতুর্থ সর্গে তাহার মুখে শুনিতে পাই—

নহে দেব, নহে দেবী, আমরা দুরাশা মোহে
দেবদ্বন্দ্বী মাত্র দুরাশয়
কিন্তু আর হইব না। আর্য-অনার্যের এই
সম্মিলিত মহারাজ্যে স্থান
মাগি লব ভ্রাতা-ভগ্নী, পতিতপাবন কৃষ্ণ!
আনন্দে গাহিব কৃষ্ণনাম।

অষ্টম সর্গেই দেখি—উদ্দেশ্য (Mission) বিষয়ে হতাশ বাসুকির নিকট ক্রুদ্ধা জরৎকারু দুর্বাসার বাহ্যতঃ অলৌকিক শক্তির ছলনাময় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া চক্রীর দুষ্টপ্রভাব হইতে তাহার দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে আরও ফিরাইয়া দিল। একাদশ সর্গে অনুতপ্ত বাসুকি চিরবাঞ্ছিতা সুভদ্রাকে মাতৃরূপে পাইয়া কৃষ্ণপ্রেমে ঊর্ধ্বগতি লাভ করিল।

হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;
কৌরব-যাদব রক্তে করিয়াছি কর্দমিত
এই কর, এই আত্মা।

দশম সর্গে Villain বা দুরাত্মা চরিত্ররূপে দুর্বাসার পরিণামকে ভয়াবহ করিয়া তোলা হইলেও দেখা যায়, তাহার ব্রাহ্মণ্যতেজ এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত অনমনীয় রাখার চেষ্টা হইয়াছে। সেবারতা সুভদ্রার অলৌকিক ক্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের 'কিরীটিশোভিত, শঙ্খচক্রধর, নীলকান্তিমনোহর, মহাযোগীশ্বর' মূর্তি নয়নসম্মুখে উদ্‌ভাসিত দেখিয়াও দুর্বাসার সংশয় ও প্রতিরোধস্পৃহা ঘুচে নাই,—

হে রাজর্ষি! মহাদেব! কে তুমি? কে তুমি?
দিবে না, দিবে না, না, না, দুর্বাসা তোমায়
পশিতে হৃদয়ে তার। পশিলে হৃদয়ে?
কে তুমি? কে তুমি? কৃ—ষ্ণ?

এই দৃঢ়তাই বিরোধীশক্তির নায়ক দুর্বাসাকে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়া তাহার পরাজয়ের অগৌরব ঢাকিয়া দিয়াছে।

অষ্টম সর্গে বলরামের দেহত্যাগ এবং দ্বাদশ সর্গে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান ঘটনা দুইটিতে নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক তাৎপর্য আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। 'মহাভারতে' আছে—

তথাপশ্যদ্ যোগযুক্তস্য তস্য নাগং মুখান্ নিশ্চরন্তং মহান্তম্।
শ্বেতং, যযৌ স ততঃ প্রেক্ষ্যমাণো, মহার্নবো তেন, মহানুভাবঃ॥
সহস্রশীর্ষঃ পর্বতাভোগবর্ষ্মা রক্তাননঃ স্বাং তনুং তাং বিমুচ্য।
সম্যক্ চ তং সাগরঃ প্রত্যগৃহ্লান্ নাগা দিব্যাঃ সরিতশ্চৈব পুণ্যাঃ॥**

"বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল।" নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন

উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তাঁর অনুসার,
গাহি আর্য-অনার্যের গীত সম্মেলন। (৮ম সর্গ)

অর্থাৎ বলদেব সমুদ্রপথে বহির্ভারতে সভ্যতা প্রসারে চলিলেন। আবার 'মহাভারতের' অন্যত্র বর্ণিত আছে—

অভিজগ্মুর্বহূন্‌দেশান্‌ সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥

* * *

ক্রমেণ তে যযুর্বীরালৌহিত্যং সলিলার্ণবম্‌॥

* * *

যযুশ্চ পাণ্ডবা বীরা স্ততস্তে দক্ষিণামুখাঃ॥
ততস্তেত্বূত্তরে নৈব তীরেণ লবণাম্ভসঃ।
জগ্মুর্ভরতশার্দূল! দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্‌॥[৩৯]

"পাণ্ডবেরা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন।……অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।" নবীনচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন—

লোহিত সাগরতীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে পশ্চিমে সুদূর।

*

পূরব উত্তর তীরে লবণ সিন্ধুর। (১২শ সর্গ)

অর্থাৎ, পাণ্ডবেরাও ভারতের বাহিরে নূতন নূতন দেশে গমন করিলেন। কাব্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহাসিক রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা এবং সমর্থন-যোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি উঠিয়াছিল। ১৮৯৬ সালে নবীনচন্দ্রকে লিখিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এক পত্র এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।[৪০] 'প্রভাসের' পরবর্তী সংস্করণে যোজিত এক পরিশিষ্টে ঐতিহাসিক তথ্যাদি দিয়া নবীনচন্দ্র স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেন—"মহাভারতের দুইটি মহাঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগৎপূজ্য কবি মহাভারত শেষ করিয়াছেন। (১) বলরামের আত্মা সর্পরূপে প্রভাস সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। (২) পাণ্ডবগণ একটি কুক্কুর (যদুকুলের কুক্কুর শাখা) সহ 'অসংখ্য দেশ, নদী, সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে' ও 'লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে' গমন করিলেন। এরূপে

যদুকুলের বা হরিকুলের দুই শাখার জল ও স্থলপথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি। অন্যদিকে গ্রীক ইতিহাস খুলিলে, দেখিতেছি, পূর্বদিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি, স্থলপথে একদল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশান্বেষণ করিতেছেন। লোহিত সাগরের পূর্বতীরে মহম্মদের লীলাভূমি আরব দেশ এবং লবণ সমুদ্রের বা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে খৃষ্টের লীলাভূমি যুদিয়া, উত্তর তীরে গ্রীস। সংস্কৃতে যদু শব্দের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের মত; ইহুদিদের দেশের নাম যুদিয়া। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য সাদৃশ্য।......এ সকল সাদৃশ্যের মধ্যে কোনও রূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কি? না থাকে কাব্যকারের ক্ষতি নাই। তাঁহার পথ মুক্ত। প্রভাসের কবির পক্ষে মহাভারতের দুইটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট।" এই তাৎপর্য-আরোপের ঐতিহাসিক মূল্য আদৌ থাক বা না থাক, মহাভারতীয় কাহিনীর নানা অংশে এইরূপ মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন বা উহাদের রূপান্তরিকরণের প্রয়াস হইতে বোঝা যায়, নবীনচন্দ্র সত্যই যুগদৃষ্টির অনুকূল 'নব মহাভারত' সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টিতে দেশচেতনা বিশ্বচেতনায় প্রসারিত, শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কবির এই উদার ধারণাই প্রকাশিত হইয়াছে—

ভারত জগৎ নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্যচয় অনন্ত বিস্তার।

*   *   *

মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী। (৮ম সর্গ)

তেমনি দ্বাদশ সর্গে যাদবরমণী হরণ-ঘটনাটিকে আর্য-অনার্য মিলনের সূচক বলিয়া কবি এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আর্য-অনার্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছুদিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্মরাজ্য-ছায়াতলে।

শ্রীকৃষ্ণের Mission বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির এই ব্যাখ্যা অভিনব সন্দেহ নাই, সমস্ত দুর্ঘটনাই যেন শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত মঙ্গলবাহী। লক্ষণীয় এই যে, প্রায় সকলেই কোন না কোন ভাবে ধ্বংসকর যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সুভদ্রা ও শৈল সেই বহ্নিমান পরিবেশের মধ্যেও শান্তি ও মিলনের ধারাবর্ষণ কামনা করিয়াছে চরম ত্যাগের বিনিময়ে। তাই শেষ পর্যন্ত আর্য-অনার্য মিলনের ধারক ও বাহক হইল আর্যা সুভদ্রা ও অনার্যা শৈল।

শেষ ত্রয়োদশ সর্গের প্রারম্ভে প্রকৃতির ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাব্য 'রৈবতক' সূচিত হইয়াছিল এইভাবে—

লক্ষ্মীপূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে
সৃষ্টির প্রথম অংক করি অভিনয়,
দেখ পার্থ, সিন্ধুগর্ভে উঠিছে কেমন।

আশা-সংঘাতময় দিবসের যেমন সূচনা, 'রৈবতকে' জটিল কাব্যকাহিনীরও তেমনি উন্মোচন, তাই সৃষ্টির প্রথম অংক। আর শেষ কাব্য 'প্রভাসের' শেষ সর্গে সন্ধ্যার ক্লান্তি, বিরোধের শান্তি, কাহিনীরও অবসান, তাই সৃষ্টির অন্তিম অংক—

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে
সৃষ্টির অন্তিম অংক করি অভিনয়
মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে,
সিন্ধু যেন নারায়ণ শান্তির আলয়।

কাব্য-পরিকল্পনার মহনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই গম্ভীর-মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্য প্রয়োজন ছিল। 'ভবিষ্যৎ' নামক এই সর্গে কবি বিভিন্ন যুগে বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যুগমানবরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সম্ভাবনার চিত্র প্রেমমূর্তি চৈতন্যদেবে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভারতকেও কবি দেখিয়াছেন প্রেমভক্তির আলোকে।

ধর্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন,
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জরিত।
তখন জাহ্নবীতীরে, চারু নব বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার,
কি মধুর প্রেমরসে ভাসিছে ভারতভূমি!
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার।

কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণ বাস পীতধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, নবীনচন্দ্রের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব-প্রবণতা 'প্রভাসে' মুক্তধারায় বহিয়া গিয়াছে। 'রৈবতকে' মাত্র অষ্টম সর্গে কৃষ্ণের স্মৃতিচারণে ভাগবতীয় কৈশোর-লীলা বর্ণনায় তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল, আবার 'কুরুক্ষেত্রে' ঐশ্বর্যলীলার প্রাধান্যে তাহা তেমন প্রকাশ পাইতে পারে নাই। মনে রাখিতে হইবে—মহাভারতীয় কাহিনীতে গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির আদর্শ এবং ভাগবতের অকৈতব প্রেমাবেগ সঞ্চারিত করিয়া নবীনচন্দ্র তাহাকে যুগানুকূল নূতন তাৎপর্যে ও গভীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 'রৈবতকে' জ্ঞান, 'কুরুক্ষেত্রে' কর্ম, 'প্রভাসে' প্রেমভক্তি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। অনার্য বাসুকি ও জরৎকারুর বিরোধিতার মূল প্রকৃতি এবং পরিণতিও নির্ণীত হইয়াছে গীতায়—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' এই উক্তির আদর্শে—

যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব-ভাবে মানব করে মম অনুসার।
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন, চাহিয়াছ শত্রুভাবে,
পাইয়াছ শত্রুভাবে আজি দুইজন। (৯ম সর্গ)

সুতরাং সমস্ত দ্বন্দ্ব এক নির্বিরোধ ভাবসমন্বয়ে আসিয়া প্রশান্ত মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। জাতিবর্ণের ভেদ এক মানবপ্রেমে গলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে; ভক্তি ও প্রেম, গীতা ও ভাগবত মিলিয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ছিলেন এই প্রেম-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। ষোড়শ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আদর্শ ও বাণীতে যে একটা মূলগত ঐক্য আছে, তাহা সমন্বয়ের কবি নবীনচন্দ্রের উদার উপলব্ধিতে ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের পরম প্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবে। নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনায় শ্রীকৃষ্ণলীলা চৈতন্যলীলায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের রসবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়া হয়ত বা স্বাভাবিক, তথাপি মহাভারতের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর উপর নূতন তাৎপর্য আরোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কবি যেভাবে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্যলীলার সুস্পষ্ট আভাসও অবান্তর হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক সুন্দর বলিয়াছেন—"নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-চরিত্রের এত গভীর ভাবব্যাপকতা কোন একটি প্রত্যক্ষ জীবন

ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, সেই জীবন চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, চৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনের মধ্যে যে কর্মবাদ, জীবনবাদ, যে ভক্তিবাদ এবং সর্বশেষে যে প্রেম-সন্ন্যাস; নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং বিশেষভাবে প্রভাসে তাহাকেই বারম্বার স্মরণ করাইয়া দেয়। বিষয়-নির্বাচনে এবং শিল্পনির্দেশনায় তথা রসব্যঞ্জনায় হয়ত কিছুটা পৃথক, কিন্তু ভাবসূত্রটি ঐকান্তিকভাবে তাহারই নির্দেশ প্রদান করে। কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন—রৈবতক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র মধ্যলীলা এবং প্রভাস অন্ত্যলীলা লইয়া রচিত,—তাহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাব-ক্রমবিকাশটি মনে করাইয়া দেয়।"[১১] পূর্বোদ্ধৃত 'কালা হইয়াছে গোরা' অংশটুকু রচনাকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গৃহীত 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্' শ্লোকটি কি নবীনচন্দ্রের মনে পড়িয়াছিল?

৫

'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' এক হিসাবে আধুনিক কৃষ্ণায়ন বা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। সুতরাং রাজনৈতিক সংঘাত, চারিত্রিক দ্বন্দ্বকাহিনীর মধ্যে যে ভাবেই সন্নিবেশিত করা হোক না কেন এবং তাহার পরিণতিতে সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতা থাকুক বা না থাকুক, সমগ্র পরিকল্পনার ধ্রুবপদ বা মূল সুর—কৃষ্ণমহিমার নিঃসংশয় উপলব্ধি। মনে রাখিতে হইবে—শাস্ত্রমতে এবং সুচির বিশ্বাসমতে হিন্দুদের নিকট 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে বিশ্বাস করিয়াই কৃষ্ণের মানব-চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্যের দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য করেন নাই।[১২] নবীনচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশক্তিসম্পন্ন পূর্ণমানবরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন, এবং প্রথম হইতে তাঁহাকে বিজ্ঞানবাদী, মানবগৌরবে আস্থাবান, লৌকিক-ক্রিয়া কুশলরূপে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন। তথাপি 'রৈবতকের' কৃষ্ণ এবং 'প্রভাসে'র কৃষ্ণের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ অসামঞ্জস্য নির্দেশার্থে বলিয়াছেন—"নবীনচন্দ্রের কাব্যের সূচনায় কৃষ্ণের মানব-রূপ, অন্তে দেব-রূপ।"[১৩] ইহা সর্বথা স্বীকার্য যে গভীর জীবন-সাধনা দ্বারা মানব নিজ পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, প্রবল আন্তর-শক্তি দ্বারা Superman বা অতিমানবীয় ক্ষমতা-অর্জনও তাহার সাধ্যায়ত্ত।

আবার মহাকাব্যে নায়কের মধ্য দিয়া মানুষের সেই বিরাট স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াও সম্ভব। "The epic hero always represented humanity by being superman."[৪৪] নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে শুধু Perfect man নয়, Superman, কিম্বা তাহারও অধিকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের ধারণা—নবীনচন্দ্র যুগাদর্শের প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানবসত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেও গভীর বিশ্বাস এবং ভক্তিপ্রবণতায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎসত্তা বা ঈশ্বরত্ব কখনোই ভুলিতে পারেন নাই। এই অনুভূতি তাঁহার প্রেরণার আদি উৎস, এই বিশ্বাস তাঁহার অধ্যাত্ম-প্রকৃতির মূলে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করিয়াছে। ইহাতেই হয়ত শশাঙ্ক-মোহন কথিত 'বৈষ্ণব' নবীনচন্দ্রের বৈষ্ণবতার পরিচয়। নবীনচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"বুঝিলাম, অতিমানুষিক শক্তিবলে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কার করিয়া এবং তিনই নিষ্কামত্বের উপর স্থাপিত করিয়া এই মহাধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকলে অবতার, আর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। অন্য সকলে অবতার,—কারণ তাঁহারা এক এক সংস্কারকার্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্বপ্রকার সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্ম-প্রচারক করেন নাই। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান।"[৪৫] বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির ভিত্তিতে কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজ বিশ্বাস এবং বিচারের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নবীনচন্দ্র বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তিতে কৃষ্ণচরিত্র রূপায়ণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, যুক্তি ও বিচারের পথে যান নাই। শ্রীকৃষ্ণের উন্নত আদর্শ ও ভাব-নেতৃত্ব এবং মঙ্গলধর্মী কর্মপন্থার' সার্থকতা কবি স্বতঃসিদ্ধরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা-নির্ভর চিত্র উদ্‌ঘাটনে তাঁহার উদ্যম ও সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল। নবীনচন্দ্রের প্রকাশধর্মের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনার চাইতেও ঘটনার তাৎপর্য-বিশ্লেষণে এবং তদুপযোগী আবহ-রচনায় তাঁহার আগ্রহ অধিক। 'পলাশির যুদ্ধে'ও আমরা এই রীতি লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু মহাকাব্যে ঘটনা-প্রবাহের গুরুত্ব কিছু কম নয়, তাহা দ্বারাই বরং চরিত্র ও বক্তব্য অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু নবীনচন্দ্র অধিকাংশক্ষেত্রে বর্ণনা ও তত্ত্ববিশ্লেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ রূপায়ণের ধারণা দিতে চাহিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা-সিদ্ধি

যথোপযুক্ত ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া আসে নাই—পাঠকের এই ধারণা একেবারে অসঙ্গত নহে।

'রৈবতকে' কাহিনীর জটিলতা-সৃষ্টির প্রয়াস পাইতে হইয়াছে বলিয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব-আভাস প্রথমাংশে স্ফুটতর হয় নাই। সপ্তম সর্গে 'পূর্বস্মৃতি' বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ যে পদ্মদল-অধিষ্ঠিত চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিয়াছেন, তাহাকে শ্রেষ্ঠ মানবের মহান উপলব্ধি বা Revelation বলিয়াও যদি মনে করিয়া লই, তবু দ্বাদশ সর্গে 'সোহং' অধ্যায়ে দেখি—সেই নারায়ণমূর্তিই তিনি নিজ বিভূতিরূপে ব্যাস এবং অর্জুনকে প্রদর্শন করিতেছেন—

সোঽহং, আমি নারায়ণ! একক ত নহি
আমি, একত্ব তাঁহার। সর্বভূতময়
আমি, আমি সর্বপ্রাণী, আমি বিশ্বরূপ!
আমার সে বিশ্বরূপ, দেখ ভগবন্।
দেখ ধনঞ্জয়! * * *
বিশ্বপদ্মব্যাপী দেখ মম অধিষ্ঠান!
* * *
নাহি ব্রহ্মা, নাহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্।
একমেবাদ্বিতীয়ং—আমি ভগবান।

অন্যত্র সুভদ্রা অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে—

নীলমণিময় ওই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বপু দেখ নারায়ণ—
শত সুধাকর-কান্তি, শঙ্খচক্র-কর,
আনন্দাশ্রু দুনয়নে, অধরে সুহাসি।
ওই দেখ ভ্রাতা মম বিষ্ণু অবতার। (১৬শ সর্গ)

কৃষ্ণবিরোধী বাসুকিও বলে—'ভাবিয়াছি নহে কৃষ্ণ মানব কখন।' (৪র্থ সর্গ) একবারমাত্র কৃষ্ণ-সাক্ষাতে কঠোর দুর্বাসারও সম্ভ্রমপূর্ণ মানস-প্রতিক্রিয়া স্বগতোক্তিতে প্রকাশিত—

কি পাপ! দেখিবামাত্র কাঁপিতেছে মম গাত্র,
নাহি জানি কি যে ইন্দ্রজাল

জানে অই দুরাচার, দেখিয়া আমারো মনে
উপজিছে ভক্তি, কি জঞ্জাল। (১৩শ সর্গ)

‘কুরুক্ষেত্র’ কাব্যে ব্যাসের মুখে শুনিতে পাই—

করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত,—কৃষ্ণ অবতার। (১ম সর্গ)

জরৎকারুর নিকট সুভদ্রা বলিতেছে—

অবতীর্ণ নারায়ণ! ভস্মিয়া অধর্ম যবে
এ মহাশ্মশান হায়! হবে নির্বাপিত। (৮ম সর্গ)

কৃষ্ণের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—

আজি তব বিশ্বরূপ দেখিতেছি হায়॥
অনন্তের গর্ভে যেন,—হৃদয়ে তোমার
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব; * *
নররূপী তুমি নারায়ণ॥ (৯ম সর্গ)

‘প্রভাস’ কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই দেবমূর্তিতে প্রকাশিত। প্রথম সর্গেই তিনি নারায়ণরূপে আখ্যাত। তাঁহার—‘যোগস্থ মূর্তি নীলমণিময়, দীপিতেছে দীপালোকে উর্দ্ধনেত্রদ্বয়।’ প্রভাস-তীর্থে—‘সেই দেবমূর্তি চাহি অনিমিষ, চাহি অনিমিষ বিশ্বচরাচর,’ নানাজনে তাঁহাকে নানাভাবে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে। ব্রজবাসীদিগের নিকট তিনি—‘ব্রজের গোপাল যশোদা দুলাল,’ ব্রজকিশোরীর চক্ষে—‘ব্রজের কিশোর ত্রিভঙ্গ শ্যাম,’ ক্ষত্রিয়ের চক্ষে—‘অর্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর,’ যোগীদের দৃষ্টিতে—‘মহাযোগীমূর্তি যোগে নিমগন,’ অনার্যদের দৃষ্টিতে—‘দয়াময় হরি পতিতপাবন,’ কামাসক্ত যাদবদের নিকট—‘মহাকালমূর্তি।’ শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখি, দেবতারূপে কল্পিত শ্রীকৃষ্ণকে নানাজনে নানামূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছে—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥’'

অর্থাৎ—“যে ভগবান মল্লদিগের অশনি, মানবদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্তিমান মদন, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসনকর্তা, নিজের পিতা ও মাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনের

পক্ষে বিরাট স্বরূপ, যোগিদিগের পরম তত্ত্ব, এবং বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি অগ্রজের সহিত রঙ্গস্থলমধ্যগত হইয়া বিবিধভাবে প্রকাশমান হইলেন। অর্থাৎ ভগবান শৃঙ্গারাদি সর্বরসকদম্বমূর্তি, পরন্তু রঙ্গ-মধ্যস্থ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট পৃথকভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।'' ভাগবতের এই ধারণাটুকু নবীনচন্দ্রকে প্রভাবিত করিতেও পারে।

দুর্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্যঅনার্যের সন্ধি,—
আমার নীতির ক্রীড়া, নহে দুর্বাসার,
তুমি ও দুর্বাসামাত্র, নিমিত্ত তাহার। (৯ম সর্গ)

শ্রীকৃষ্ণের এই কৃতিত্বের দাবীকে মহাকৌশলী রাজনীতিজ্ঞের কূটলীলার পরিচায়ক বলিয়া হয়ত বা মনে করা চলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন তিনি বলেন—

আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,
শক্তির নীতির মম মহা আবর্তন!
এই আবর্তন—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন। (৯ম সর্গ)

তখন তাঁহার দেবস্বরূপ সম্পর্কে আর সংশয় থাকে না। সুতরাং আমাদের ধারণা—নবীনচন্দ্রের 'অবতারদিগকে মানুষিকভাবে' দেখিবার প্রয়াস অন্ততঃ কাব্যত্রয়ে ঠিক সার্থক হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের দেবরূপ ও অবতারত্ব তিনি ভক্তিপ্রবণ মন হইতে কখনো মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই, এবং 'মহাভারত-গীতা-ভাগবত' কখনো তাঁহাকে তাহা ভুলিতে দেয় নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দেবরূপের প্রকাশ 'রৈবতক' হইতেই, শুধু 'প্রভাসে' নয়। অবতারদিগকে যথার্থ মানুষিকভাবে তিনি দেখিতে পারিয়াছেন জীবনীকাব্য কয়টিতে —'খৃষ্টে,' 'অমিতাভে,' 'অমৃতাভে'। তাহার কারণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ নরকীর্তিসমূহ ঐতিহাসিক, তাহার তথ্যাদি পুরাণে পর্যবসিত হয় নাই; বিপুল শ্রদ্ধা ব্যতীত তাঁহাদের প্রতি নবীনচন্দ্রের কোন মোহ বা দৃঢ়মূল সংস্কার থাকার কথা নহে। তাঁহারা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' নহেন, শ্রেষ্ঠ মানব; তাই কবির পক্ষে তাঁহাদের মানুষী লীলাচিত্রণ অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কবির অন্তরের ভক্তিবিগ্রহ, 'কুরুক্ষেত্রে' এবং 'প্রভাসে' কবি তাঁহার ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া কখনো কখনো যে ভাবে কাহিনী ও বর্ণনার মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতেই নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আবেগবিহ্বল আসক্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই আসক্তি, এই বিশ্বাসের

দরুণ বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতার উপর নবীনচন্দ্রের নির্ভরতা ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইয়াছে।

যাহা হোক, মহাকাব্যের নায়কোচিত সর্ববিধ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বিভূষিত। তিনি 'character of higher type' (Aristotle) এবং 'ক্ষমাবানতি-গম্ভীরো মহাসত্বঃ ধীরোদাত্ত দৃঢ়ব্রতঃ' (বিশ্বনাথ)। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রগুরুরূপে কল্পনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার লীলার ঐতিহাসিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও চরিত্রনীতির পরিচালক। তিনি বৈদিক ধর্মের প্রাণহীন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জড়বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চেতনাযুক্ত বিবেকসম্পন্ন স্বাধীন মানবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নিষ্করুণ প্রাধান্যে, উৎপীড়নে সমস্ত ভারতবর্ষ পিষ্ট হইতেছে, তাহার উচ্ছেদ করিয়া সেই স্থানে একটি সুসংহত, সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতি নীতি, দয়া ও ন্যায়ের দ্বারা চালিত অখণ্ড মহারাজ্য স্থাপনের জন্যই তিনি আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্র ও মস্তিষ্ক তিনি স্বয়ং, অর্জুনের বাহুবল ও ভক্তি এবং ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান তাঁহার সহায়ক। তাঁহার চতুর্ভুজ-রূপের ব্যাখ্যায় এই সহায়ক-শক্তির কথা সুন্দর-ভাবে বলা হইয়াছে—

দুই ভুজ মম পার্থ দ্বৈপায়ন,
দুই ভুজবলে জ্বালাইনু হায়।
কত কুরুক্ষেত্র খাণ্ডব ভীষণ।

*　　*　　*

অন্য দুই ভুজলতা ভদ্রা শৈল
সৃজিয়াছে কিবা প্রেম-পারাবার।
আজি চতুর্ভুজ মূরতি আমার
গদা পার্থ-বল, শঙ্খ গীতা আর
সুভদ্রার বক্ষ শান্তি-শতদল,
প্রেম-মধুচক্র বক্ষ শৈলজার। (প্রভাস-৫ম)

বৈদিক ধর্মের সারল্যপূর্ণ উন্নত আদর্শের প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাই তাহার মূর্ত প্রতীক মহর্ষি ব্যাসকে তিনি গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। দুর্বাসা সেই আদর্শকে কলুষিত করিয়া শুদ্ধমাত্র তাহার প্রাণহীন কঙ্কাল লইয়া

উন্মত্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের এত অশ্রদ্ধা ও বিরূপতা। 'সোঽহং' অধ্যায়ে দেখি, মানবের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁহার কী গভীর বিশ্বাস। তাঁহার জীবন গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এবং ভাগবতের তথা বৈষ্ণবধর্মের প্রেমবাদের অপূর্ব সমন্বয়রূপ। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের পবিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে বিরোধী বাসুকির অন্তরও শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ আধুনিক উপন্যাসের বাস্তব চরিত্র-বিচারের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণকে ছলনাময় বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে "অনার্য জরৎকারুর প্রেম-প্রত্যাখান করিয়া এবং সুভদ্রা-বাসুকির পরিণয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কৃষ্ণ তাঁহার চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।"[৩৭] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—আর্যের বিরুদ্ধে অনার্যের ক্ষোভের সামাজিক কারণের সহিত ব্যক্তিগত কারণও প্রদর্শনের জন্য এবং কাহিনীর জটিলতার প্রয়োজনে কবি উক্ত ঘটনাদ্বয় কল্পনায় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা জানি, কাব্যত্রয়ের পশ্চাতে এক গভীর উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় আছে। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সন্ধি সবই স্বকীয় লীলারূপে কৃষ্ণ ব্যক্ত করিয়াছেন। দুর্বাসা ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণের ভক্ত—মিত্র বা শত্রুভাবে। জরৎকারু এবং বাসুকি শত্রুভাবেই তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধতার সঙ্গত কারণরূপে পূর্বোক্ত ঘটনাদ্বয়ের অবতারণা। তাই পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য মনে রাখিলে উহাকে আর কৃষ্ণের ছলনা বলিয়া মনে হইবে না। তাহা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণও যে প্রণয়বঞ্চিতা জরৎকারুর বেদনায় অবিচলিত ছিলেন না, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও নবীনচন্দ্র দিয়াছেন। মূর্ছিতা জরৎকারুর—

> হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে ;
> বাসুদেব দ্রুত করে আনি নদী-জল
> বর্ষিলেন মুখে চক্ষে ; এবার কাঁপিল কর,
> হইল কৃষ্ণের দুই চক্ষু ছল-ছল। (কুরুক্ষেত্র-৮ম)

আবার বলিতে হয়, মহান আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পিত হইলেও সমগ্র কাব্যে প্রধান নায়কোচিত সক্রিয়তা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নেপথ্যে থাকিয়া তিনি কৌশল ও প্রভাবমাত্র প্রয়োগ করিয়া নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাই তিনি অভিভূত করেন কিন্তু উদ্দীপ্ত করেন না, ভক্তি জাগান কিন্তু আগ্রহ সঞ্চার করেন না। এখানে ভার্জিল কৃত, Aeneid মহাকাব্যের নায়ক-পরিকল্পনার সহিত কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। মহৎ আদর্শের ধারক

হইয়াও Aeneas নায়ক-হিসাবে নবীনের কৃষ্ণের মতই বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারে নাই, কেননা—"Aeneas is not a man but a paragon, in whom nobody take any real interest because nobody can really believe in his existence."[১৮] অন্যদিকে কাব্যত্রয়ীর প্রায় সমস্ত চরিত্রই কোন না কোনভাবে কৃষ্ণমহিমায় অভিভূত বলিয়া কেহই উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তিত্বে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তবু তন্মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে দুর্বাসা এবং বিশেষ করিয়া জরৎকারু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ব্যাসদেব তত্ত্বমূর্তিমাত্র, শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকাণ্ডের পশ্চাতে যে নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব-ভিত্তি আছে, তাহাকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্ফুট করার প্রয়োজনে কাব্যে তাঁহার উপস্থিতি। তাঁহার একমাত্র সক্রিয়তা দেখি শৈলের রূপান্তরিকরণে সহায়তা করার ব্যাপারে, নতুবা তিনি জগৎ-লীলার বিস্ময়-বিমূঢ় দর্শক। তেমনি অর্জুন-চরিত্রও কুত্রাপি প্রাধান্যলাভ করে নাই, যদিও ব্যাসদেবের জ্ঞান এবং তাহার ভুজবল শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্যস্থাপন-প্রচেষ্টার প্রধান অবলম্বন। তাহার বীরত্বের পরিচয়ও সামান্য; কেননা এই কাব্যের মুখ্য রস শান্ত অর্থাৎ ভক্তি, অর্জুনও তাই অন্যতম ভক্ত। কৃষ্ণভাবানুগামিনী দুইটি নারীর (সুভদ্রা এবং শৈল) প্রেম তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে, তবু সেই ব্যাপারে তাহার সক্রিয়তার অভাব; সেই প্রেমও তাহাকে ছাড়াইয়া অবশেষে মহত্তর জীবপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমে উন্নীত হইয়াছে। সুভদ্রাহরণ এবং অভিমন্যুবধ—এই প্রধান ঘটনাদ্বয়ের সহিত অর্জুন বিশেষভাবে জড়িত, তথাপি সেখানে প্রাধান্য সুভদ্রার, অর্জুনের নয়।

নবীনচন্দ্রের দুর্বাসা-চরিত্র সম্পর্কে অনেকেই এই কারণে আপত্তি করিয়া থাকেন যে, 'পৌরাণিক দুর্বাসার ক্রোধোদ্দীপ্ত গম্ভীর মহিমা নবীনচন্দ্রের লেখায় চকিতের দেখাও দেয় নাই,' 'দুর্বাসা-চরিত্রের এই রূপ আমাদের সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করে।'[১৯] কাজেই কবির দুর্বাসা-চরিত্র সৃষ্টির অভিপ্রায় আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদিতে দুর্বাসা সর্বত্রই ক্রুদ্ধপ্রকৃতি ও অভিশাপপ্রবণ মুনি বলিয়া আখ্যাত। "তপঃপ্রভাবে ইনি তেজের আধার ছিলেন বটে, কিন্তু অতি কোপনস্বভাব ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন।"[২০] পুরাণেও কোন মহৎ

কার্যে দুর্বাসার মহত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে কী? ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের মত কোন শ্লাঘনীয় 'সংস্কার' বা 'বাসনা' তিনি আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া তো মনে হয় না। আর যদি তুলিয়াও থাকেন, তবু একটা কথা ভাবিবার আছে। রাবণ-চরিত্রচিত্রণে সুচিরপোষিত ধারণার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া মধুসূদন যদি আমাদের সুদৃঢ় 'সংস্কার বা 'বাসনা' ক্ষুণ্ণ না করিয়া থাকেন, উহাতে যদি যুগ-প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখিয়া আমরা বরং উল্লসিত হই; তবে নবীনচন্দ্রের দুর্বাসা-চরিত্রচিত্রণ আমাদিগকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে কেন? মধুসূদন-কর্তৃক বাল্মীকির রামচরিত্রগৌরব লাঘবের জন্য তো আমরা আপত্তি করি না। পূর্বেই বলিয়াছি—দুর্বাসা প্রাচীন অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের প্রতিনিধি, তাঁহার বিরোধ কৃষ্ণ অর্থাৎ নবীন মুক্ত ধর্মবোধের সহিত; নবীনচন্দ্রের আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা ছিল নবধর্মেরই উপর। রাবণ ও দুর্বাসা—উভয়েই আমাদের তথাকথিত 'সংস্কারের' ব্যতিক্রম, পার্থক্য এই—'রাবণ' কবিসহানুভূতিপুষ্ট, 'দুর্বাসা' কবিসহানুভূতিরিক্ত; 'রাবণ' কাব্যের প্রতিপাদ্য ভাববস্তুর অবলম্বন, 'দুর্বাসা' অন্তরায়। নবীনচন্দ্রের কাব্যে দুর্বাসার ভূমিকাই এমন যে তাঁহার পক্ষে কবির grand fellow হইবার কোন উপায় ছিল না।

যাহা হোক, দুর্বাসা শক্তিহীন শ্রেষ্ঠত্বগর্বী ব্রাহ্মণজাতির প্রতীকরূপে এই কাব্যে উপস্থাপিত হইয়াছেন। দুর্বাসার কূট রাজনৈতিক তৎপরতায় আত্মপ্রাধান্যবোধ ও অপমানের প্রতিশোধস্পৃহা সমান জাগ্রত; তাই অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "দুর্বাসায় মেকিয়াভেলি ও চাণক্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছে।"[৫১] কৃষ্ণের প্রতি দুর্বাসার বিদ্বেষ ব্যক্তিগত—ক্ষুব্ধ অভিমানজনিত। আর তাঁহার যেই অভিযোগ ব্যাপকরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাও কোন মহান্ আদর্শপ্রণোদিত নহে—স্বার্থসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের আভিজাত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান উদ্দেশ্য। সরলপ্রাণ বাসুকির সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে নিপীড়িত অনার্য জাতির প্রতি দুর্বাসার সহানুভূতির আভাস সূচিত হয় নাই, বরং তাহাতে নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির অনুকূল কূট রাজনীতিকুশলতার পরিচয়ই অধিক রহিয়াছে। বাসুকি তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয় নাই, বরং তাঁহার নীচতায় কখনো কখনো ক্ষুব্ধই হইয়াছে। জরৎকারু তাঁহার ক্রীড়নক হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রেমে ও শ্রদ্ধায় নয়, প্রয়োজনে।

জরৎকারুর পাণিগ্রহণের মধ্যেও এই ষড়যন্ত্র সুদৃঢ় করার প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। প্রেমহীন স্বার্থকেন্দ্রিক এই পরিণয় দ্বারা একটি নারীজীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মমভাবে পেষণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নবীনচন্দ্র কিন্তু এই কঠোর পাষাণের মধ্যেও কখনো কখনো দুর্বলতার রন্ধ্র সন্ধান করিয়াছেন। জরৎকারুর সহিষ্ণুতায় বিস্মিত দুর্বাসা আত্মবিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—

সত্যই কি হায়!
তপস্বীর নাহি নারী-হৃদয়ের জ্ঞান? (রৈবতক—১৮শ)

সংসার-ধর্মের মাধুর্য সম্পর্কে এই শুষ্ক ঋষিও যেন কখনো কখনো একটি মোহ এবং আকর্ষণ হতাশ-বেদনায় অনুভব করিতেন,—

সংসারবন্ধন যদি মোহের বন্ধন,
মোহ তবে কি মধুর! কি স্বর্গ-সুন্দর—
ভ্রাতা ও ভগিনী ওই গলায় গলায়!
জরৎকারু—জরৎকারু! কিবা মূর্তিখানি।
কিবা মুখ! কিবা রূপ! রূপের সাগরে
খেলে কি তরঙ্গ-ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ
যজ্ঞকুণ্ডসম মম যোগীন্দ্র-হৃদয়ে! (কুরুক্ষেত্র—৫ম)

তথাপি আর্য-অভিমান ও প্রতিশোধস্পৃহা তাঁহাকে সেই দুর্বলতা হইতে বারে বারে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে। নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি কাব্যকাহিনীর উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় দুর্বাসা কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টিতে কম সহায়তা করেন নাই। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে জানিয়াও তিনি বাসুকিকে আর্যের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করেন, জরৎকারুকে যদুবংশ-ধ্বংসে নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য সাধনে এই অদম্য তৎপরতা তাঁহাকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার শক্তি দিয়াছে। Villain-চরিত্ররূপে তাঁহার পরিণামকে ভয়াবহ করিয়া তোলা হইলেও দেখা যায়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজ এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত অনমনীয় রাখার চেষ্টা হইয়াছে। এই দৃঢ়তাই দুর্বাসা-চরিত্রের দীপ্তি।

তবু মনে হয়, দুর্বাসা যেন—'More sinned against than sinning.' সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার মত চরিত্রের কোন মাধুর্যই তাঁহার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। বাসুকিকে অভিভূত করার জন্ত তাঁহার শিষ্ট-

সহায়তায় ভৌতিক-লীলার ছলনা আমাদিগকে পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'র কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বাসুকির জাতিগত অভিযোগ—বিজেতা আর্যজাতির বিরুদ্ধে বিজিত অনার্যজাতির উৎপীড়নের অভিযোগ; দুর্বাসার সহিত তাহার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য—একটি দলিত জাতির অভ্যুত্থান-প্রয়াস। তাহার ব্যক্তিগত অভিযোগ—সুভদ্রার পাণিলাভের আশায় সে কৃষ্ণকে মথুরাজয়ে সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু পরে কৃষ্ণের অসম্মতিতে তাহার সেই আশা ব্যর্থ হয়। এই বাসনার দাহ এবং অপমানই তাহাকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল। কিন্তু এই বিরুদ্ধতার মধ্যেও কৃষ্ণের মহত্ত্ব সে প্রথম হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। সুভদ্রা-লাভের জন্য হীন ষড়যন্ত্র ও লুণ্ঠনবৃত্তিতে অনার্যোচিত লোলুপতা এবং হিংস্রতা থাকিলেও সুভদ্রার প্রতি তাহার আগ্রহের তীব্রতা কম নয়। ষড়যন্ত্রে দুর্বাসার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও অন্তর হইতে দুর্বাসাকে সে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুদারতা এবং দম্ভের প্রতীক দুর্বাসার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সে ক্ষুব্ধও হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইসব ক্ষেত্রে তাহার আরণ্য-সরলতা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। 'শত্রুর অযথা নিন্দা' সে অধর্ম মনে করে, যাদব-শিবিরে সে সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছে, গুপ্ত অস্ত্রাঘাত করে নাই, কারণ 'বাসুকি দুর্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য বীর'। বিরোধী শক্তির অন্যতম আধার এই বাসুকি কিন্তু বিরোধের মধ্যপথেই প্রায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। 'রৈবতকে' কৃষ্ণ-মহিমা কিছুটা অনুভব করা সত্ত্বেও যেই বাসুকি অনার্য-রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ় সংকল্প, 'কুরুক্ষেত্রে' দেখি,—সে সংকল্প-বিষয়ে একান্ত সংশয়াচ্ছন্ন। জরৎ-কারুর দুঃখে বাসুকির কাতরোক্তি লক্ষণীয়—

ডুবিনু আপনি, আর ডুবাইনু তোরে
অনার্যের রাজ্যোদ্ধার দুরাশা-সাগরে,

* * *

বুঝিলাম আশামত্ত আমরা দুজন। (কুরুক্ষেত্র—৫ম)

'প্রভাসে' দুর্বাসার প্ররোচনায় যদুবংশধ্বংস-কার্যে নিয়োজিত থাকিলেও দেখা যায়—বাসুকি শুধু কৃষ্ণমহিমা নয়, কৃষ্ণপ্রেমেই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহার বিরোধমূলক কার্যে আর কিছুমাত্র তীব্রতা নাই 'রৈবতকেই'

দেখিয়াছি—আর্য কৃষ্ণকে অনার্যের শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে তাহার যেন কুণ্ঠা ছিল, কেননা কৃষ্ণের নবধর্ম যে প্রেম ও সাম্যমূলক—এই উপলব্ধি সে দুর্বাসাকে জানাইয়াছে—

শুনেছি যখন
সহচরগণ মধ্যে করিতে প্রচার
সে অপূর্ব নবধর্ম আনন্দে বিহ্বল,
ভাবিয়াছি নহে কৃষ্ণ মানব কখন।

*   *   *

বিশ্বব্যাপী সেই প্রেম, নীরদের মত,
বরষেন বাসুদেব প্রাণিমাত্র সবে,
অভিন্ন অনার্যে আর্যে সর্বত্র সমান। (রৈবতক—৪র্থ)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মধুর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাবে বাসুকির জাতিগত বিরুদ্ধতা যেন নিরবলম্ব হইয়া পড়িল। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে দুর্বাসা যখন তাহাকে অনার্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করে, তখন সে প্রায় হতোদ্যম। বরং কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাহার ব্যক্তিগত ক্ষোভের (সুভদ্রালাভে বাধা সৃষ্টির জন্য) তীব্রতাই তাহাকে যেন ষড়যন্ত্র-পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সেই সুভদ্রাকে অবশেষে মাতৃরূপে লাভ করিয়া তাহার যে স্বীকারোক্তি, তাহা হইতেই একথা স্পষ্ট হয়।

হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে!
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত,
কৌরব যাদবরক্তে করিয়াছি কর্দমিত
এই কর, এই আত্মা, সকলি লীলা তাঁহার।

(প্রভাস—১১শ)

শ্রীকৃষ্ণের এই 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—লীলাই বাসুকির চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আর সেই কারণেই বাসুকি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহ তুলনায় অধিক সক্রিয় এবং পরিস্ফুট। তাহাদের স্বভাবসুলভ আবেগ-বিহ্বলতাকেই যেন কবি প্রেমধর্মবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়াছেন।

সুভদ্রা সূচনা হইতেই দেবীরূপিণী, পরদুঃখমোচনে নিবেদিতপ্রাণা। শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অর্জুনের নিকট সুভদ্রার পরিচয় দেন—

যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে,
মূর্তিমতী শান্তিরূপা, অশ্রু যেইখানে
সেখানে ভদ্রার কর।
ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশুপক্ষী দরিদ্র ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার। (রৈবতক—২য়)

সুতরাং সুভদ্রা-চরিত্র অকস্মাৎ কুরুক্ষেত্রে সেবারূপিণীতে পরিণত হয় নাই, তাহার জন্য পূর্বেই ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। বরং 'রৈবতকে' বর্ণিত অর্জুনের সহিত তাহার প্রণয়লীলার বাহুল্য তাহার মৌল প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত হয় নাই। চাঞ্চল্যহীন, শৈথিল্যহীন তাহার চরিত্র শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সেবাময়ী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অনুরূপ ভূমিকায় চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সুলোচনার নিকট 'নারীধর্ম' ব্যাখ্যান-কালে আমরা তাহার জীবনের অত্যুজ্জ্বল আদর্শের আবেগময়ী বর্ণনা শুনিতে পাই—

না, দিদি!—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রুমিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই।
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার।
শত্রুমিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার। (কুরুক্ষেত্র—৩য়)

এই যে শত্রুমিত্র-অভেদে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ—ইহার পশ্চাতে যে উদার বিশ্বপ্রেম ও সর্বানুভূতির ভিত্তি থাকা স্বাভাবিক, তাহা সুভদ্রার আছে। যেহেতু সুভদ্রা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জীবনাদর্শের রূপমূর্তি নয়, সে নবীনচন্দ্রেরও মানসকন্যা, সেহেতু উনবিংশ শতাব্দীর সমন্বয়াত্মক

হিতবাদী জীবন-দর্শন সুভদ্রার চরিত্রের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবসেবার সূত্রে ভগবৎ-সেবা—এই জ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্ম-ভক্তিসাধনায় সুভদ্রা গীতা-প্রবক্তা মহামানবের যোগ্যা ভগিনীরূপে দীক্ষিতা হইয়াছে। পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে যখন অর্জুনও শোকে মুহ্যমান, তখন—

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে, কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়,
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার! (কুরুক্ষেত্র—১৫শ)

গীতার 'শোকেষু অনুদ্বিগ্নমনা, দুঃখেষু বিগতস্পৃহঃ'—আদর্শের এ যেন পরিপূর্ণ রূপ। একবার মাত্র হরণকালে তাহার মধ্যে বীরাঙ্গনা রমণীর শৌর্যের বিদ্যুৎ প্রকাশ দেখিতে পাই, নতুবা সর্বত্রই সে শান্তিস্বরূপিণী। আবার ইহাও সত্য যে, সুভদ্রা আদর্শ-চরিত্ররূপে শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু তাহাকে ঘেরিয়া পাঠকের মানবিক আগ্রহ-কৌতূহল জাগিয়া উঠে না, নিষ্কাম কর্মসাধনার মহা-সমুদ্রে তাহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ যেন মিলাইয়া গিয়াছে, 'প্রভাসের' শেষ দৃশ্যে তাহারই ইঙ্গিত পরিস্ফুট—

ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু, প্রভাস সিন্ধুর তীরে,
তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত।

তন্মধ্যে সুভদ্রা 'প্রীতির প্রতিমা স্থির'। সেই প্রতিমার বিসর্জন-গীতিও নিরাসক্ত কবিকণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে এইভাবে—

যাও মা মানবী-দেবী! পূর্ণব্রত মা! তোমার!

শৈলজা নবীনচন্দ্রের সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ-খ্যাপনে আর্য-অনার্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসের নিদর্শনরূপে কবি সুভদ্রার সহিত তাহাকেও উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং বিরোধী অনার্যশক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রথম হইতেই বিরোধের ক্ষেত্র হইতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। 'কুরুক্ষেত্রে' এবং 'প্রভাসে' সুভদ্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপযুক্ত চারিত্র-মহিমা যেমন 'রৈবতক'-এর দ্বিতীয় সর্গে কৃষ্ণমুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি শৈলজারও অনুরূপ ভূমিকার উপযোগী মানসগঠনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'রৈবতক'-এর নবম সর্গে। বাসুকি কর্তৃক পিতৃহন্তা

অর্জুনের ধ্বংস-সাধনে নিয়োজিত হইলেও তাহার অন্তরে ছিল শান্তির জন্ত ব্যাকুলতা। বাসুকির উদ্দেশ্যে তাই সে বলিতেছে—

কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিতে আপনি ভাই! ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিষ্ফল
তোমার জীবন ব্রত, আমার জীবন।
কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আসিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্রপুরে, যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ,—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার আধার; নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে। বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত মন্দাকিনী! হোক সব স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন।
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ। (রৈবতক—৯ম)

সুতরাং 'কুরুক্ষেত্রে' শৈলজার কৃষ্ণমহিমা-উপাসিকারূপে পরিবর্তন অতর্কিত-ভাবে আসে নাই। তাহার পুরুষবেশে অর্জুন-সেবা এবং ব্যাসাশ্রমে পুরুষশিষ্যরূপে প্রবেশকালে ব্যাসদেবের উক্তি—

মা আমার! নিরুপমা এই
জ্বলন্ত পাবক-শিখা পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।
(কুরুক্ষেত্র—১৩শ)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর নায়িকা শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শৈলের প্রেমে দুইটি স্তর,—অর্জুনের প্রতি তাহার অনুচ্ছ্বসিত গোপন প্রেম প্রথমে ছিল কামনা ও ঈর্ষায় সংকুচিত, তখন শুধু প্রেমাস্পদের নৈকট্যে শান্তি, তাহারই তৃপ্তিতে আনন্দ, তাহারই সেবায় সুখ। এই সকাম প্রেমের স্তর অতিক্রম করিয়া শৈল নিষ্কাম প্রেমের সন্ধান লাভ করিল। অর্জুন যেদিন তাহার সত্য পরিচয় লাভ করিয়া অনুশোচনার কশাঘাতে জর্জরিত হইতেছিল সেইদিন তাহার প্রণয়-বারিধির তরঙ্গ-সংক্ষোভ স্তব্ধ হইয়াছে, স্বেচ্ছায়

প্রণয়াস্পদকে ত্যাগ করিয়া যোগিনীর বেশে চলিয়াছে সে। সংসারের সমস্ত সম্পর্কের আলোকে দয়িতকে দেখা তখন তাহার পক্ষে যেন সম্ভব—

তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।
যেই রক্তবাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ!
খুঁজিলে এ অভাগীরে, পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জুন তাহার। (রৈবতক—১৭শ)

তথাপি এই আত্মবিলয়ের মধ্যেও প্রণয়-হতাশার ইঙ্গিত দিয়া নবীনচন্দ্র শৈলজার মধ্যে সাধারণ নারীর স্বাভাবিক কমনীয় দুর্বলতাটুকু দেখাইতে ভুলেন নাই। অর্জুনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের কালে—

লও এই ফুলমালা! রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা-হার,—ত্রিদিবভূষণ,—
শুকায়ে পড়িবে মালা, মালাদাত্রী হায়!
হয়ত বাসুকি-অস্ত্রে শুকাবে ধরায়। (ঐ)

শৈলের এই উক্তি কি নিস্পৃহ উদারতা না করুণ প্রণয়-ব্যর্থতা? গভীর অরণ্যে পার্থ-প্রতিমূর্তির আরাধনায় যেই প্রেম ভোগাতীত দেহাতীত স্বর্গীয় রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাতেও যেন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কামনা-স্পর্শ লাগিয়া যায়, শৈলজা পার্থের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করে, কারণ—

হয়নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা, সিদ্ধি তপস্যার,
কৃষ্ণার্জুন-পদ-তীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ। (কুরুক্ষেত্র—১৩শ)

অনার্যের মধ্যে শৈলজাই যে আর্য-মহিমা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, ইহা হীনমন্যতা (inferiority complex) নয়, পরাজয়-স্বীকৃতিও নয়; অর্জুন-সান্নিধ্য, ব্যাস-শিষ্যত্ব ও সুভদ্রা-সাহচর্য—অর্থাৎ দীর্ঘকালের আর্য-সংসর্গ তাহাকে সেই সুযোগ দিয়াছে। এইজন্য আর্য-অনার্যের সম্মিলনে মহাধর্মরাজ্য স্থাপনের অন্যতম অবলম্বনরূপে তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি—বিরোধী শক্তি-শিবির হইতে বহুপূর্বে তাহার স্বেচ্ছা-

বহিষ্কার তাহার অন্তরে জাতিবিদ্বেষের বীজ উপ্ত হইতে দেয় নাই। আততায়ীর হস্ত হইতে সুভদ্রাকে সে একবার প্রেমের মূল্যে, একবার আদর্শের মূল্যে রক্ষা করিয়াছে। ভক্তিমাধুর্যে ও কারুণ্যে শৈলজার চরিত্র মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

পরিহাস-চতুরা বাক্‌নিপুণা সুলোচনা সখীপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন। সকলের জীবনেরই সুখদুঃখের মুহূর্তগুলিকে সে রসে ও আনন্দে ভরিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহার নিজের অন্তরেই বিরাট শূন্যতা ও নৈরাশ্য বিরাজমান। বালবিধবা সে, তাহার সুগোপন অন্তরবেদনা কবি ফুলের উপমায় বড় করুণভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে।
আঁধারে আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুটে,
কাঁদি সারানিশি পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া।
মাটিতে রাখিয়া বুক
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনি মরিয়া। (রৈবতক—৫ম)

নিজের দুঃখের দ্বারা কাহাকেও সে আচ্ছন্ন করে না, অপরের সুখ লালন ও উপভোগ করিয়াই তাহার তৃপ্তি। কিন্তু মুখে ও ভাবে যাহাই সে প্রকাশ করুক না কেন—স্বর্গত স্বামীর স্মৃতিচিন্তনেই তাহার সব ক্ষোভ মিটিয়া যায়। মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব তাহার নির্বাপিত—তবু যে অতৃপ্ত যৌবনের বেদনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত বালবিধবার অন্তর দগ্ধ করে, তাহার কথা হৃদয়বান কবির একটিমাত্র ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যভামা কর্তৃক অর্জুনের হস্তে সুভদ্রা-সমর্পণের সময়ে হাসিকান্নাভরা মুখে সুলোচনা শুভকামনা জানাইয়াছে. আর এই শুভঘটনার বার্তা ঘোষণা করিতে গিয়া—

হাসি হাসি সুলোচনা কহে—'প্রাণ ভরি,
মহিষী! বাজাই তবে শাঁখ একবার।'
কত ফুঁ, তথাপি শাঁখ বাজিল না ভাল,
কি যেন রোধিল চারু-কণ্ঠ বাদিত্রীর। (রৈবতক—১৬শ)

সুভদ্রার সৌভাগ্যসূচনার মুহূর্তে আপন বঞ্চিত জীবনের স্মৃতিমথিত দীর্ঘশ্বাসেই কি তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছিল ?

সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুকে নিজ অতৃপ্ত সন্তান-বাৎসল্যে অভিষিক্ত করিয়া আপন বক্ষে গ্রহণ করিতে পারিয়া সে তৃপ্ত হইয়াছে, কেননা তাহার কামনাও স্বল্প ; বিশ্বহিত, লোককল্যাণ, নিষ্কামকর্ম সে বোঝে না। তাহার মুখে কোন উচ্চ আদর্শের কথাও শোনা যায় নাই ; তাহার প্রেম, স্নেহ, আনন্দ, দুঃখ সবই গার্হস্থ্য-রসময়, সীমিত অথচ সজীব। তাই পরের সন্তান অভিমন্যুকে ঘিরিয়া তাহার অপত্যসুধা ক্ষরণ, আশঙ্কা-উদ্বেগের বাত্যাবিক্ষোভ, পরিশেষে অভিমন্যুর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার ইহলীলা সংবরণ—ইহার মধ্যে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর মহান আদর্শের প্রতিফলনের চাইতেও বেশী উজ্জ্বল করিয়া দেখিতে পাই আমাদের গৃহ-সংসারের অত্যাগ-সহনা স্নেহ-দুর্বলা চিরদুঃখভাগিনী সামান্যা রমণীর হৃদয়কে, যে কখনো—

হাসে নাই নিজ সুখে, কাঁদে নাই নিজ দুঃখে,
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত। (কুরুক্ষেত্র—১৬শ)

সামান্যা রমণী হইয়াও অসামান্যারূপে সুলোচনার প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুভদ্রার মত আদর্শ-চরিত্রের পার্শ্বে তাহাকে স্থাপন করিয়া নবীনচন্দ্র বুঝি বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই একই উদ্দেশ্য-সাধনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য ত্যাগের মহিমা ঘোষণা। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দু'-প্রভৃতি চরিত্রে যে পরপুত্রবাৎসল্য দেখিতে পাই, তাহার বীজ কি সুলোচনা-চরিত্রে কিছুটা সন্ধান করা যায় না ?

যৌবনচঞ্চলা নারীর কামনা-বাসনা, দুর্বার হৃদয়াবেগ, অপরিতৃপ্তি, প্রতিহিংসা ও ব্যর্থতার বিচিত্র সমাবেশে রক্তমাংসে গড়া একমাত্র মানুষী চরিত্র জরৎকারু। কৃষ্ণপ্রণয়মুগ্ধা জরৎকারুকে উদ্গত প্রেমের চরম পুরস্কার লাভ করিয়াই হারাইতে হইল বলিয়া তাহার পিপাসা অনন্ত, জ্বালা বিষময় ; দলিতা ফণিনী রুদ্ধক্ষোভে বিরূপ প্রণয়াস্পদকে দংশন করিয়া জলিয়া পুড়িয়া নিজেকে ভস্ম করিবার আত্মঘাতী পথ ধরিল। শৈলজার ন্যায় প্রেমকে সম্ভোগবাসনা হইতে সরাইয়া স্বর্গরাজ্যে উন্নীত করিবার মত সুস্থির বিবেক

সে লাভ করে নাই। তাই দুর্বাসার ষড়যন্ত্রে নিজেকে সে ইন্ধন করিয়াছে শুধুমাত্র প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ লইবার জন্য। দুর্বাসার সহিত তাহার প্রেমহীন পরিণয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ছলনামাত্র, তাই জরৎকারু প্রবল বিতৃষ্ণায় বলে—

দুর্বাসা আমার নহে পতি,
আমি পত্নী নহি দুর্বাসার,
উভয়ে উভয়ে মাত্র দেখি—
উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার। (কুরুক্ষেত্র—৭ম)

প্রিয়তমকে লাভ করার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরে তখনও জাগ্রত। তাই বিশ্বপ্রেমের প্রতিমূর্তি সুভদ্রা যখন বিশ্বদেবতার রূপ ও অনন্ত প্রেমের নিকট স্থূল পার্থিব প্রেমের অকিঞ্চিৎকরতার কথা জরৎকারুকে শুনাইয়া তাহার উন্মত্ত চিত্ত শান্ত করিতে প্রয়াস পায়, তখন হতভাগিনী নাগেন্দ্রনন্দিনীর উত্তরে কামনা-বাসনা-মথিত মানব-হৃদয়েরই উষ্ণশ্বাস নির্গত হইয়া পড়ে,—

হায়! এক বিন্দু বারি দেখিল না যেইজন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহা পারাবার?
হায়রে! যাহার প্রেম অঙ্কুরে পুড়িয়া গেল,
সে অনন্ত প্রেমে দিবে কেমনে সাঁতার? (কুরুক্ষেত্র—৮ম)

সুভদ্রা যখন ঋষিপত্নীকে পতিপ্রেমের আদর্শ স্মরণ করাইয়া দেয়, তখন জরৎকারু সেই মিথ্যা সম্পর্কের উল্লেখে অট্টহাস্য করিয়া উঠে, জানায় তাহার জলন্ত প্রণয়-বিশ্বাসের কথা—

আগুন ঋষির মুখে! পতি মম সেইজন—
জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।
তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণও পারিবে না
জীয়ন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার।
অভাগিনী সূর্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
অন্যদিকে তবু নাহি দেখে একবার।
হায়! সূর্যমুখী মত চাহি সেই রবিপানে
এরূপে জীবন-বৃন্তে যাব শুকাইয়া।
আর—নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া। (ঐ)

এই দংশন-সংকল্পই তাহাকে আর্য-বিরুদ্ধতায় সর্বাধিক সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। বাসুকি বরং মধ্যপথে বিরোধের উদ্যম হারাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জরৎকারু নিজ সংকল্পসিদ্ধির জন্য বিরূপ স্বামীর নির্দেশে রূপের আগুনে যদুকুল দগ্ধ করিয়াছে, দুর্বাসার ভৌতিক ছলনারহস্য জানিয়াও সরলপ্রাণ ভ্রাতা বাসুকির নিকট উহা পূর্বে ব্যক্ত করে নাই শুধুমাত্র তাহাকে কৃষ্ণ-বিরুদ্ধতায় উদ্দীপ্ত রাখার জন্য। এমন কি সে কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল বাসুকিকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে—'ভুলিলে কি দাদা! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার!' (প্রভাস—৮ম) অন্তরে অন্তরে কারুও কৃষ্ণময়, কিন্তু কৃষ্ণ কারুর নিকট 'নারায়ণ-পতিতপাবন' নহেন, রূপমুগ্ধা কারু বলে—

এই জানি—তুমি মম জীবন মরণ।
তুমি নয়নের আভা,—তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল! (প্রভাস—৯ম)

এখানে জরৎকারুকে 'গোপীপ্রেমের' প্রতিমূর্তিরূপে উপস্থাপিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার উত্তরে বৈষ্ণব-ভাবপ্রবণ কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—"জরৎকারুর দোষ সে দুর্বাসার পত্নী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমিকা। কিন্তু ব্রজগোপীদের কি স্বামী ছিল না, অথচ তাহারা কি কৃষ্ণপ্রেমিকা ছিল না?" আবার ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় জরৎকারুর মোহে একটু intellectuality and spirituality মিশাইবার প্রয়োজন বোধ করায় নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"তাহার চরিত্রে আধ্যাত্মি-কতা ঢালিতে গেলে সুভদ্রা ও শৈলজার সহিত তাঁহার চরিত্র অভিন্ন হইয়া পার্থক্যহীন হইবে।"[২২] সেই কারণেই তাহার মধ্যে প্রণয়-বঞ্চিতা রমণীর প্রতিশোধ-স্পৃহা শেষ পর্যন্ত জাগ্রত রাখিয়া অনার্যার পক্ষে স্বাভাবিক ক্রোধোন্মত্ততার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। তাই নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের যোগীমূর্তি নিরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অভিভূতা কারুর মনে পড়িল—

প্রত্যাখ্যান!—সে প্রতিজ্ঞা!—গর্জিয়া উঠিল জ্বলি
নির্বাপিত প্রায় সেই নারী অভিমান।
ছুটিল কারুর শর,—হায় উন্মাদিনী কারু!— (ঐ)

'মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া'—সংকল্প সিদ্ধ হইল। শরবিদ্ধ কৃষ্ণের বক্ষে মাথা রাখিয়া প্রণয়ের অন্তিম আস্বাদে সে ধন্য হইল। কারুর ক্ষেত্রেও 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' এই বাণী কবি সার্থক করিতে চাহিয়াছেন। বাসুকির ন্যায় জরৎকারুও শত্রুভাবে ভগবানকে পাইতে চাহিয়াছিল। উভয় চরিত্রই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বটে, তবে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বে কারু-চরিত্র ঐ আদর্শবদ্ধতার মধ্যেও সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জরৎকারুর জীবন জীবন্ত প্রণয়ের শোচনীয় ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস। তাহার আত্মহৃদয়-উদ্ঘাটন-ব্যাকুলতায় আধুনিক রোমান্সের দ্বন্দ্বসংকুল নায়িকারূপ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও আমরা অন্যত্র (১৪৯ পৃঃ দ্রঃ) বলিয়াছি—মহাকাব্যে এই ধরণের বিশ্লেষণ একেবারে নূতন নয়। Virgil-এর আদর্শ নায়ক Aeneas-চরিত্রের তুলনায় রাণী Didoর বাসনাক্ষুব্ধ চরিত্র যেমন পাঠকের নিকট অধিক প্রিয়[৩০], তেমনি কৃষ্ণচরিত্রের তুলনায় জরৎকারু-চরিত্রও আমাদের মনে অনেক বেশী উত্তাপ এবং বেদনা সঞ্চার করে। নবীনচন্দ্র এযুগে জরৎকারুর মধ্য দিয়াই কাব্য ও উপন্যাসের সমন্বয় করিয়াছেন। বঙ্কিমের শৈবলিনী-চরিত্র কি নবীনচন্দ্রের স্মরণ ছিল? আবার শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর অস্পষ্ট পূর্বরূপ কি এখানে লক্ষ্য করা চলে না?

একটি কথা—নবীনচন্দ্রের কবিমর্মের মধ্যে এমন এক বৈষ্ণবী ভাবরস নিহিত ছিল যে, তাঁহার অঙ্কিত বিরুদ্ধপক্ষের দুইটি নারীচরিত্রই অবশেষে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে—শৈলজা-জরৎকারুর ব্যর্থ জীবনে ইহাই কি সান্ত্বনা? অপরিতৃপ্ত সংক্ষুব্ধ মনের ইহাই কি নিরাপদ আশ্রয়ভূমি? কিন্তু এই চরিত্রসমূহ সৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে উহাদিগকে মূল পরিকল্পনার সহিত সুসংগতই মনে হইবে।

৬

নবীনচন্দ্রের কাব্য যে শিল্পসৃষ্টি মাত্র নয়, বরং গভীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রণোদিত (ethical), তাহা প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ শুধু রাষ্ট্রসংগঠক নহেন, তিনি যোগদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শনিয়ামক, উদার বিশ্বপ্রেমিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বিচিত্র কর্মের সহিত তাঁহার আদর্শ এবং বাণীর প্রভাবও কাব্যে সঙ্গত-

ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাস-মহাভারতেও 'গীতা'-অধ্যায়ের সংযুক্তি এই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ সেই গীতা-আদর্শের উদাত্ত সুরেই তাঁহার কাব্যের গম্ভীর মধুর আবহ রচনা করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন ও জীবন-নীতির এই উন্নত পরিবেশটুকু সৃষ্টি করিয়া না লইলে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-নেতৃত্ব বর্ণনার অবলম্বন দুর্বল হইয়া পড়িত। মধুসূদনের 'রাবণে'র জন্য এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্র' বা 'ইন্দ্রের' জন্য এইরূপ অধ্যাত্ম-পরিবেশ প্রয়োজন হয় নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য ঐ অধ্যাত্ম-ভিত্তিকে উপেক্ষা করিয়া রসবস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, তাঁহার মূল পরিকল্পনা, ঘটনানির্বাচন, চরিত্রচিত্রণ—সবই এক আদর্শসূত্রে বিধৃত। সেই শাশ্বত আদর্শের সহিত আবার উনবিংশ শতাব্দীর নানা প্রবল আদর্শ মিশিয়া গিয়াছে, এবং যুগসচেতন কবি নবীনচন্দ্র তাহার প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ-ব্যাখানের উদ্দেশ্যে উপন্যাসে (দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম) নিষ্কাম কর্ম, অনুশীলন তত্ত্ব প্রভৃতির অবতারণা দ্বারা, এবং নবীনচন্দ্র আখ্যায়িকা-কাব্যে বিচিত্র দার্শনিক তত্ত্বের কবিত্বপূর্ণ উপস্থাপনা দ্বারা আমাদের রসসাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মূলতঃ জীবনেরই গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত, জীবন ও দর্শন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, কাব্য সেই 'জীবনের সমালোচনা' বা প্রতিচ্ছবি। তাই দেখি, জীবনের গভীরতর রহস্যনিমগ্ন-কবিদৃষ্টিতে দর্শন, বিজ্ঞান ও কাব্য একই রসালোকে উদ্‌ভাসিত হয়; পাঠককেও সেই রসোপলব্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদী জীবনভাবনার যুগে তো বটেই, বিংশ শতাব্দীর ব্যাপক বস্তুতন্ত্রতার যুগেও দেখি, দর্শন ও কাব্যের সুন্দর সমন্বয় সাহিত্যে নানাভাবে ঘটিতেছে। তাই বুঝি ম্যাথু আর্নল্ড একদা আশা করিয়াছিলেন—"Most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry."[৪]

যাহা হোক, নবীনচন্দ্রের কাব্যে তত্ত্বরসের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, 'কুরুক্ষেত্রে' গীতা-তত্ত্বালোচনার আধিক্য এবং 'প্রভাসে' ভক্তিতত্ত্বের প্রাবল্য কাহিনীর গতিকে কখনো কখনো রুদ্ধ করিয়াছে, তথাপি প্রথম হইতেই কাব্যের উচ্চগ্রামে বাঁধা সুর অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের সহিত সুসঙ্গত তত্ত্বসমূহ যথাযোগ্যস্থানে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'গীতা'র জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি

আদর্শকে যথাক্রমে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর ব্যাপক পটভূমিকারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তথাপি কর্মযোগের আদর্শকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিয়া নবীনচন্দ্র যেমন যুগধর্মোপযোগী কর্মমহিমাকে স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি গীতার মূল সুরও রক্ষা করিয়াছেন; কেননা, গীতায়ও কর্মবিবিক্ত জ্ঞান ও ভক্তিকে প্রশংসা করা হয় নাই। 'রৈবতকে' কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

বিশ্বরাজ্য কর দৃষ্টি, সর্বত্র সার্থক সৃষ্টি
কিবা কীট, কি পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সলিল,
আকাশ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অনল, অনিল।
সেই অর্থ মূলধর্ম, তাহার সাধন কর্ম,
যার যত উচ্চ শক্তি, তত গুরুতর
কর্ম তার দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর। (১৭শ সর্গ)

'কুরুক্ষেত্রে' সুভদ্রা অভিমন্যুকে উপদেশ দিতেছে—

স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম সনাতন। (৪র্থ সর্গ)

'প্রভাসে' ব্যাসদেব অর্জুনকে বলিতেছেন—

কর কর্ম, এই গতি কর অনুসার—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর। (১২ সর্গ)

এই কর্মানুষ্ঠানের গৌরবেই—

মানব! চেতনাযুক্ত, বিবেকী স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট, যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চালিত এই বিশ্বচরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে তাহার। (রৈবতক-১ম সর্গ)

যুগধর্মের অনুকূল এই জ্ঞানসমৃদ্ধ 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত মানুষের জয়গান সেই যুগে নবীনচন্দ্রের কণ্ঠেই যেন স্পষ্টভাবে শোনা গিয়াছিল। তাই বলিয়া আস্তিক-কবি ভারতীয় দর্শনের বড় কথা অদৃষ্টবাদকেও একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, এবং কাব্যঘটনার মধ্যে তাহার ক্রিয়াও দেখাইয়াছেন। ব্যাস কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

দুই অনন্ত জগৎ;—
মানস ও জড় সৃষ্টি,—রয়েছে পড়িয়া।

ক্ষীণ প্রাণ ক্ষুদ্র নর, খদ্যোতের মত,
একটি বালুকা নাহি পারে দেখিবারে,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে,
সেই দুই অনন্তের। রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব-রত্নরাশি গর্ভে উভয়ের,—
অদৃষ্ট তাহার নাম, মানিবে না কেন?
মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত। (রৈবতক—৩য় সর্গ)

কিন্তু ওই অদৃষ্ট মানিয়াই কর্মপরায়ণ মানুষ স্তব্ধ হইয়া যাইবে না,—

দেখিবে কর্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে,—
সেই ধর্ম, সেই পুণ্য ; চল সেই পথে।
(রৈবতক - ৩য় সর্গ)

বিশ্বাসী কবির নিকট 'বিবর্তন' শুধু ভগবৎলীলাই নয়, তাহাও কর্মের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত—

কেন এই বিবর্তন?— কেন এ সংসার?
তাঁর মায়া, তাঁর ছায়া, প্রকৃতি তাঁহার।
এই বিবর্তন গতি,— জগৎ-মঙ্গল,—
অনুকূলে প্রতিকূলে কর্ম অনুসার
ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য। (প্রভাস—১২শ সর্গ)

আবার এই বিবর্তনও কবির নিকট তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা—

এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
* * *
চারিদিকে উন্নতির বিবর্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া!
চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল। (কুরুক্ষেত্র—১৬শ সর্গ)

সর্বব্যাপী এই উন্নতিতে কবির আস্থাও অন্যতম যুগধর্ম, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (২৩ পৃঃ দ্রঃ)। এই উন্নতির মূল লক্ষ্য যে পূর্ণতা (perfection) তাহা কৃষ্ণমুখে ব্যক্ত—

অপূর্ণ আমরা, প্রভো! যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে; লব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে।

(রৈবতক—১২শ সর্গ)

বিবর্তন-প্রসঙ্গে যে 'জগৎমঙ্গল' ও 'মানবমঙ্গল'-সাধনের আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও যুগ ভাবনাসম্মত। Utilitarianism বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম হিতসাধন'-আদর্শ ('চতুরঙ্গ') মানবতা আদর্শের মতই সে যুগে নবীনচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সুভদ্রা-চরিত্রটিই তো লোকহিতাকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। এই লোকহিতসাধনকে কাব্যে সকল শাস্ত্র ও ধর্মের উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে—

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম, যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম,
ধর্ম কৃষ্ণ! সর্বভূতহিত। (কুরুক্ষেত্র-১২শ সর্গ)

সেই সঙ্গে 'গীতা'র লোকসংগ্রহ'-আদর্শও নবীনচন্দ্রকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। আবার বৈরাগ্য-বিমুখ রবীন্দ্রনাথ যে সংসারাশ্রয়ী জীবননির্ভর মুক্তিসাধনার কথা আমাদের কাছে বিচিত্রভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের মধ্যে পূর্বেই তদ্রূপ দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাইয়া তাঁহার উপলব্ধির অভিনবত্বে অভিভূত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

কখনো বৈরাগ্যঘোর ভাসিয়া উঠিত প্রাণে
ভাবিতাম ত্যজিয়ে সংসার
সন্ন্যাস গ্রহণ করি করিব নির্বাণ দুঃখ,
নবধর্ম করিয়া প্রচার।
কিন্তু দেখিলাম উর্ধ্বে দেখিলাম চারিদিকে,
কি জগৎ অনন্ত বিস্তার।
সুখ-সৌন্দর্যেতে ভরা, কর্মের সঙ্গীতে পূর্ণ,
কি উচ্চ অচিন্ত্য লয় তার।

* * *

পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ এই ধর্ম-পথে
কিবা অবলম্বন সুন্দর!
তাহে ভর করি উঠি দেখ সুখ-স্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।

চলিলাম গৃহে, প্রভু! মানবের ধর্মক্ষেত্র
করি গৃহ অভ্যন্তরে বাস,
কামনা জগৎ-হিত, সাধনা জগৎ-হিত,
বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস। (কুরুক্ষেত্র-১২শ সর্গ)

নবীনচন্দ্রের এই বিশ্বমুখী জীবনদৃষ্টির আলোকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রোজ্জ্বল। মনুষ্যত্বের যে বিশ্লেষণ নবীনচন্দ্র করিয়াছেন, তাহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'-তত্ত্বের সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব! যেই নীতিচয়
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,
—মানবের মানবত্ব,—করিছে ধারণ,
তাহাই মানবধর্ম। (কুরুক্ষেত্র ১৩শ সর্গ)

এইরূপ বহু দার্শনিক-তত্ত্ব ও জীবন-নীতির কাব্যিক উপস্থাপনা কাব্য-ত্রয়ীতে দৃষ্ট হইবে। নবীনচন্দ্রের সহৃদয় কবিপ্রাণতার প্রসাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত তত্ত্ববস্তুর শুষ্কতা গভীর উপলব্ধি-রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কতিপয় দার্শনিক তত্ত্ব ও মহান আদর্শের উল্লেখমাত্র এখানে করিলাম, যাহা হইতে নবীনচন্দ্রের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ কবির আন্তরিক বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা করা চলে। আবার বলি—এই দর্শন-অংশ নবীনচন্দ্রের বিশাল পরিকল্পনার রূপায়ণে অপরিহার্য, স্থানে স্থানে বাহুল্যপূর্ণ হইলেও উহা অবান্তর নয়।

নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীকে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নানা বৈশিষ্ট্য-বিচারে ভিন্ন প্রকৃতির 'মহাকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই অধ্যায়েও নানাভাবে বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা উক্ত কাব্যের সেই ভিন্ন প্রকৃতির স্বরূপ, তাহার মৌলিকতা এবং অভিনবত্ব বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইলাম। দেখিলাম, কবির কাব্য-উপস্থাপনায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন দুর্লক্ষ্য নয়, তেমনি তাঁহার কল্পনাসমুন্নতি এবং কাব্যদীপ্তিও উপেক্ষণীয় নয়।

সূত্র-নির্দেশ

১। আমার জীবন, ৪র্থ, ১১৮-১২৩ পৃঃ।

২। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২০০ পৃঃ।

৩। Principles of Literary Criticism—L. Abercrombie.

৪। আমার জীবন—৪র্থ, ২৮২-৮৩ পৃঃ; ও ৫ম, ১২০ পৃঃ।

৫। ঐ, ৫ম, ১২০-২২ পৃঃ।

৬। 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনা—নব্যভারত, কার্তিক, ১৩০০।

৭। 'কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত'—সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩০০।

৮। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের' আলোচনা—বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৮১।

৯। আমার জীবন, ৪র্থ, ৩১৬ পৃঃ ও ১২১ পৃঃ।

১০। 'কৃষ্ণচরিত্র'—প্রচার, আশ্বিন, ১২৯১।

১১। 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা—সাধনা, মাঘ, ১৩০১, রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' দ্রঃ।

১২। আমার জীবন, ৪র্থ, ৩২৭ পৃঃ;

১৩। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন, ১২০ পৃঃ; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১১৩ পৃঃ।

১৪। আচার্য কেশবচন্দ্র, ২য় ভাগ—গৌরগোবিন্দ রায়।

১৫। 'এক আধারে নরনারীপ্রকৃতির মিলন'—সেবকের নিবেদন, ৩রা অক্টোবর, ১৮৮০; 'Avatars', Indian and Western—The Sunday Mirror, 14 Aug, 1881; Krishna's transfiguration and incarnation—The New Dispensation, 22 Aug. 1915.

১৬। ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা ('ভক্তিধর্মের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত' অধ্যায়)—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

১৭। শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম (অবতরণিকা)—গৌরগোবিন্দ রায়।

১৮। ১০ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ তারিখের পত্র—আমার জীবন, ৪র্থ, ১২৫-২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৯। আমার জীবন, ৪র্থ, ১৩০ পৃঃ।

২০। ঐ ১২৭-২৮ পৃঃ।

২১। ঐ ১২৮-২৯ পৃঃ।

২২। ঐ ১৩০ পৃঃ।

২৩। A History of Modern Times—D. M. Ketelbey, p. 173.

২৪। কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ; এবং ৫ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ—বঙ্কিমচন্দ্র।

২৫। The Cambridge History of India, vol. I—Ed. by J. Rapson p. 134.

২৬। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮শ, ৪২৭ পৃঃ।

২৭। The History and Culture of the Indian People, vol. I—Ed. by Dr. R. C. Majumdar, p. 313.

২৮। The Classical Tradition—Gilbert Highet, p. 271.

২৯। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২০৭-২০৮ পৃঃ।

৩০। কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ—বঙ্কিমচন্দ্র।

৩১। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, ৬৯।২৪।

৩২। আমার জীবন, ৩য়, ২৩০ পৃঃ।

৩৩। ঐ, ৪র্থ, ১২৭ পৃঃ।

৩৪। ঐ, ঐ, ২২৬ পৃঃ।

৩৫। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২১৫ পৃঃ।

৩৬। আমার জীবন, ৪র্থ, ১২১-২২ পৃঃ।

৩৭। ঐ, ৫ম, ১২০ পৃঃ।

৩৮। মহাভারত, মৌষলপর্ব, ৪র্থ অধ্যায়।

৩৯। ঐ, মহাপ্রস্থানক পর্ব, ১ম অধ্যায়।

৪০। পত্র এবং সমালোচনা—উভয়ই 'আমার জীবন' ৫ম, ১৩১ ও ১৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪১। 'প্রভাস'-কাব্যে (এম. এল, দে সং) শ্রীকমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা।

৪২। কৃষ্ণচরিত্র, ১ম খণ্ড, ১ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদ—বঙ্কিমচন্দ্র।

৪৩। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২২৫ পৃঃ।

৪৪। The Epic—L. Abercrombie. p, 48.

৪৫। আমার জীবন, ৪র্থ, ১২৩ পৃঃ।

৪৬। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, ৪৩।১৪।

৪৭। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২২৯ পৃঃ।

৪৮। The Classical Background of English Literature—J. A. K. Thomson, p. 51.

৪৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়—ডাঃ সুকুমার সেন, ৩৩৭ পৃঃ, এবং আধুনিক বাংলাকাব্য —তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ২৩৬ পৃঃ।

৫০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত, ১৭৩ পৃঃ।

৫১। নব-পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, ১৬১ পৃঃ।

৫২। আমার জীবন, ৪র্থ, ২৮৪ ও ২৯৭ পৃঃ।

৫৩। 'Many readers have been repelled by the rather frigid character of Aeneas and find their sympathy turning to passionate Dido'—Introduction by W.C. Mcdermott in Virgil's Works. (Modern Library edition).

৫৪। Essays in Criticism (2nd series)—Matthew Arnold, p. 2.

অনুবাদ-কাব্য

১৮৮৭ সালে 'রৈবতক' প্রকাশের পর এবং ১৮৯১ সালে 'খৃষ্ট' প্রকাশের পূর্ববর্ত্তী সময়ের মধ্যে নবীনচন্দ্র 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর' পদ্যানুবাদ রচনা করেন। এই অনুবাদ-কাব্যদ্বয় কবির প্রতিভার পরিচয় কিছুই বহন করে না। তবে তাঁহার অধ্যাত্ম-প্রবণতার (spiritual inclination) সাক্ষ্য হিসাবে উহারা উল্লেখযোগ্য। 'রৈবতক' হইতে কবির বীণা যে সুরে বাঁধা হইল এবং শেষ পর্যন্ত তাহা যে সুরে ঝঙ্কৃত হইল, সেখানে 'অবকাশরঞ্জিনী'-'ক্লিওপেট্রার' প্রণয়বিষাদ এবং 'পলাশির যুদ্ধ'-'রঙ্গমতীর' শৌর্যনিনাদ আর একান্তভাবে বাজে না; উচ্ছ্বসিত নবীনচন্দ্রের রোমান্স ও সিভাল্‌রি-প্রবণতা পরিণত নবীনচন্দ্রের ভক্তিমহিমা ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আমাদের দুই যুগ-প্রতিভূর সাধন-পরিণাম যেন প্রায় একরূপ; কবি বঙ্কিম এবং কবি নবীনের শেষ আশ্রয় অধ্যাত্মতত্ত্বের গহনতায়, ভক্তিরসের অতলতায়।

(ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় নাই। 'আমার জীবন'—৪র্থ ভাগ হইতে জানা যায়, উহা ১৮৮৯ সালের শেষদিকে প্রকাশিত হয়। উহার দুই বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতার' গদ্যানুবাদ তাঁহারই টীকাসহ প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—'রৈবতক' রচনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি গীতা পাঠ করেন নাই। গীতাপাঠের ফলেই কৃষ্ণভক্তি এবং নিষ্কাম জীবনাদর্শ তাঁহার মধ্যে দৃঢ়মূল হইতে থাকে, এবং তিনি উহার কাব্যানুবাদে তৎপর হন। তিনি বলিয়াছেন—"উহাতে আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। মূল সংস্কৃতের যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছি মাত্র।" কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্ম মানস-গঠনে এবং ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুধ্যানে এই অধ্যয়ন এবং অনুবাদ-প্রয়াস যে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' পরিস্ফুট, গীতানুবাদের সুদীর্ঘ গদ্যে-রচিত 'বক্তব্যে' তিনি গীতার যে মর্মবাণী অধ্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ

করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার উপলব্ধির প্রগাঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের—নির্বাণ।" এই অনুবাদের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নাই।

(খ) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর' পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। এই অনুবাদ-কাব্য সম্পর্কে 'আমার জীবন'—৫ম ভাগে উল্লেখমাত্র ব্যতীত অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন—"রৈবতকের মত 'কুরুক্ষেত্র' শেষ করিয়াও উহা কিরূপে গৃহীত হয় দেখিবার অপেক্ষায় 'প্রভাসে' হাত দিলাম না। এই অবসর সময়ে চণ্ডীর অনুবাদ.........রচনা ও প্রকাশ করি।" এখানে সময়োল্লেখে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। সুতরাং নবীনচন্দ্রের বক্তব্যানুযায়ী 'কুরুক্ষেত্রের' পরে 'চণ্ডী' রচনা হইতে পারে না। সম্ভবতঃ বিশ বৎসর পরে প্রবাসে বসিয়া স্মৃতিচারণকালে নবীনচন্দ্র গ্রন্থরচনার পৌর্বাপর্ব ঠিক স্মরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই অনুবাদ-কার্যে নবীনচন্দ্র 'গীতার' মত কোন আন্তরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হোক্, ইহার সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য-অংশ 'আভাষ' বা ভূমিকা। গীতানুবাদের মতই চণ্ডী-অনুবাদের প্রারম্ভে 'মাহাত্ম্য' বা অধ্যায়-অনুসারে গদ্যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ গীতার মত ভাবগম্ভীর নহে। কৌতুক-রসাশ্রিত 'কমলাকান্তীয়' গদ্যভাষাভঙ্গিতে 'চণ্ডীর' মাহাত্ম্য-বিশ্লেষণ আমাদের নিকট নবীনচন্দ্রের সেই রসিক-চিত্তটিই উন্মোচিত করে, যাহার স্পর্শে পরবর্তী কালে রচিত 'প্রবাসের পত্র' এবং 'আমার জীবন' এমন রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গদ্যরচনাক্ষেত্রে নিজ প্রতিভা নিয়োজিত করিলেও যে নবীনচন্দ্র সাফল্য অর্জন করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভিন্ন অধ্যায়ে নবীনচন্দ্রের গদ্য-রচনা সম্পর্কে আলোচনাকালে 'চণ্ডী'র ভূমিকার কথাও বলা হইবে।

একথা সত্য যে অনুবাদ নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র নহে। কাব্যবিষয়কে নিজ ভাবনানুরূপে সঙ্কোচন, প্রসারণ বা পুনর্গঠন করিতে না পারিলে নবীনচন্দ্রের কাব্যস্ফূর্তি বাধা পায়। 'জীবনীকাব্যের'

আলোচনাকালে আমরা দেখিব—'খৃষ্ট' অনুবাদ-মাত্র হওয়ায় এবং 'অমিতাভ' ও 'অমৃতাভ' মৌলিক-কাব্য হওয়ায় তাহাদের রস-পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। এতদ্‌ভিন্ন সাহিত্যরস সৃষ্টির আনন্দে নবীনচন্দ্র যদি কোন সৌন্দর্যরসপূর্ণ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত বা তাঁহার ভাষা ও ছন্দ লীলাবিলাসের একটি উপযুক্ত অবলম্বন পাইত, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ 'গীতা' ও 'চণ্ডী'তে নবীনচন্দ্রের সেই সুযোগ কোথায়? তা' ছাড়া অনুবাদ-বিষয়ে নবীনচন্দ্রের বিশেষ কোন উদ্যমও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

(গ) নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন

কোনো সংস্কৃত কাব্য অবলম্বন করিয়া নবীনচন্দ্র নিজ অনুবাদ-ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই বটে, কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যরচনার সমসাময়িক কালেই তিনি একবার সেক্সপীয়রের 'Mid Summer Night's Dream' নাটকের মর্মানুবাদ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র উহার তিনটি অঙ্ক মাত্র অনুবাদ করেন, অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করেন মোহিতগোপাল লাহিড়ী। এই সম্পর্কে লাহিড়ী মহাশয় বলেন—"বড় গুরুভার মস্তকে লওয়া হইয়াছে, 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্নে'র পরিসমাপ্তিভার গ্রহণ করিয়াছি। একে মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রণীত নাটকের বিদেশীয় ভাবমূলক গভীরতাপূর্ণ ভাষার অনুবাদ, তাহাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের অনুকরণ—বড় অভাবনীয় কঠিন কার্য।"

এই বিখ্যাত নাটকের মর্মানুবাদ কাব্যগুণান্বিত হইবারই কথা। নবীনচন্দ্রের অনুবাদের স্থানে স্থানে কাব্যদীপ্তি যে প্রকাশ পায় নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি উহা সম্পূর্ণ করিবার উৎসাহই বোধ করেন নাই। শুধু তাহা নহে, এই অনুবাদের সার্থকতা সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন; কেন না উহা কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই, কেবলমাত্র নবীনচন্দ্রের তিরোধানের পরে ১৩১৭—১৩১৯ সালের 'মানসী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ আত্মজীবনী 'আমার জীবনে'র কোথাও এই অনুবাদ-কার্যের উল্লেখ নাই। অথচ উহার রচনাকাল তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন যুগ, শক্তি নিঃশেষিত তো নয়ই, বরং পরবর্তী 'অমিতাভ' কাব্যে (১৩০২) আরও সুস্থির, সমাহিত।

সে যুগে বাঙ্গালাদেশে সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাব ছিল সমধিক। ১৮৪৮ (?) সালে গুরুদাস হাজরার 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' সেক্সপীয়রের অনুসরণ-পথ মুক্ত করিয়া দেয়। হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের নাট্যানুবাদ করিতে গিয়া নাটকের নামকরণও করিলেন এদেশের প্রকৃতি অনুসারে। 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র নাম হইল 'ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস নাটক' (১৮৫৩), 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েটে'র নাম রাখিলেন 'চারুমুখ-চিত্তহরা' নাটক (১৮৬৪)। কবি হেমচন্দ্রও অনুরূপ আদর্শে 'টেম্পেষ্টে'র রূপান্তর করেন 'নলিনী-বসন্ত' নামে (১৮৬৮)। ইহার ঘটনাক্ষেত্র এবং পাত্রপাত্রীর নামকরণেও দেশীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। তৎপর হেমচন্দ্রের 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"এই পুস্তকখানি সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অনুবাদ নহে।" নবীনচন্দ্রও করিয়াছিলেন মর্মানুবাদ। নাটকের নামটিরও তিনি কবিত্বপূর্ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন'; এবং হরচন্দ্র ঘোষ ও হেমচন্দ্রের মত পাত্রপাত্রীর দেশীয় নামকরণও করিয়াছিলেন। অনুবাদ ক্ষেত্রে দেখা যায়,—যেখানে যেখানে নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানে সেখানে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বরং সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু গদ্যসংলাপসমূহ অত্যন্ত আড়ষ্ট। নবীনচন্দ্রের নাট্যবোধের অভাবই তাহার কারণ মনে হয়।

নবীনচন্দ্রের 'খৃষ্ট'ও অনুবাদ-কাব্য, কিন্তু জীবনী-কাব্য সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট ধারণা এবং পরিকল্পনার সহিত উহা বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া পরবর্তী 'জীবনী-কাব্য' অধ্যায়ে উহা আলোচিত হইবে।

জীবনী-কাব্য

পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর মানবতা-আদর্শের কবি। তাঁহাদের উভয়েরই নিকট দেবতা সর্বজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্যরূপে স্বীকৃত। তাই বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে এবং নবীনচন্দ্র পদ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপেই অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র আরও অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণায়ন-কাব্য 'রৈবতকে' দেবতার যে বিশাল মানব-রূপ প্রকটিত হইল তাহা কবি-হৃদয়ে এক মহান সৃষ্টির উল্লাস আনিয়া দিল, এবং কেবলমাত্র পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের নর-রূপায়ণেই তাহা শুদ্ধ হইয়া গেল না। এবার ঐতিহাসিক মানবই দেবকল্প হইয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার হাতে। 'রৈবতক'-এর পরে 'খৃষ্ট', 'কুরুক্ষেত্র'-এর পরে 'অমিতাভ', 'প্রভাস'-এর পরে 'অমৃতাভ'—এ যেন স্তবকে স্তবকে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত মহামানবলীলার উন্মোচন। উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক—নরজীবনের মধ্যেই অমর জীবনের যে বীজ নিহিত আছে, তাহাকে ধ্যান ও মননের দ্বারা জাগাইয়া তোলা; জীবন-সাধক কবির উন্নত ভাবাদর্শের ইহাও একটি দিক। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভাবোন্মত্ত বাল্মীকির ধ্যান-সংকল্প—

> দেবতার স্তবগীতি দেবেরে মানব করি আনে,
>
> তুলিব দেবতা করি' মানবেরে মোর ছন্দে গানে।

('ভাষা ও ছন্দ'—কাহিনী)

এবার তাই ভাষা ও ছন্দের হোমারতিতে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিবার সাধনা চলিল। একে একে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্য—এই তিন জগদ্বরেণ্য মহামানবের পুণ্য জীবনকে কাব্যরূপ দান করিয়া নবীনচন্দ্র যেন জাতীয় জাগরণকেই পরিপুষ্ট করিলেন।

ভগবানের অবতারত্বে বিশ্বাস ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার অন্যতম ভিত্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুকদেব বলিতেছেন—

> কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌।
>
> জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (১০ম-১৪।৫৫)

(অর্থাৎ, এই কৃষ্ণকে অখিলআত্মার আত্মা বলিয়া জানিবেন, তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত মায়া দ্বারা এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন।) 'খৃষ্টের' ভূমিকায় নবীনচন্দ্রও অবতারগণের আবির্ভাবের শাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ ও বুদ্ধ ভারতে, খৃষ্ট ইহুদি দেশে, মহম্মদ আরবে এবং চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সকল ধর্মাবলম্বীরা যে কেন এই মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবেন না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।" নবীনচন্দ্র ইঁহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, এবং সকল ধর্মের মূল ঐক্যে বিশ্বাসই তাঁহাকে অবতারলীলা রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সচরাচর তাঁহার লিখিবার টেবিলের উপর নাকি রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের ছবি, বুদ্ধদেবের ছবি এবং চৈতন্যদেবের ছবি থাকিত।[১] ইহা কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরক্তির পরিচায়ক।

আবার অবতার-ধারণাকে অতিপ্রাধান্য দিলে চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ মহামানবদের জীবনে প্রকটিত বা আরোপিত অলৌকিক লীলাসমূহের প্রতিই আমাদের ভক্তিদুর্বল দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, চিরকাল হইয়াছেও তাহাই। আমরা জানি—নবীনচন্দ্র সে যুগের মানবতাবোধের দীক্ষালব্ধ কবি। তাই বুদ্ধজীবনী 'অমিতাভ'-এর ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"অবতারদিগকে মানুষিকভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়।" নবীনচন্দ্রের এই মনোভাব আপাতঃদৃষ্টিতে শাস্ত্রসম্মত অবতারতত্ত্বের বিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেননা "গীতা"য় ভগবান বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মতঃ ভূত মহেশ্বরম্॥ (৯।১১)

(অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী বলিয়া আমায় অবজ্ঞা করিয়া থাকে।) সুতরাং মনুষ্য-রূপায়ণে তাঁহার মহিমা-লাঘবের আশঙ্কাও রহিয়াছে।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের উক্ত উপলব্ধি একেবারে অসঙ্গত নহে। এযুগে জ্ঞান আবিষ্কার ও শক্তিমহিমায় মানুষের অস্তিত্ব যে কেবল চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা নহে, তাহাকে দেবতার প্রতিস্পর্ধী করিয়া

তুলিয়াছে। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তির বিকাশ যে নবীনচন্দ্রকে কত শ্রদ্ধাভিভূত করিয়াছিল, তাহা 'রৈবতকে' শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

মানব! চেতনাযুক্ত, বিবেকী; স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট, যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চালিত এই বিশ্বচরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে তাহার। (১ম সর্গ)

এই মানব-শক্তির উপর প্রগাঢ় আস্থা লইয়াই যুগপ্রতিভূ বঙ্কিমচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণকে অলৌকিকতার আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রেষ্ঠ মানবরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ তিনিও অবিশ্বাসী ছিলেন না। নবীনচন্দ্রের অনুভূত অবতার-ধারণাও সে যুগের মানবমহিমাবোধের সহিত সুসঙ্গত। 'খৃষ্ট' কাব্যের ভূমিকায় অবতারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র যে উদার মানবধর্মের সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।—"ধর্মের প্রকৃত অর্থ কি, মানুষ কি তাহা কখনও বুঝিবে না? যদি কিঞ্চিৎমাত্রও কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে ভারতীয় আর্য ধর্মাবলম্বীরা। তাঁহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের ধর্মমত অনুসরণ করেন না। অতএব তাঁহাদের ধর্মের···প্রকৃত নাম মানবধর্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য, মনস্বী মানবমাত্রই ইহার শিক্ষক। সর্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী।" সুতরাং দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচেতনা এমনিভাবে মানুষকে দেবকল্প করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে।

যাহা হোক, এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই নবীনচন্দ্র একে একে কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্য-চরিতকাব্য গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও নানা কারণে মহম্মদের লীলাকীর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"অমিতাভের উপসংহারে আমি বলিয়াছি যে, শ্রীভগবানের মহম্মদ-অবতার দর্শন করা আমার ভাগ্যে হইবে না।···মহম্মদের লীলা লিখিতে অনেক আরবীয় স্থানের ও ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। উহা বাঙ্গালা কবিতায় ভাল শুনাইবে না। এজন্য আমি তাঁহার লীলা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলাম।"[২] 'অমিতাভ' রচনার পর তিনি নাকি শ্রীরামকৃষ্ণলীলা লিখিতেও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।[৩] কিন্তু পূর্বকল্পিত চৈতন্য-লীলাই কবি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণলীলা রচনার

পরিকল্পনা আদৌ তাঁহার ছিল কিনা জানা যায় না, থাকিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত অলিখিতই রহিয়া গেল।

(ক) খৃষ্ট

১৮৯১ সালে (৪ঠা মার্চ) প্রকাশিত খৃষ্ট লইয়াই নবীনচন্দ্রের অবতার বা মহামানব-জীবনী রচনার স্থচনা। 'রৈবতকে' শ্রীকৃষ্ণ-জীবন-ব্যাখ্যান স্থচিত হইলেও পরে রচিত 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যদ্বয়েই তাহা সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে। খৃষ্টের প্রতি আকর্ষণের কারণ নবীনচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"খৃষ্টের শিক্ষার মত এমন সরল শিক্ষা এক স্থানে বোধহয় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নাই।...'খৃষ্ট' রচনা করিবার ইহাই আমার উদ্দেশ্য। সকল ধর্মের জন্মস্থান এশিয়া, খৃষ্টও এশিয়ার লোক। কেবল তাহা নহে, তাঁহার চিত্র ও চরিত্র দেখ, দেখিবে তিনি একজন কৌপীনধারী হিন্দু সন্ন্যাসী।"[৪] 'খৃষ্ট'-এর ভূমিকায় এই আকর্ষণের আরও গভীরতর কারণ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন,—"কৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই আর্যধর্মাবলম্বীদের কাছে অবতার-স্বরূপ পূজনীয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমি মেথু-প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত ও কবিতায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।" অধিকন্তু উক্ত ভূমিকাতেই 'শ্রীকৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্ব' ও 'শ্রীখৃষ্টোক্ত অবতার তত্ত্ব' উদ্ধৃতিসহ (তাঁহারই অনূদিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও 'খৃষ্ট' হইতে) উল্লেখ করিয়া* নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই।"

অনুবাদ-কার্যে নবীনচন্দ্রের অসুবিধার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 'খৃষ্ট'-এর ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। উহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে

* যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্মের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে স্থজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে
জন্মগ্রহণ॥ গীতা, ৪-৭।৮

তবে নর পরস্পরে হবে হিংসান্বিত,
করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত।
হবে লোক মিথ্যাধর্ম শিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্মের প্রাদুর্ভাব, ধর্ম নির্বাপিত।
ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে, আসিবেন মানব-তনয়॥ মেথু ২৪।২৭

The Gospel according to St. Matthew-র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র, সুতরাং কবিপ্রতিভার পরিচয় দানের সুযোগ ইহাতে ছিল না। তথাপি অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ এবং সংযতই হইয়াছিল।

যদিও 'অমিতাভ' রচনাকালেই অবতারদিগকে মানুষীরূপে দেখিবার আগ্রহ নবীনচন্দ্রের জাগিয়াছিল, তবু খৃষ্ট-জীবনের অলৌকিক দিক যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়া তাঁহার প্রেমিক ও প্রচারক-রূপকে স্পষ্ট করিবার প্রয়াস হইতেই নবীনচন্দ্রের উক্ত মনোভাবের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে নবীনচন্দ্র Matthew-Gospalএর যে সংক্ষিপ্ত-রূপ অনুবাদে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মাত্রাবোধের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। Matthew-র ১ম হইতে ৭ম অধ্যায় নবীনচন্দ্রও তাঁহার ১ম হইতে ৭ম সর্গে প্রায় যথাযথই অনুবাদ করিয়াছেন; কেননা এই পর্যন্ত খৃষ্টের প্রচারক-জীবনের উন্মেষ-কাহিনী। তার পর হইতেই বহু Parable ও অলৌকিক ঘটনা, সুতরাং নবীনচন্দ্র স্বভাবতঃই উহা সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। Matthew-র ৮ম হইতে ১২শ অধ্যায়—৮ম সর্গে, দীর্ঘ ১৩শ অধ্যায়—অতি সংক্ষিপ্ত ৯ম সর্গে, ১৪শ হইতে ১৭শ অধ্যায়—১০ম সর্গে, ১৮শ হইতে ২০শ অধ্যায়—১১শ সর্গে, ২১শ হইতে ২৩শ অধ্যায়—১২শ সর্গে, ২৪শ এবং ২৫শ অধ্যায়—১৩শ সর্গে, ২৬শ অধ্যায়— ১৪শ সর্গে, ২৭শ ও ২৮শ অধ্যায়—১৫শ সর্গে নবীনচন্দ্র সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, আরম্ভের মত শেষের দিকেও তিন চারিটি অধ্যায় সামান্যমাত্র সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কেননা শেষাংশের তিরোভাব-কাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ।

যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নবীনচন্দ্র 'খৃষ্ট' অনুবাদ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়, এবং বিষয়-গৌরবের ততটুকু প্রশংসা তিনি সেই সময়েও লাভ করিয়াছিলেন দেখিতে পাই। ব্রাহ্মমতাবলম্বী কৃষ্ণবিহারী সেন খৃষ্ট-অনুবাদ ও ভূমিকায় প্রকাশিত কবির মনোভাবের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছিলেন—"He proceeds to say that peace and brotherhood will be established in the world as soon as these prophets are recognised as such by all men. We are glad to observe that the poet has so distinctly approached the standard of the new dispensation."[৫] ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মসমন্বয়াত্মক 'নববিধান'-আদর্শের সহিত নবীনচন্দ্রের ভাবনা-সাদৃশ্য 'কাব্যত্রয়ী'র পরিকল্পনায়

যেমন, 'খৃষ্ট'-এর ক্ষেত্রেও তেমনি লক্ষণীয়। যাহা হোক, এই অনুবাদে ধর্মানুরাগীর মন তৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু কবির সান্ত্বনা কোথায়? মেথু-প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্যের অনুবাদে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নবীনচন্দ্র যদি খৃষ্ট-জীবন অবলম্বনে মৌলিক কাব্য রচনা করিতেন, তবে তাহাতে কিছুটা কবি-প্রাণের সাড়া মিলিত মনে হয়। আবার আর একদিক হইতেও বিষয়টি চিন্তনীয়। নবীনচন্দ্রের উদার মনে খৃষ্ট-মহিমা কিছুটা রেখাপাত করিলেও বিদেশীয় ধর্মের পরিমণ্ডল, সংস্কার, জীবনদর্শন প্রভৃতির আত্মিক পরিচয় গভীরভাবে লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কেননা মূলতঃ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাণরসেই তিনি পুষ্ট ছিলেন। কাজেই শ্রদ্ধার পরিচয় এবং মহামানবতার স্বীকৃতি 'খৃষ্ট' কাব্যে আছে বটে, কিন্তু রচনাকালে কবি-হৃদয়ের আন্তরিক উল্লাসের স্পর্শ তাহাতে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্ট এশিয়ার লোক,—এই একমহাদেশিক-চেতনাও নবীনচন্দ্রকে খুব বেশী পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল মনে হয় না। কেননা, তখন পর্যন্ত ভারত-গৌরব-অনুভূতি এবং আর্য-ঐতিহ্যে আস্থা আমাদের জাতীয় জাগৃতির মুখ্য উপাদান; এসিয়-গৌরববোধ জাগ্রত হয় অনেক পরে। আবার অন্যদিকে বুদ্ধদেব Light of Asia-রূপে আখ্যাত হইলেও মূলতঃ তিনি ভারতীয়, ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার কল্যাণময় রূপ এবং জীবন-সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি তাঁহার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাই বুদ্ধ-গাথা 'অমিতাভ' সার্থক সৃষ্টি। 'খৃষ্ট' উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা হিসাবেই উল্লেখ্য, অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এবং বিষয়-পরিবেশের সহিত কবির একপ্রাণতার অভাব উহাকে সুকাব্য করিয়া তুলিতে পারে নাই।

নবীনচন্দ্রও যেন পরে এই সম্পর্কে সচেতন হইয়াছিলেন। মহম্মদের লীলা-রচনায় বিরত থাকার ব্যাপারে আরবীয় স্থান ও ব্যক্তির নামের শ্রুতিকটুত্ব সম্ভবতঃ বাহ্যিক কারণ, নিগূঢ় কারণ মনে হয়—ইসলামধর্ম-প্রবর্তক সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব; সেই ধর্মের আচার-সংস্কার ও জীবনবোধের সহিত অস্পষ্ট পরিচয় এবং সেই ধর্মবিশ্বাসীদের মনোভাব সম্পর্কে সংশয় নবীনচন্দ্রকে যেন দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়—মহরমের করুণ কাহিনীতে অভিভূত হইলেও তাহা লইয়া কাব্যরচনার প্রেরণা যে মধুসূদন অনুভব করেন নাই, বরং কোন মুসলমান কবির পক্ষেই সেই কাব্যরচনা করা সম্ভব বলিয়া যে তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহারও প্রচ্ছন্ন কারণ বুঝি ইহাই।*

যাহা হোক, তুলনায় দেখা যাইবে—'অমিতাভ' কাব্যে বুদ্ধলীলা এবং 'অমৃতাভ' কাব্যে চৈতন্যলীলা খ্যাপনে নবীনচন্দ্রের ভাব ভাষা ও ছন্দ চমৎকার স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। কেননা উক্ত মহাসাধকদ্বয়ের অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা ও মানবপ্রেমের কাহিনী ভারতীয় জীবনাদর্শ এবং ঐতিহ্যের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, এবং কবিমানসে উহার প্রভাবও অসামান্য। নবসৃষ্টির আনন্দ সে ক্ষেত্রে কবিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই Sir Edwin Arnold প্রণীত অপূর্ব কাব্যরসমৃদ্ধ বুদ্ধজীবন-কাব্য Light of Asia-র অনুবাদ করিতে না বলিয়া নবীনচন্দ্র মৌলিক বুদ্ধজীবন-কাব্যই রচনা করিলেন।

(খ) অমিতাভ

গৌতম বুদ্ধের জীবন-বেদ ও বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বহুকাল পূর্বেই বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্জীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের যাত্রা আরম্ভ। একটি দোঁহায় আছে—

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥ ৭

(অর্থাৎ, ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্বকে দলিত বা উন্মূল করিয়া করুণার মেঘ নিরন্তর প্রস্ফুরিত হইতেছে) সেই করুণাঘন বুদ্ধের মানবপ্রীতি এবং—

জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুরে নিঅ মন দে উলাল॥

(অর্থাৎ, যে বাণী শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রিয়জাল ছিন্ন হয়, নির্বিকল্পে নিজ মন উল্লসিত হয়) সেই মুক্তিবাণীর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উজ্জীবনের ফলে শান্ত নির্লিপ্ত বৌদ্ধ জীবনবাদ ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে বিচিত্র ছদ্মবেশে অস্তিত্বটুকু মাত্র রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। বাঙ্গালার বহু উপাখ্যানে, দেবদেবী-পরিকল্পনায়, ক্রিয়া-কর্মে বৌদ্ধ আদর্শের ছাপ দেখা যায়, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের কাব্যসাহিত্যে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর বিশেষ নিদর্শন নাই বলিলেই চলে।

বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধসংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগ্রত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে।[*] আমাদের সাহিত্যে বুদ্ধচর্চার নব-সূচনায় বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী অপেক্ষা বুদ্ধজীবনের মহনীয়তাই বেশী প্রেরণা

জোগাইয়াছিল। তাহার কারণ প্রমথ চৌধুরী বড় সুন্দর নির্ণয় করিয়াছিলেন,—"বুদ্ধ-চরিত্রের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জর্মান পণ্ডিত Oldenburg...বলেছেন যে বুদ্ধচরিত্র ইতিহাস নয়, কাব্য, একথা সত্য।......এ কাব্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নেই, যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য তার হৃদয় মনকে স্পর্শ করবেই করবে।"[৯] নবীনচন্দ্রের হৃদয়-মনের গভীর উপলব্ধি-রসনিষিক্ত 'অমিতাভ' বাঙ্গালাসাহিত্যে বুদ্ধজীবন অবলম্বনে রচিত একমাত্র সার্থক কাব্য।

নবীনচন্দ্রের উক্ত কাব্যের পূর্বে রচিত বুদ্ধবিষয়ক কয়েকটি রচনার উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে।[১০] তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক ব্যতীত অন্য কোনটিরই সাহিত্যিক মূল্য নাই।

(১) শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব—সাধু অঘোরনাথ। ১২৮২। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু উদ্ধৃতিসহ সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিত।

(২) মহাপুরুষজীবনী—গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নাম অমুদ্রিত। বেঙ্গল লাইব্রেরী কর্তৃক গ্রন্থটি ১৮৮০ সালে ক্রীত হয়। তৎকালিক ভাষা অপেক্ষা যথেষ্ট সহজ ভাষায় বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা।

(৩) বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ—কৃষ্ণকুমার মিত্র। ১২৯৪ সন। 'বুদ্ধ ব্রহ্মে বিশ্বাস করিতেন এবং অদ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রাথমিক বৌদ্ধধর্ম যে ঈশ্বরবাদী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ' লেখক ইহাতে দেখাইয়াছেন।

(৪) বুদ্ধদেব-চরিত—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১২৯৪ সন। পঞ্চাঙ্ক নাটক। Edwin Arnold-এর Light of Asia অবলম্বনে রচিত এবং Arnoldকেই উৎসর্গীকৃত।

(৫) শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব-চরিত—শরচ্চন্দ্র দেব। পৌরাণিক নাটক। ১২৯৫।

(৬) বুদ্ধদেব, তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি—ডাক্তার রামদাস সেন। ১২৯৮। বিস্তারিত এবং তথ্যবহুল এই জীবনীটির ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুগ।

(৭) বুদ্ধদেব-চরিত—বেঙ্গল লাইব্রেরীর ছাপ ১৮৯৮। পড়িলে তৎপূর্বে রচিত মনে হয়।

নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' ২৯ আষাঢ়, ১৩০২ (১৮৯৫ ইং) সনে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য রচনার প্রেরণা সম্পর্কে কবির বক্তব্যও জ্ঞাতব্য,—"বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের লীলাভূমি বেহার দর্শন করিয়া এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিলাম। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মত বেহারে অমিতাভের বীজও আমার হৃদয়ে রোপিত হয়। উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া এতকাল পরে এই কাব্যবৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল।"[১১] 'অমিতাভ'-এর ভূমিকাটি নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। ধর্মচিন্তায় কেশবচন্দ্র যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে যুক্তিপ্রাধান্যের প্রবর্তন করেন, নবীনচন্দ্র যেন সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। 'খৃষ্ট'-এর ভূমিকায় যেমন তাঁহার বিশ্বাসপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল—"কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই," তেমনি 'অমিতাভ'-এর ভূমিকায়ও তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত—"বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ কোথায়?......প্রচলিত হিন্দুমত ও বৌদ্ধমত প্রকৃত মুক্তি সম্বন্ধে যে বড় বিভিন্ন তাহা বোধ হয় না।...বুদ্ধমত সার্বভৌম হিন্দুধর্মের একটি মত মাত্র।...প্রচলিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত।" সুতরাং এইরূপ উপলব্ধির গভীরতা এবং ভাবদৃষ্টির উদারতার দ্বারা নবীনচন্দ্র তাঁহার অবতারলীলা রচনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'খৃষ্টে' পরোক্ষভাবে এবং 'অমিতাভে' প্রত্যক্ষভাবে নবীনচন্দ্র অবতারদিগের মানুষী-রূপ সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহা যে যুগদৃষ্টিসম্মত, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। 'অমিতাভ'-এর প্রসঙ্গে Edwin Arnold রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য Light of Asia-র কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু উহা দ্বারা নবীনচন্দ্র যে বিশেষ প্রভাবিত হন নাই, তাহার কারণও নবীনচন্দ্রের পূর্বোক্ত মানবিক উপলব্ধি। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।—"বৌদ্ধধর্মের বহু গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।...কিন্তু প্রায় সর্বত্র, এমন কি এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া'য় পর্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্তমাংসের বুদ্ধ দেখিতে পাই না। অথচ অবতাররা মানুষ ছিলেন, মানুষের মত কার্য করিয়া মানুষকে শিক্ষাদানই অবতারত্বের একমাত্র সার্থকতা।...অতএব আমরা যেভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপরে দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে

ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।"[১৩] 'অমিতাভ'-এর ভূমিকায় প্রদত্ত যুক্তি আরও সুস্পষ্ট ;—"বুদ্ধদেবের ধর্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক, অতএব তাঁহাকে অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।" সুতরাং পূর্ব হইতেই চরিত্র-উপস্থাপনার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নবীনচন্দ্র স্থির করিয়া লইয়াছিলেন দেখা যায়।

গৌতম বুদ্ধের জীবন-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য বিরল, শাস্ত্রসমূহও কিংবদন্তীপূর্ণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলেন : "We possess no authentic accounts of the life of Gautama, the founder of Buddhism. Two poems in the Sutta Nipāta and a few early Suttas supply us with same data, but we have to rely for details mainly upon contemporary later works, which appear to have preserved older traditions handed down in some form of ballad poetry."[১৪] শিল্পবিৎ পণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী মন্তব্য করিয়াছেন : "Many of the details of his life are direct reflections of older myths. These considerations raise the question, whether the 'life' of the 'conqueror of death' and 'teacher of Gods and men'…can be regarded as historical or simply as a myth. There are no contemporary records, but it is certain that in the third century B.C., it was believed that the Buddha had lived as a man amongst men."[১৫] বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম-বিষয়ে কৃতী গবেষক ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন বলিয়াছেন : "অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মত বৌদ্ধশাস্ত্রও নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিষয়বহুল, বুদ্ধও ইহাতে চিত্রিত হইয়াছেন অতিমানবরূপে, আমরা কিন্তু শাস্ত্রীয় অতিপ্রাকৃত বর্ণনাবলীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বাস্তব ও মানব বুদ্ধকেই বুঝিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।"[১৬] লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই 'man amongst men' এবং 'বাস্তব ও মানব বুদ্ধ'কেই নবীনচন্দ্র বহুপূর্বে 'অমিতাভে' নিজ উপলব্ধি অনুসারে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শাস্ত্র-সম্পর্কে তাঁহার ধারণাও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের অনুরূপ ছিল দেখিতে পাই, অথচ তিনি আজিকার অর্থে ইতিহাস-সন্ধিৎসু ছিলেন না।

নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' ২৯ আষাঢ়, ১৩০২ (১৮৯৫ ইং) সনে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য রচনার প্রেরণা সম্পর্কে কবির বক্তব্যও জ্ঞাতব্য,—"বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের লীলাভূমি বেহার দর্শন করিয়া এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিলাম। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মত বেহারে অমিতাভের বীজও আমার হৃদয়ে রোপিত হয়। উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া এতকাল পরে এই কাব্যবৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল।"[১১] 'অমিতাভ'-এর ভূমিকাটি নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। ধর্মচিন্তায় কেশবচন্দ্র যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে যুক্তিপ্রাধান্যের প্রবর্তন করেন, নবীনচন্দ্র যেন সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। 'খৃষ্ট'-এর ভূমিকায় যেমন তাঁহার বিশ্বাসপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল—"কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই," তেমনি 'অমিতাভ'-এর ভূমিকায়ও তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত—"বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ কোথায়?……প্রচলিত হিন্দুমত ও বৌদ্ধমত প্রকৃত মুক্তি সম্বন্ধে যে বড় বিভিন্ন তাহা বোধ হয় না।…বুদ্ধমত সার্বভৌম হিন্দুধর্মের একটি মত মাত্র।…প্রচলিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত।" সুতরাং এইরূপ উপলব্ধির গভীরতা এবং ভাবদৃষ্টির উদারতার দ্বারা নবীনচন্দ্র তাঁহার অবতারলীলা রচনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'খৃষ্টে' পরোক্ষভাবে এবং 'অমিতাভে' প্রত্যক্ষভাবে নবীনচন্দ্র অবতারদিগের মানুষী-রূপ সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহা যে যুগদৃষ্টিসম্মত, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। 'অমিতাভ'-এর প্রসঙ্গে Edwin Arnold রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য Light of Asia-র কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু উহা দ্বারা নবীনচন্দ্র যে বিশেষ প্রভাবিত হন নাই, তাহার কারণও নবীনচন্দ্রের পূর্বোক্ত মানবিক উপলব্ধি। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।—"বৌদ্ধধর্মের বহু গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।…কিন্তু প্রায় সর্বত্র, এমন কি এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া'য় পর্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্তমাংসের বুদ্ধ দেখিতে পাই না। অথচ অবতাররা মানুষ ছিলেন, মানুষের মত কার্য করিয়া মানুষকে শিক্ষাদানই অবতারত্বের একমাত্র সার্থকতা।…অতএব আমরা যেভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপরে দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে

ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।"[১৪] 'অমিতাভ'-এর ভূমিকায় প্রদত্ত যুক্তি আরও সুস্পষ্ট ;—"বুদ্ধদেবের ধর্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক, অতএব তাঁহাকে অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।" সুতরাং পূর্ব হইতেই চরিত্র-উপস্থাপনায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নবীনচন্দ্র স্থির করিয়া লইয়াছিলেন দেখা যায়।

গৌতম বুদ্ধের জীবন-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য বিরল, শাস্ত্রসমূহও কিংবদন্তীপূর্ণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলেন : "We possess no authentic accounts of the life of Gautama, the founder of Buddhism. Two poems in the Sutta Nipāta and a few early Suttas supply us with same data, but we have to rely for details mainly upon contemporary later works, which appear to have preserved older traditions handed down in some form of ballad poetry."[১৩] শিল্পবিৎ পণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী মন্তব্য করিয়াছেন : "Many of the details of his life are direct reflections of older myths. These considerations raise the question, whether the 'life' of the 'conqueror of death' and 'teacher of Gods and men'...can be regarded as historical or simply as a myth. There are no contemporary records, but it is certain that in the third century B.C., it was believed that the Buddha had lived as a man amongst men."[১৪] বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম-বিষয়ে কৃতী গবেষক ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন বলিয়াছেন : "অন্যান্য ধর্ম-শাস্ত্রের মত বৌদ্ধশাস্ত্রও নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিষয়বহুল, বুদ্ধও ইহাতে চিত্রিত হইয়াছেন অতিমানবরূপে, আমরা কিন্তু শাস্ত্রীয় অতি-প্রাকৃত বর্ণনাবলীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বাস্তব ও মানব বুদ্ধকেই বুঝিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।"[১৫] লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই 'man amongst men' এবং 'বাস্তব ও মানব বুদ্ধ'কেই নবীনচন্দ্র বহুপূর্বে 'অমিতাভে' নিজ উপলব্ধি অনুসারে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শাস্ত্র-সম্পর্কে তাঁহার ধারণাও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের অনুরূপ ছিল দেখিতে পাই, অথচ তিনি আজিকার অর্থে ইতিহাস-সন্ধিৎসু ছিলেন না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন—নবীনচন্দ্রের পূর্বে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রধানতঃ Arnold-এর Light of Asia কাব্যকে অবলম্বন করিয়া 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক রচনা করেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার নাটকে উক্ত কাব্যের অতিপ্রাকৃত-প্রবণতার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। তদুপরি গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকাদির রীতি অনুযায়ী উক্ত নাটকের সূচনায় এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া বুদ্ধদেবের অবতারত্বকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। গৌতমের জন্মের অব্যবহিত পরেই—

অকস্মাৎ নব শিশু করি গাত্রোত্থান
সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,
কহিল গম্ভীর স্বরে,—
"হের দেব নাগ নরে,
আমি বুদ্ধ প্রণম্য সবার।" (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

যদিও গিরিশচন্দ্র বুদ্ধজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ অতি সংক্ষেপে নাটকের পাঁচটি অঙ্কে ধরিয়া দিয়াছেন, তথাপি অলৌকিক আবির্ভাব ও দৈববাণী তাহাতে প্রচুর। 'অমিতাভে' কিন্তু নবীনচন্দ্র দু'এক স্থলে আভাসে মাত্র বুদ্ধদেবের অবতারত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন। যেমন, সূচনায়—

লভিবেন হরি এক জন্ম আর
জগতের দুঃখ করিতে নির্বাণ।

এবং—

হায়! মূর্খ শাক্যগণ! কিবা অসম্ভব তার,
নারায়ণ-অংশে জন্ম যার? (৫ম সর্গ)

এই ইঙ্গিতটুকু না দিলে অবতার-সংস্কারই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, যে সংস্কার জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১৬] নবীনচন্দ্র তাহাতে বিশ্বাসীও ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোথাও অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তিনি বুদ্ধের অবতার-রূপ অতি প্রকট করিয়া তুলেন নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয়, নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' রচনার পঁয়ষট্টি বৎসর পরে এই মানব-মহিমা-প্রতিষ্ঠার যুগেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'করুণাঘন' নামক বুদ্ধজীবনীতে বহু অলৌকিক কাহিনীর সন্নিবেশ করিয়াছেন।[১৭]

Arnold-এর Light of Asia নাম হইতেও গভীর অর্থদ্যোতক 'অমিতাভ' নামটিই (বুদ্ধের অন্যতম নাম) নবীনচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেননা

বুদ্ধের অমিত আভার বিকীরণে শুধু এশিয়া নহে, বিশ্বের অন্তর্লোকও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। Arnold-এর বর্ণনারসসমৃদ্ধ বুদ্ধজীবনকাব্য ইংরেজী সাহিত্যে সমাদৃত গ্রন্থ, নবীনচন্দ্র উহার অলৌকিকতাপূর্ণ বর্ণনাদির ত্রুটির উল্লেখ করিলেও মূলতঃ কাব্যের ছক্‌ বা pattern হিসাবে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে হয়। অবশ্য উহার মত অতটা কাব্যগুণ 'অমিতাভ'-এর নাই। কিন্তু অলৌকিকতা-বর্ণনায় Arnold-এর যেন সমধিক আগ্রহ দেখা যায়। বাল্যে আহত পক্ষী লইয়া দেবদত্তের সহিত বিবাদ উপলক্ষে গৌতমের মুখে প্রচারকসুলভ উক্তি শুনিতে পাই—

For now I know by what within me stirs,
That I shall teach compassion unto men
And be a speechless world's interpretor.

('Light of Asia' Book I)

সেই বিবাদে মধ্যস্থরূপে অজ্ঞাত-পরিচয় ঋষির আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, যশোধরার প্রতি আকর্ষণের পূর্বজন্মঘটিত ব্যাখ্যায়, গৃহত্যাগের রাত্রে শুদ্ধোধন ও যশোধরার স্বপ্নদর্শনে, পূর্বজন্মে ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য হওয়া—ইত্যাদি নানাবিষয়ে অলৌকিকতার প্রাধান্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি বাল্যশিক্ষা, যশোধরার স্বয়ম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তি পরীক্ষা, বিবাহ ও প্রমোদগৃহ বর্ণনা, সুজাতা-কাহিনী, মার-কাহিনী প্রভৃতির বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বাহুল্যপূর্ণ হওয়ায় বিষয়বস্তুর ভারসাম্যও যেন বিচলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্য অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধ-চরিত' উল্লেখযোগ্য। কাব্য-চমৎকারিত্বে যদিও তাহার তুলনা হয় না, তবুও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় তাহা পরিপূর্ণ। যেমন—জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসীরূপ; বিলাসকক্ষে সুপ্তা রমণীগণের বিরূপ অবস্থা—সবই দৈবী-সংঘটন। ছন্দক ও কণ্টকের যাত্রা, কাষায় বস্ত্রসহ ব্যাধের আগমন, সন্ন্যাসী গৌতমের উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ও মুকুট দেবতাকর্তৃক ধারণ—সবই দৈবীলীলা। বোধিলাভের পূর্বে সর্পের স্তব, বোধিলাভের পরে মারকন্যাগণকর্তৃক ছলনা, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে বুদ্ধদেবকে নাগরাজকর্তৃক ফণার নীচে আশ্রয় দান—প্রভৃতি অলৌকিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এই হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' মানব-বুদ্ধের চিত্রপ্রকাশে খুবই সংযত এবং স্বাভাবিকতার অনুসারী। যে উচ্ছ্বাস-প্রবণতা এবং পরিমিতি-

হীনতার দরুণ সচরাচর নবীনচন্দ্রের কাব্যে বহুবিধ ত্রুটি দেখা দিয়া থাকে, 'অমিতাভ' তাহা হইতে অনেকটা মুক্ত। একটা স্থির আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাহুল্যহীনভাবে ঘটনা-বর্ণন ও জীবন-বিশ্লেষণ করিতে করিতে নবীনচন্দ্র যেন পয়ার-ত্রিপদীর বিচিত্র পদক্ষেপে সর্গের পর সর্গ অগ্রসর হইয়াছেন। 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের কবি-ভাষা ও ছন্দ যেন এখানে আরও গভীর এবং গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। Arnold-এর বর্ণাঢ্য ভাষা ও বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য এবং নবীনচন্দ্রের সংযত প্রকাশভঙ্গির স্নিগ্ধতা—এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য কম নহে। সর্গসমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—'অমিতাভে' বুদ্ধজীবনের ইতিহাসসম্মত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা যথাসম্ভব অলৌকিকতা-বর্জিতভাবে সুন্দর কাব্যিক উপস্থাপনা-কৌশলে বিবৃত হইয়াছে, এবং বুদ্ধের মানব-সম্ভব ক্রিয়াকলাপ ও অনুভূতির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে—'অমিতাভ' এবং পরবর্তী রচনা 'অমৃতাভ' জীবনী হইলেও উহারা এক হিসাবে গাথা-কাব্য, সুতরাং গীতিসুর ইহাতে প্রধান।

প্রথম সর্গে শুভজন্ম বর্ণনাকালে মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন বর্ণনাটুকুতে অলৌকিকতার আভাস থাকিলেও পুত্রার্থিনীর বিচিত্র স্বপ্নদর্শন অমনস্তাত্ত্বিক নহে, তেমনি দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত অসিত ঋষির ভবিষ্যৎবাণীও আমাদের নিয়তিবিশ্বাসনিষ্ঠ সমাজে জ্যোতিষ-গণনার প্রভাব সূচিত করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই নবীনচন্দ্র উক্ত ক্ষুদ্র ঘটনাদ্বয় বর্জন করেন নাই। তৃতীয় সর্গে সিদ্ধার্থের কৈশোর-বর্ণনা হইতেই আমরা মানুষীলীলার প্রাকৃতজনগ্রাহ্য রূপ প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। জ্ঞানাহরণ এবং শৌর্যপ্রদর্শনে কিশোর বয়সেই কৃতিত্বলাভ সামন্ত-সন্তান সিদ্ধার্থের পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে। ঐ সর্গে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া নবীনচন্দ্র কিশোর সিদ্ধার্থের মধ্যে গভীর চিন্তা-উন্মেষের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, কেননা বুদ্ধ-চরিত্রের প্রধান ভিত্তিই এই ভাবাবিষ্টতা। ঐতিহাসিকও বলেন—"The child prefered solitude and thoughtfulness to the frolics and pranks natural to his age."[১৮] এই সময়ে সিদ্ধার্থের মনে প্রথম করুণা-সঞ্চারের চিত্র-অঙ্কনে নবীনচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন—

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্যমন,

শুভ্র মেঘ-খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।

উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।

আহত পক্ষীর জন্য এই বেদনাটুকু বিশ্বব্যাপী করুণায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া নবীনচন্দ্র যেন বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন-বেদনার ব্যাপকতার সহিত তাহাকে মিলাইয়া দিলেন। আবার সিদ্ধার্থের স্বচ্ছমনে ঘনীভূত ভাবনার মেঘপুঞ্জকে কবি ইঙ্গিতে প্রকৃতির বক্ষপটে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইলেন—

নীরবে বসন্তাকাশে নিদাঘের ক্ষুদ্র মেঘ
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া,
সিদ্ধার্থ ভাবিল বসি— কি ভাবনা নাহি জ্ঞান—
নীল সান্ধ্য নভঃপানে চাহিয়া চাহিয়া।
ভাবিলেন—'এ শরের ঈষৎ পরশে হায়!
প্রাণে যদি এই ব্যথা লাগিলা আমার?
জনকের অস্ত্রাগারে কি ভীষণ অস্ত্র-রাশি!
না জানি কি ব্যথা হায়! আঘাতে তাহার!

বিশ্বময় হিংসা-বিভীষিকার কল্পনায় বিচলিত হৃদয় তখনও কোন প্রতীকার-সঙ্কল্পে সুস্থির হইতে পারিতেছে না, হলোৎসবের আনন্দ মুহূর্তে কৃষক-পশুপক্ষীর দৈহিক ক্লেশ-চিন্তা তাঁহাকে বিষাদক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে,—এই অবস্থায় নির্জন জম্বুবৃক্ষতলে ধ্যানাসীন সিদ্ধার্থের মূর্তি অঙ্কিত করিয়া কবি এই কিশোর-ভাবুকের চিত্র সম্পূর্ণ করিলেন।

চতুর্থ সর্গে বিবাহ-সম্মতি ব্যাপারে সিদ্ধার্থের মনে দ্বন্দ্বসৃষ্টিও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। অভিলষিত বধূর সম্পর্কে সিদ্ধার্থের ধারণা যেমন আদর্শ গৃহীর উপযুক্ত, পাত্রী-মনোনয়নের জন্য আয়োজিত অশোকোৎসবে তাঁহার আচরণও তেমনি স্বাভাবিক ও সংযত। এখানে সিদ্ধার্থ এবং গোপার

পারস্পরিক আকর্ষণের ব্যঞ্জনাময় চিত্রটি অত্যন্ত উপভোগ্যভাবে পূর্বরাগের রোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিয়াছে। অশোকোৎসবক্ষেত্রে—

দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশিল দিবা যেন অশোক-মন্দিরে !

কুমার চাহিলা—চক্ষু ফিরিল না আর,
নিস্পন্দ রহিল চাহি বদন গোপার।

* * *

গোপাও আপনাহারা রয়েছে চাহিয়া,
নবোঢ়া যূথিকা যেন চন্দ্র নিরখিয়া।
কি অজ্ঞাত সুখে পূর্ণ দুইটি হৃদয়
হইল প্রথম,—সুখ পৃথিবীর নয়।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ উক্তিটুকুও কত ক্ষুদ্র অথচ কত ইঙ্গিতময়—

গেলা চলি গোপা বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণী।

'বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণী'র নীরব বেদনা দেখিয়া সিদ্ধার্থও কি অবিচলিত থাকিতে পারিলেন ? আবার পঞ্চম সর্গে (বিবাহ) দাম্পত্যজীবনে পরিতৃপ্ত নির্দ্বন্দ্ব সিদ্ধার্থের সুখোপলব্ধিও একান্ত স্বাভাবিক—

বুঝিলেন রাজপুত্র নৃশংস হিংসার মাত্র
রঙ্গভূমি নহে এ সংসার,
আছে তাহে প্রেমধারা নিরমল সুশীতল,
বনপথে আলো জ্যোৎস্নার।
ভাবিলেন বুঝি আছে দুঃখের ছায়ায় সুখ,
হাহাকার সঙ্গে আছে হাসি।

এই যে সংসারের সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, হাসি-অশ্রুর লীলাবৈচিত্র্য—ইহার ইঙ্গিত তো আরও গভীর, আরও প্রত্যক্ষ—

মরুভূমে আছে সর, পতিপ্রাণা রমণীর
পতিপ্রেম স্বর্গ-সুধারাশি।
নবীন বৈরাগ্য-মেঘ গোপার প্রণয়ালোকে
হইল অদৃশ্য, আলোকিত ;

আশ্বস্ত হইল রাজা, হতভাগ্য শুদ্ধোদন
বিদ্যুতে হইলা প্রতারিত।

"বিদ্যুতে হইলা প্রতারিত'—এই অতি ক্ষুদ্র অথচ ব্যঞ্জনাময় শব্দচিত্রে নবীনচন্দ্র সিদ্ধার্থের উক্ত পরিতৃপ্তির একান্ত সাময়িকতার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গে বৈরাগ্যের পূর্বাভাস হিসাবে যে 'গাথা' রচনা করা হইয়াছে, তাহা কবির স্বপরিকল্পিত হইলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ যেন ভাবী অশুভ ঘটনার শঙ্কিত ছায়াপাত, আবার সিদ্ধার্থের অনুসৃতব্য পথেরও অলক্ষ্য আহ্বান। নির্জন নিশীথ সময়ে সুষুপ্ত নগরীতে পত্নীপুত্রপরিবৃত সিদ্ধার্থ যেন বিশ্বব্যাপ্ত বৈরাগ্যসঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন, আর সেই দৃশ্যেরই অপর দিক—শুদ্ধোদন স্বপ্নে দেখিলেন,

পুত্র ত্যজি রাজ-আভরণ
পরিব্রাজকের বেশে করিতেছে নিষ্ক্রমণ।

এ-স্বপ্নে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। বর্ণনাত্মক গাথা-কাব্যে এই করুণ গীতিরস মাধুর্যই সঞ্চার করিয়াছে।

সপ্তম সর্গে (বৈরাগ্য) জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতি মানবদুর্দশা-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী বুদ্ধ-জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, এবং বৈরাগ্যপ্রবণ মনে এইরূপ উপলব্ধি স্বাভাবিক বলিয়া নবীনচন্দ্র তাহাতে কোন সংশয় প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক এই কাহিনীসৃষ্টির একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ;— "জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, এগুলি মানবজীবনের পরিবর্তনশীলতা ও দুঃখের চিরন্তন মূর্ত প্রতীক।......সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই এই প্রতীকগুলিতে যাহা কিছু বুঝায় সে সব সম্বন্ধে খুব চিন্তা করিতেন।......ইহা হইতেই বোধ হয়, দেবতাদের জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-সন্ন্যাসীর মূর্তি ধরিয়া দেখা দিবার কথা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল।" [১৯] যাহা হোক, এই অনিত্যতার উপলব্ধির দরুণ সিদ্ধার্থের মন আবার দ্বন্দ্বসংকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়বান চিন্তাশীল যুবক সিদ্ধার্থের মানস-সমুদ্রে বারে বারে তরঙ্গ-সংক্ষোভ জাগিতেছে ; একদিকে সংসার-নন্দনলোকের দুর্বার আকর্ষণ, অন্যদিকে ক্রন্দনময় আর্ত ধরণীর আকুল আহ্বান সেই সমুদ্রের তটভূমিতে বারম্বার আছড়াইয়া মরিতেছে—এই

নাটকীয় চিত্ত-সংঘাত অবলম্বনে নবীনচন্দ্র যে আবেগ-মুখর সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সত্যই উপভোগ্য।

না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিন জন—
বৃদ্ধ পিতামাতা, ওই আর
তাঁহার প্রাণের গোপা, তাঁহার প্রেমের গোপা,
কিবা তিন মূর্তি-করুণার!
* * * *
তাদের পশ্চাতে হায়! কিন্তু ওকি দেখা যায়—
নরনারী অনন্ত অপার!
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার,
মাগিতেছে করুণা তাঁহার।

অষ্টম সর্গে (মহানিশি) 'রাহুল-জন্ম' ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য-দ্বন্দ্বকে আরও গভীরতর করিয়া তোলা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র এই দ্বন্দ্বের সঙ্গতিপূর্ণ পরিপূরকরূপে সুষুপ্তা নর্তকীদিগের স্রস্ত বসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি দর্শনে ঘৃণায় সিদ্ধার্থের সেই স্থান হইতে পলায়নের বহুশ্রুত কাহিনীটুকুও বর্ণনা করিয়াছেন; যদিও পালি-শাস্ত্রে এ ঘটনা যশ নামক একজন ধনীপুত্র বুদ্ধ-শিষ্যের জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

নবম সর্গে (বিদায়) পিতার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণের দৃশ্যে সংসারের সমস্ত কারুণ্য যেন মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

প্রণমিলা পিতৃপদে পুত্র ভক্তিভরে।
সুপবিত্র পদতীর্থে পুত্রের মস্তক
সুপ্রণত; পাদপদ্মে করপদ্মদ্বয়
কুমারের; করপদ্ম পুত্রের মস্তকে
জনকের; কুমারের চক্ষু ছলছল,
জনকের অশ্রুধারা বহিছে ধারায়।

এইখানে সংসার-বিরাগীর চিত্রকেই বড় করিয়া দেখিব, না সংসারাশ্রয়ী প্রিয়জনের স্নেহদুর্বল মায়াবন্ধনজড়িত একটি মানুষের মলিন মুখচ্ছবি অবলোকন করিব? তেমনি দশম সর্গে বর্ণিত 'মহানিষ্ক্রমণ' সিদ্ধার্থের জীবন-নাট্যের climax বা চরম মুহূর্ত। এখানে শেষবারের মত পত্নীপুত্রের মুখ-

নিরীক্ষণকালে সিদ্ধার্থ যেন মায়াসিক্ত সংসারের বেদনারহস্যটুকু নীরবে উপলব্ধি করিলেন—

এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল ; ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।

শেষ চরণটির ব্যঞ্জনাময় মিতভাষিতা লক্ষণীয়। মুহূর্তমাত্র পূর্বে পিতার নিকটে যে 'কুমারের চক্ষু ছলছল', এই ক্ষণে সেই রুদ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস দুইটি অশ্রুবিন্দুতে ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া যেন আর পারিল না। বৈরাগ্য-সংকল্পে অবিচল সিদ্ধার্থ মায়ার গভীর প্রভাব বুঝিলেন ; তাই ঔদ্ধত্যে নয়, ঘৃণায় নয়, অস্বীকারে নয়,—শান্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া শেষবারের মত মায়াপাশ ছিন্ন করিলেন 'মায়ার চরণে'ই স্নেহ-ব্যাকুলতার শেষ চিহ্ন রাখিয়া। কাব্যে নবীনচন্দ্রের অতিভাষণের অপবাদ স্থায়ী হইয়া আছে, কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহে তাঁহার রচনার গভীরে প্রবেশ করিয়া আমরা কি কখনো এই সব উজ্জ্বল অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না—যেখানে স্বল্প কথায় গভীর ভাব-প্রকাশেও নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ?

একাদশ সর্গে (নবীন সন্ন্যাসী) রাজপুরী হইতে বহুদূরে নদীতীরে সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসীবেশ ধারণ ও ছন্দক হইতে বিদায় গ্রহণ। দ্বাদশ সর্গে (যৌবনে যোগিনী) মুখ্যতঃ বিষাদিনী গোপার শোকচিত্র, এবং সেই সূত্রে পিতামাতা ও সমগ্র পুরীর শোকোচ্ছ্বাসও বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে কবির মনে চৈতন্য-সন্ন্যাসের পরে নবদ্বীপের বিষাদ-চিত্রটি যেন জাগিয়াছিল। রচনার দিক দিয়া এই সর্গটি দুর্বল ও বাহুল্যপূর্ণ মনে হয়। গম্ভীর পয়ার-স্রোতের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘত্রিপদীর বিলম্বিত গতি বিষয়বস্তুর কারুণ্য-মহিমাকে সুন্দর বহন করিয়া চলিতেছিল, কিন্তু এই সর্গে লঘু-ত্রিপদীর লঘুতা যেন সেই দৃঢ় সংবদ্ধ ভাবাবেগকে অনেকটা শিথিল করিয়া দিল। আবার সর্গটির অহেতুক বিস্তৃতি মহাসন্ন্যাসের উপযোগী মহাশোককে যেন সাধারণ পুত্রবিয়োগবিলাপে পরিণত করিয়াছে। এই বিলাপচিত্র অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধ-চরিতে'র অন্তঃপুরবিলাপ-নামক অষ্টম সর্গটির কথা মনে করাইয়া দেয়। 'বুদ্ধ-চরিতে' সমগ্র অন্তঃপুর শোক-জর্জরিত, সিদ্ধার্থ-পত্নী যশোধরার ভাষালঙ্কারপূর্ণ আকুল ক্রন্দনও তাই অন্তঃপুরবিলাপের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'অমিতাভে' এই সর্গটির নামকরণেই তাহার মূল লক্ষ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে, —'যৌবনে যোগিনী' গোপা। তাই গোপা এখানে বাক্যহীনা, সমস্ত শোকের ঝড় তাহার অন্তরে স্তম্ভিত, স্বামীর আদর্শ বা mission-এর অনুকূল সাধনাই তাহাকে শোকবিজয়িনী করিয়াছে।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সর্গ ব্যাপিয়া সিদ্ধার্থের প্রব্রজ্যা, আরাড়কালাম সঙ্গ, রাজগৃহে বাস ও বিম্বিসার সাক্ষাৎ, গয়াগমন, নিরঞ্জনাতীরে কৃচ্ছ্রসাধন ও দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল বিফল ধ্যান, নির্বাণলাভ-বিষয়ে হতাশার মুহূর্তে 'মার'-এর আবির্ভাব ও মার-বিজয় প্রভৃতি সুপরিজ্ঞাত ঘটনাসমূহ যথোচিত গাম্ভীর্য-সহকারে উপযুক্ত পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-সন্ন্যাসী'-দর্শন কাহিনীর মত 'মার'-প্রলোভন কাহিনীর বাস্তবতাও ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা উহার সম্পর্কে বলেন: "মজ্‌ঝিম-নিকায়ের দ্বেধাবিতক্ক-সুত্তে বুদ্ধ বোধিলাভের পূর্বে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-গুলির সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় মার-প্রলোভন কাহিনীর মূল।"[২০] আবার "This battle, of course, was a metaphorical conflict between the higher and the lower aspirations of Gautama's mind."[২১] লক্ষ্য করিবার বিষয়—ঐতিহাসিকের মন্তব্য না জানিয়াও নবীনচন্দ্র মারের আবির্ভাবের জন্য যে মনস্তত্ত্বসম্মত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বাস্তবতাবোধের পরিচয় মিলে,—

> কিন্তু তপস্যায় হায়! কোথায় উদ্ধার পথ?
> ঝুলিতেছে সেই কর মস্তক উপরে!
> এই তপস্যার ক্লেশ! এই ক্লেশে এই মৃত্যু!
> বনে বন্যপশুদের হইয়া আহার,
> কি ফল ফলিবে হায়!—আন্দোলিত সিদ্ধার্থের
> হৃদয়ে কামনা পুনঃ হইল সঞ্চার।
> ধীরে ধীরে সেই কাম বাড়িল; হইল ধীরে
> মূর্তিমান, সেই কাম কিবা মনোহর!

পঞ্চদশ সর্গে (সিদ্ধি) সুজাতার ('বুদ্ধ-চরিত'-মতে নন্দবলা) পায়সান্ন গ্রহণ, বোধিলাভ—প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দুঃখ-উদয়ের হেতু অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কবি

বুদ্ধের নবলব্ধ বোধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। জীবন-সাধনের সঙ্গে এই জীবন-দর্শনের যোগে কাব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবলব্ধ সত্যপ্রচার সম্পর্কে অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়লাভ, বারাণসীতে পূর্বের শিষ্যপঞ্চককে এবং রাজগৃহে বিম্বিসারকে দীক্ষাদান প্রভৃতি ষোড়শ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ (সংসার-শ্মশান) গাম্ভীর্যে ও কারুণ্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, বিষয়বস্তুও এখানে বাস্তব সংসারের স্নেহরসনিষিক্ত, এবং সেই পরিবেশের বর্ণনায় ফিরিয়া আসিলে নবীনচন্দ্রের লেখনী যেন স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি পায়। বাণী-প্রচাররত বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নগরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
গৈরিকে আবৃত হেম-বপু-জ্যোতির্ময়।

* * *

নরনারী-অশ্রুজলে ভিজিতেছে ভিক্ষাপাত্র,
হইল কপিলাবস্তু পূর্ণ হাহাকারে।

পিতা মাতা ও বেদনাক্লিষ্ট শাক্যপুরীকে বুদ্ধদেব নিজ সত্যধর্মে প্রবুদ্ধ করিলেন—

কিন্তু গোপা?—কোথা গোপা? ভূতলে পাতিয়া বুক
নিজ কক্ষে পুণ্যবতী ধ্যানে নিমগন।

* * *

সিদ্ধার্থ, সশিষ্য দুই, আসিলেন ধীরে ধীরে
দেব অংশুমালী যথা কক্ষেতে উষার!

* * *

নীরব নিস্পন্দ স্থির বুদ্ধদেব, শিষ্যদ্বয়;
নীরব নিস্পন্দ গোপা ধরি পদমূল,
দিবার প্রতিমা যেন দিবাকর পদতলে;
অষ্টম-বর্ষীয় শিশু নীরব 'রাহুল';

উক্ত উদ্ধৃতিতে মৌন বেদনার যে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, একবার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেই যথেষ্ট। 'দেব অংশুমালী যথা কক্ষেতে উষার', এবং 'দিবার প্রতিমা যেন দিবাকর পদতলে'—উৎপ্রেক্ষালঙ্কার-মণ্ডিত এই চরণদ্বয় যথাক্রমে বুদ্ধদেবের মহিমান্বিত রূপ এবং গোপার আত্মসমর্পিতা কল্যাণী মূর্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

পরবর্তী অংশে বর্ণিত রাহুল ও গোপার অশ্রুবিসর্জন স্বাভাবিক, কিন্তু রাহুলের প্রার্থনাপূরণার্থে 'পিতৃধন' দানে উদ্যত বুদ্ধদেবের গাম্ভীর্যের পশ্চাতে বেদনার বাত্যা স্তম্ভিত হইয়া রহে নাই কী? সমগ্র দৃশ্যটির বর্ণনায় নবীনচন্দ্র যে ঘনীভূত জীবনরস-সঞ্চারে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়—'নবীনবাবু বর্ণনায় একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।'

অষ্টাদশ সর্গে (লোকশিক্ষা) প্রেম, সহিষ্ণুতা, যুক্তি ও উপদেশের আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধদেবের পূর্ণ মহামানবরূপ প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার করুণা-বিতরণের বিচিত্র কাহিনীও অলৌকিকতার স্পর্শহীন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন—Edwin Arnold শুদ্ধোদন, গোপা, রাহুল প্রভৃতির দীক্ষা-গ্রহণ ঘটনাতেই তাঁহার Light of Asia কাব্য শেষ করিয়াছেন, আর তাহারই অনুসরণে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটকও অনুরূপ ঘটনাতেই শেষ হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুদ্ধদেবের জীবনের mission বা উদ্দেশ্যসিদ্ধি সূচিত হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধজীবনের পূর্ণতার জন্য 'মহাপরিনির্বাণ' অপরিহার্য। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে 'মহানির্বাণ' পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া বুদ্ধলীলার সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। আমাদের দেশে সাধারণ গৃহী ব্যক্তির মতই ধর্মগুরুদেরও স্বাভাবিক মৃত্যু কল্পনা করিতে ভক্তগণ বেদনাবোধ করেন। তাই অলৌকিকতার আবরণে তাঁহাদের অন্তিমকালকে আচ্ছন্ন রাখা হয়, অথবা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকা হয়। ভক্তবৈষ্ণব-রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনীসমূহে তাঁহার স্বাভাবিক তিরোধান বর্ণিত হয় নাই। আবার বুদ্ধদেবের স্বাভাবিক তিরোধান বৌদ্ধেরা মানিয়া লইলেও নানাভাবে উহাকে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত করার প্রয়াস বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। 'দীঘনিকায়ো'র অন্তর্গত 'মহাপরিনির্বাণ সুত্ত' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ দেড় বৎসরের ঘটনা ও পরিনির্বাণের বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু উহাতেও বুদ্ধজীবনকথা একেবারে অলৌকিকতাবর্জিতভাবে বিবৃত হয় নাই। তন্মধ্যে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধদেবের বিনা ভেলায় গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া অন্যতম (১ম অধ্যায়)। সারিপুত্তের নিজ মাতাকে বিভূতিপ্রদর্শন (২য় অধ্যায়), মুমূর্ষু বুদ্ধদেবের তৃষ্ণা অপনোদনের জন্য পঙ্কিল জল নির্মল হওয়া (৪র্থ অধ্যায়), নির্বাণোন্মুখ বুদ্ধদেবকে দর্শনের জন্য দশলোকধাতুর দেবগণের সমাবেশ ও দর্শনের অন্তরায়স্বরূপ উপবাণের অপসারণ (৫ম অধ্যায়), ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভীষণ রোমাঞ্চকর মহাভূমিকম্প সংঘটন এবং বজ্রনির্ঘোষ

(৬ষ্ঠ অধ্যায়), দৈব-অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বুদ্ধদেবের মৃতদেহ প্রধান অষ্টমল্লেরও দুর্বহ হওয়া (৬ষ্ঠ অধ্যায়), সশিষ্য মহাকশ্যপের আগমনের পূর্বে বহু চেষ্টায়ও চিতা প্রজ্বলিত না হওয়া (৬ষ্ঠ অধ্যায়) প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

আবার তিরোধান-বর্ণনায় দেখি,—স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ-কর্তৃক আয়োজিত উত্তম খাদ্য ও সূকরমদ্দব ভোজনের পরমুহূর্তেই ভগবান বুদ্ধদেব রক্তামাশয়হেতু তীব্র যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন।[২২] কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, বর্ণনাটুকু একান্ত বাস্তবধরণের হইলেও এই ঘটনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস উক্ত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। টীকাকার এই ঘটনার গূঢ়ার্থ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন: "দেবগণ জানেন যে, ভগবানের অদ্যকার আহারই শেষ আহার, তিনি আর আহার গ্রহণ করিবেন না। সেই হেতু......দেবগণ সূকরমদ্দবে দিব্য ওজঃ প্রক্ষেপ করেন। তজ্জন্য তাহা অতি গুরু ভোজনে পরিণত হইয়াছিল। সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যের তাহা জীর্ণ করা অসম্ভব। ......ভগবান সূকরমদ্দব ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই।"[২৩] সমগ্র ঘটনাটিই এইভাবে এক অলৌকিক মহিমামণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই কি?

নবীনচন্দ্র কিন্তু তাঁহার কাব্যে তিরোধানের সত্য ঘটনাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, কোনরূপ অলৌকিক অস্পষ্টতার আশ্রয় লন নাই;

> পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
> দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা—ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান
> নহে ধর্ম শ্রমণের—করিয়া গ্রহণ
> হইয়া পীড়িত, কুশিনগরে আসিয়া
> শুইলেন শালবনে অন্তিম শয়নে।

ভিক্ষা বা আমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যান কেবল শ্রমণের পক্ষেই অধর্ম নহে, আমন্ত্রণ-উপেক্ষা সামাজিক ব্যক্তির পক্ষেও নিঃসন্দেহ অশোভন। এইভাবে নবীনচন্দ্র বুদ্ধদেবের শিষ্যস্নেহ এবং লোকসৌজন্যবোধকে করুণার রসে ভরিয়া তুলিয়াছেন। আবার সামাজিক মানুষের মতই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইলেও মহাপুরুষদের তিরোভাব তাঁহাদের সজ্ঞান-উপলব্ধিগোচর—নবীনচন্দ্র এই বিশ্বাসেরও যেমন অন্যথা করেন নাই, তেমনি সেই ঘটনাকে শাস্ত্রকারদের মত অলৌকিক মহিমায়ও আচ্ছন্ন করেন নাই।

দেখিলেন বুদ্ধদেব জীবলীলা শেষ—
শেষ জন্ম ; ইচ্ছিলেন নির্বাণ তখন,
আসিল পবিত্র নিশি মহানির্বাণের।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ঘটনারও রহস্যমণ্ডিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব নাকি তিনবার আনন্দকে জানাইয়াছিলেন—তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন। আনন্দ মার-প্রভাবে সেই স্পষ্ট আভাস বুঝিলেন না বলিয়া লোকহিতার্থে তাঁহাকে কিছুকাল জীবিত থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন না। পরে মার-প্রভাবমুক্ত আনন্দের প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ-সংকল্পই রক্ষা করিলেন।[২৪] এইরূপ হেঁয়ালী সৃষ্টি করিয়া আনন্দকে তিরস্কারভাগী করিবার হেতু জনৈক ঐতিহাসিক ঠিকই অনুমান করিয়াছেন: "বোধ হয় সাধারণলোকের মত বুদ্ধেরও মৃত্যু হইয়াছিল, ইহাতে লজ্জিত বোধ করিয়া শাস্ত্রকাররা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল বটে, তবে ইচ্ছা করিলে নাও মরিতে পারিতেন।"[২৫]

সুতরাং বুদ্ধদেবকে 'অতিমানুষিক' রূপে নয়, মানুষ-রূপে উপস্থাপিত করিবার যে সংকল্প নবীনচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বাপর যথোচিত নিষ্ঠাসহকারে তিনি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা।

'অমিতাভে'র উনবিংশ অর্থাৎ শেষ সর্গে 'মহানির্বাণ'-মুহূর্তে বুদ্ধদেবের মুখে নবীনচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের যে সার-ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উপলব্ধির গভীরতা এবং ধর্মতত্ত্বের কাব্যরূপায়ণক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য বিষয়বস্তুর সহিত যে তদ্গতচিত্ততার প্রয়োজন, নবীনচন্দ্রের তাহা ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ তিব্বত-পর্যটক শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় নাকি এই অংশটিকে আদিষ্ট (inspired) বলিয়াছিলেন,[২৬] নবীনচন্দ্র নিজেও উহাকে আবিষ্ট-অবস্থায় রচিত বলিয়াছেন।[২৭] Edwin Arnold-ও তাঁহার কাব্যের শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের মুখে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মর্মবাণী অপূর্ব কবিত্বপূর্ণভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন: "The views here indicated of 'Nirvana', 'Dharma', 'Karma' and the other chief features of Buddhism are atleast the fruit of considerable study and also of a firm conviction."[২৮] সুতরাং Arnold এবং নবীনচন্দ্র—উভয়েরই রচনামূলে অধ্যয়ন বিশ্বাস ও উপলব্ধি ক্রিয়াশীল ছিল দেখা যায়। ধর্মের মূলতত্ত্ব কাব্যের পরিশেষে সংযোজনের আদর্শও নবীনচন্দ্র

Arnold হইতে পাইয়াছিলেন মনে হয়। তবে কয়েকটি শ্লোকের ভাববস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের উপস্থাপনার মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। Arnold যে বক্তব্য শতাধিক শ্লোক জুড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাহা অনধিক অর্ধশত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। Arnold-এ প্রথমাংশে যে দীর্ঘ দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যার প্রয়াস আছে, নবীনচন্দ্র তাহা অতি অল্প পরিসরে প্রকাশ করিয়াছেন। Arnold-এ মূলধর্মনীতির কথাও আছে, তবে সর্বব্যাপী এক দার্শনিক ব্যাখ্যা-প্রবণতা তাহাতে বিরাজমান। নবীনচন্দ্র বৌদ্ধদর্শন অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিসমূহের উপরই যে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, এক হিসাবে তাহা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা—"বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধের প্রবর্তিত নয়, বৌদ্ধদের প্রবর্তিত দর্শন।"[২৯] তাই নবীনচন্দ্র বুদ্ধের মুখঃনিসৃত বাণীতে তৎপ্রচারিত 'চত্বারি আর্য সত্যানি,' 'আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ', 'শীলাচরণ' প্রভৃতি নীতিকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন।

(গ) অমৃতাভ

'অমৃতাভ' নবীনচন্দ্রের শেষ কাব্য। নানাকারণে দ্বাদশ সর্গ পর্যন্ত রচনা করিয়াও কবি উহা তাঁহার জীবদ্দশায় শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভূমিকাসহ অসম্পূর্ণভাবেই উহা প্রকাশিত হয়। 'অমিতাভে'র শেষে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

যাও দেব। লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেইলীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী। আসিলে আবার
সরল মানব শিশু জর্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।

আসিয়া আবার
পতিত পাবনী-তীরে পতিত পাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময়! এই আশা করিও পূরণ।

'রঙ্গমতী'র পর হইতেই বহির্মুখ নবীনচন্দ্র ক্রমেই অন্তর্মুখ হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি। তৎকালীন স্বদেশচেতনা এবং প্রেমবেদনা পরে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল না, বরং জাতীয় জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের প্রকৃতি-নিরূপণে সহায়ক হইল, আর তাহারই পরিণতিরূপে মহাজীবনসাধকদের মহিমা-অনুধ্যানে নবীনচন্দ্রকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অনুধ্যানের ফল পূর্বোদ্ধৃত কাব্যাংশটিতে সুন্দর বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক সূত্রের মত ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাব্যত্রয়ীর কৃষ্ণলীলা—'কোমল কঠোর', অমিতাভের লীলা—'আত্মবিসর্জন', খৃষ্টের লীলা—'আত্ম-বলিদান', আর চৈতন্যের লীলা—'করুণ'। বিপর্যয়ক্লিষ্ট বিষাদময় শেষজীবনে নবীনচন্দ্র এই করুণ-লীলা রচনায় তৎপর হইলেন। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অমিতাভের উপসংহারে আমি বলিয়াছি যে, ...আমার আর কেবল তাঁহার কাঙ্গাল গৌরমূর্তি মাত্র দেখিবার আকাঙ্ক্ষা।"[৮০] এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছে 'অমৃতাভে'।

বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিরসবিহ্বলতায় নবীনচন্দ্র যে বিভোর ছিলেন, তাহার পরিচয় 'কাব্যত্রয়ী'তে, বিশেষতঃ 'প্রভাসে' সুস্পষ্টভাবেই আমরা পাইয়াছি। 'ভানুমতী' উপন্যাসেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি নবীনচন্দ্রের প্রবণতা লক্ষণীয়। তাঁহার কাব্যের আবেগোচ্ছলতাও আংশিকভাবে কবিমর্মের এই বৈষ্ণবীয় রসাবেশ-সঞ্জাত বলিয়া মনে হয়। নবীনচন্দ্র "soared with thrilling ecstasy of a vaisnava in his attempt to see everything in the unerring light of his love."[৮১] সুতরাং বৈষ্ণব প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ উহার মূর্ত-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনাতেই কবি যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দবোধ করিয়াছিলেন বেশী, এবং এই কারণেই চৈতন্য জীবন-কাব্য 'অমৃতাভ' উল্লেখযোগ্য।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রে এমন এক বিরাট আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছিল যে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই তাঁহার জীবনলীলা বাংলা কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হইয়া আছে। ভক্ত গোস্বামীদের রচিত প্রামাণ্য চৈতন্যলীলা-কাব্যসমূহের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে পুনরায় চৈতন্যচরিত্রের অভিনব কাব্যরূপ দেন নবীনচন্দ্র। এই রূপায়ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাই উহা ঠিক 'চৈতন্যলীলা-কীর্তন' না হইয়া 'চৈতন্যজীবন-রসায়ন' হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ 'অমৃতাভ' নামটিও লক্ষণীয়। নূতন আর একটি ভাগবত, মঙ্গল বা চরিতামৃত নহে,—সেই সমস্ত আকর-গ্রন্থের পরেও যাহা বাকী ছিল,—মানুষের অমৃতময় সত্তার বিকীরিত আভা মানবমহিমা-উদ্বুদ্ধ এই যুগচিত্তে যে প্রেমভক্তি উজ্জীবিত করিয়াছে, যে মিলন-মন্ত্র ধ্বনিয়া তুলিয়াছে, তাহার সহিত ষোড়শ শতাব্দীর অধ্যাত্ম-জাগরণ যে একই সূত্রে গ্রথিত,—তাহা শুধু যুক্তি দিয়া নহে, গভীর উপলব্ধির রসে জারিত করিয়া প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। নবীনচন্দ্রের কবিমানস স্বদেশ, প্রেম, ধর্মচেতনার স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে যে ভাবে মানব-করুণা ও ভাগবতী-প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে মনে হয়—এই কৃত্যটুকু বুঝি তাঁহারই জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। 'জীবনী-কাব্য' রচনায় নবীনচন্দ্রের যাহা মূল আদর্শ—মহাপুরুষদের যথাসম্ভব মানুষী-রূপ উদ্‌ঘাটন—তাহা এক্ষেত্রেও অনুসৃত হইয়াছে, অথচ তদ্দ্বারা লোকোত্তর পুরুষ একেবারে লোকায়তও হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার মাহাত্ম্য মানব-অনুভূতিবেদ্য হওয়ায় বরং মধুর হইয়াছে। বৈষ্ণবযুগের চরিতকাব্যসমূহ যথার্থ বৈষ্ণবভক্তগণ কর্তৃক রচিত, তাঁহাদের জীবনব্যাপী ধর্মসাধনা তাহাতেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের ধ্যানে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—তাই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনুরূপ অলৌকিক লীলা কিছু কিছু তাঁহাদের কাব্যের লীলাপুরুষ চৈতন্যদেবের জীবনে আরোপ এবং উহার ভক্তজনসম্ভব ব্যাখ্যান সেখানে সুসঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, নবীনচন্দ্রের বৈষ্ণবানুরক্তি গভীর আন্তরিকতা-প্রসূত হইলেও তিনি ধর্মতঃ বৈষ্ণব নহেন, সেই কারণে লীলাময় গৌরাঙ্গ হইতেও করুণাকাতর প্রেমাশ্রুবিগলিত মানবশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেবই তাঁহাকে অধিক অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাই চৈতন্য-মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র—

বিনা হরিনাম না ঘুমায় শিশু,
নাহি করে শিশু মাতৃস্তন্য পান।
দেয় হামাগুড়ি আনন্দে অধীর,
যদি কেহ গায় সুমধুর নাম।

এইটুকু ব্যতীত আর কোন অমানুষিক লীলার বর্ণনা করেন নাই। এই লীলাটুকুরও একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বর্ণবৈচিত্র্য ও ধ্বনিমাধুর্যের প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও আকর্ষণ থাকে। ক্রন্দনরত শিশু উজ্জ্বল খেলনায় প্রলুব্ধ হয়, আবার মধুর মাতৃকণ্ঠ-ধ্বনিতে হাসিয়া উঠে। সঙ্গীতমুখর পরিবারে পরিবেশ-প্রভাবেই শিশু সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে স্বজন-প্রতিবেশীদের অহোরাত্র সুমধুর হরিনামধ্বনির মধ্যেই নিমাইএর জন্ম, সুতরাং অর্থবোধের অতীত হরিনাম সঙ্গীতধ্বনিতে আশৈশব তাঁহার কর্ণকুহর এমন পরিপূরিত হইতেছিল যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করার জন্য ঐ উপায় খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

'অমৃতাভ'-রচনায় নবীনচন্দ্র তথ্যের জন্য প্রধানতঃ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত'-এর উপরই নির্ভর করিয়াছেন। এইরূপ জীবনীকাব্যে সুপরিজ্ঞাত তথ্যাদির যেমন বিকৃতি ঘটানো চলে না, তেমনি মৌলিকতা প্রদর্শনের অবকাশও ইহাতে নাই; তবে কবির বিশেষ ধারণা ও ভাবনার অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গীতে চরিত্রটি দেখা চলে। প্রবীণ কবি নবীনচন্দ্র এ-যুগের কাব্যের বাচনভঙ্গী, রূপকৌশল এবং পরিবেশ-সৃষ্টিচাতুর্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানব চৈতন্যদেবের চরিত্রকে এক ভক্তি-মধুর রূপ দান করিয়াছেন। করুণরসই 'অমৃতাভ'-এর প্রধান রস, এবং এই করুণরস বর্ণনাতেই নবীনচন্দ্র পূর্বাপর সিদ্ধহস্ত। ভক্তবৈষ্ণব কর্তৃক রচিত চৈতন্যচরিত-কাব্যসমূহের মধ্যে কবি লোচনদাসের কাব্য সমধিক কবিত্বসমণ্ডিত, আলঙ্কারিক বর্ণনায় উজ্জ্বল এবং কারুণ্যে স্নিগ্ধ। নবীনচন্দ্রের কাব্যও বর্ণনাপ্রধান, সংযত এবং ভাবগম্ভীর, স্বাভাবিক বেদনারস-মাধুর্যে ভরপুর। বৈষ্ণব মহাজনদিগের জীবনকাব্য রচনার আদর্শ ছিল তৎকাল-প্রচলিত মঙ্গলকাব্যসমূহ। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু উপস্থাপনার বর্ণনাত্মক রীতি, অংশবিশেষের সবিস্তার আলোচনা, কখনও কখনও অপ্রধান বিষয়ের প্রাধান্য প্রভৃতি ঐ সমস্ত কাব্যেও অল্প বিস্তর অনুসৃত হইয়াছে; আবার অন্যদিকে উহারা কাব্যাকারে ধর্মগ্রন্থ এবং সেই মর্যাদায় বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত। কিন্তু নবীনচন্দ্রের

কাব্যকে আধুনিক রীতিতে রচিত বর্ণনাত্মক গাথা-কাব্য বলা চলে। উহাতে ধর্মভাব হইতেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে মহামানবের দীপ্তি, সৌন্দর্য ও লোককরুণা—জীবনের বিচিত্র রসস্পর্শে তাহা সঞ্জীবিত। সুতরাং উভয় যুগের কালগত ও ভাবনাগত দূরত্বও যেমন কম নয়, তেমনি উভয় কাব্যরীতির আদর্শও পৃথক।

মনে রাখিতে হইবে, 'অমৃতাভ' 'অমিতাভে'র সহোদর, অন্তঃপ্রকৃতিতে ও আদর্শে উভয়েই অভিন্ন। কেবল অগ্রজ 'অমিতাভ' কবিত্ব-প্রত্যয়সিদ্ধ প্রৌঢ় নবীনচন্দ্রের আবিষ্ট চিত্তের সৃষ্টি, আর অনুজ 'অমৃতাভ' জীবন-সায়াহ্নে ক্ষয়িত-শক্তি, ভগ্নহৃদয় নবীনচন্দ্রের পূর্বসংকল্প-সাধন ব্যগ্রতার অসম্পূর্ণ ফল। সুতরাং 'অমিতাভে'র ভাবগাম্ভীর্য এবং ভাষা ও ছন্দের সৌন্দর্য 'অমৃতাভে' আশা করা যায় না। অন্যান্য শক্তির মত কবিত্বশক্তিও ক্ষয়িষ্ণু। কবি মধুসূদনের প্রতিভার ক্ষুরধার দীপ্তি মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য জগতে একমাত্র রবীন্দ্রপ্রতিভাই ছিল শেষ পর্যন্ত নবনবোন্মেষ-শালিনী। নবীনচন্দ্রের উদ্দাম রচনাশক্তিও ক্রমে সংহত হইয়া আসিয়াছিল, 'অমৃতাভ' রচনার মন্থরগতিই তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই সর্বশেষ অসম্পূর্ণ কাব্য নবীনচন্দ্রের কবিকীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন নহে, তবে আন্তরিকতার স্পর্শে তাহা সজীব, করুণাধারায় সিক্ত।

প্রথম সর্গে বাসন্তী-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপময় আনন্দ-উৎসবের মনোজ্ঞ বর্ণনা দেখিতে পাই, এইরূপ বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের লেখনী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই সুন্দর উপমায় ফুটিয়া উঠিল নবজাতকের আভাস,—

> গ্রহণান্তে ধীরে পূর্ণচন্দ্র ভাসে
> বসন্তের নীল নির্মল আকাশে।
> প্রসবান্তে নর অদৃষ্ট-আকাশে
> কি অমিয় হাসি শিশু-চন্দ্র হাসে!

আবার শিশু-গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা সুপরিচিত বৈষ্ণবপদের ছায়াপাতে ব্যঞ্জনাময়—

> হেন গৌরবর্ণ দেখে নাই কেহ,
> অঙ্গে কাঁচা সোনা গলিয়া বয়,*

---

* তুঃ— ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।—গোবিন্দদাস

বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণ-চম্পকের,*

হলো 'গৌর' নাম নবদ্বীপময়।

'বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণ-চম্পকের'—অপহ্নুতি অলঙ্কারের এই চমৎকার নিদর্শন উপভোগ্য।

অতঃপর নিমাই-এর শৈশবলীলার বর্ণনা। নিমাই-এর শিশুসুলভ দৌরাত্ম্যে নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা অস্থির। পূর্বেই বলিয়াছি—'অমৃতাভ' করুণরসপ্রধানকাব্য, কিন্তু এই করুণরস-প্রবাহের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে কবি কখনো কখনো হাস্যরসের উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবর্তিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে পাঠকচিত্তে ক্ষণে ক্ষণে হাসির আলো ঝলসিয়া উঠে। মহাশাক্ত আগমবাগীশের সমস্ত পূজায়োজন দুরন্ত বালক নিমাই-এর অনুচরগণ কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধের বর্ণনা কৌতুক সঞ্চার করে।

প্রকাণ্ড উদর রক্ত-বস্ত্রাবৃত,

মদিরায় দুই আরক্ত নয়ন,

দোলায়ে উদর আস্ফালিছে অসি,

মস্তকে টিকির অপূর্ব নর্তন।

তৃতীয় সর্গে নিমাই-এর অগ্রজ বিশ্বরূপের বৈরাগ্য ও সংসার-ত্যাগের বর্ণনায় অপূর্ব গাম্ভীর্যময় পরিবেশ রচিত হইয়াছে। বিশ্বরূপের অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্যই নাটকীয়।

না না, আমি যাব আগে, দেখাইব তারে

তাহার নিয়তি রেখা ভাগীরথী মত,

নিমাই এ মরুভূমি করিবে উদ্ধার

পতিতপাবনী সুধা ঢালি অবিরত।

চতুর্থ সর্গে নিমাই-এর উপনয়ন-অনুষ্ঠান বর্ণনায় গায়ত্রীর নিম্নোদ্ধৃত মর্মানুবাদ—

কহিলা গায়ত্রী—"স্বর্গ-পৃথিবী-আকাশ

ব্যাপিয়া আছেন যিনি, আমাদের জ্ঞান

করেন প্রকাশ যিনি, সেই সবিতার

বরণীয় আলোকের করি আমি ধ্যান।"†

* তুঃ— চম্পক শোন- কুসুম কণকাচল

জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।—গোবিন্দদাস

† 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

ঋগ্‌বেদ—৩।৬২।১০

এবং গায়ত্রীমন্ত্রের মহিমা-জ্ঞাপক শ্লোকসমূহ ভাষায় ও ছন্দে যেন বৈদিক গাম্ভীর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, নবীনচন্দ্রের এই সর্বশেষ কাব্যটি বুঝি শুধুমাত্র কাব্যপ্রয়াস নয়—ইহার উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ভিন্নতর। তিনি এখানে মন্ত্রাদিষ্ট, ভাবাবিষ্ট; তাঁহার যৌবনের প্রচণ্ড উন্মাদনা পরিণত বয়সে জীবনীকাব্যসমূহ রচনার কালে যেন ভক্তির স্নিগ্ধ মাধুর্যে সমাহিত হইয়াছে।

এই সর্গেই জগন্নাথ মিশ্রের পরলোকগমন ও নিমাই-এর তজ্জনিত শোকের করুণ চিত্র নবীনচন্দ্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বিয়োগ-কারুণ্য বর্ণনায় বৈষ্ণব-জীবনীকারগণ সচরাচর অনিচ্ছুক ছিলেন, পূর্বে 'অমিতাভ'-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর কথা ইঙ্গিতে মাত্র ব্যক্ত করিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

হেনমত কতদিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্য শুদ্ধ কলেবর।

* * *

দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিলা সংক্ষেপে॥[৩২]

এ যুগের কবি নবীনচন্দ্র মহাপ্রভুর জীবন ও ঘটনাসমূহকে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই করুণরসসৃষ্টির উপযোগী মুহূর্তগুলি বৃথা যাইতে দেন নাই। গভীর বেদনায় নিমাই দেখিলেন—

অরে জরাজীর্ণ দেহ পড়িল ভাঙ্গিয়া
জনকের, উপস্থিত অন্তিম সময়।
গেছে ভ্রাতা, যায় পিতা; হইয়া আকুল
পড়িল ভাঙ্গিয়া শিশু কোমল হৃদয়।

তেমনি নিমাই-এর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথাও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিয়াছেন রূপক-অলঙ্কারের সহায়তায়—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্পবিষে তার পরলোক হৈল॥[৩৩]

কিন্তু নবীনচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি, পূর্ববঙ্গপ্রত্যাগত নিমাই-এর নিকট পুত্রবধূ লক্ষ্মীর বিয়োগ-সংবাদ দিতে গিয়া শচীদেবীর মাতৃহৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—

কাল সর্পে না খাইয়া দুঃখিনী আমায়,
খাইল আমার সেই স্বর্ণ-প্রতিমায়?

পঞ্চম সর্গে পরম পণ্ডিত নিমাই-এর পাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যান এবং সেই সঙ্গে 'কৌতুকীর চূড়ামণি' নিমাই-এর রহস্যপ্রিয়তার চিত্র বিশেষ উপভোগ্য। নিমাই-এর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গে তথাকার নিসর্গ-সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত সুনিপুণ বর্ণনাই শুধু দেওয়া হয় নাই, সেই দেশের অন্তর্প্রকৃতিও সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

ভাবগ্রাহী পূর্ববঙ্গ, হৃদয় কোমল
পদ্মার বেগের মত আবেগ-প্রবল।
জ্ঞান-শুষ্ক নবদ্বীপ, পুলিনে পদ্মার
করিলেন ভক্তিধর্ম প্রথম প্রচার।

তারপর গয়া-প্রত্যাবৃত্ত নিমাই-এর লক্ষণীয় ভাবান্তর এবং কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততার অপূর্ব বিশ্লেষণে ষষ্ঠ সর্গের 'পূর্বরাগ' নামকরণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে। পরবর্তী দুইটি সর্গে 'মহাভাব'-এর লক্ষণ পরিস্ফুট, এইখানে নবীনচন্দ্রের জ্ঞান ও উপলব্ধি ভক্তির সৌরভে আমোদিত।

নবম সর্গে 'তর্করত্ন পঞ্চানন দুই মহামূর্খ পণ্ডিতদ্বয়'-এর গৌরাঙ্গ-বিরোধিতার রসপূর্ণ বর্ণনা চরমে উঠিয়াছে—নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহাদের 'গ্রীবা-নিষ্পীড়ন' ঘটনায়; 'রঙ্গমতী'-কাব্যের ঢেঁকি পঞ্চানন যেন এখানে উঁকি দিতেছে। উক্ত পণ্ডিতদ্বয় আগমবাগীশের ন্যায় কৌতুকরসের উপাদান যোগাইয়াছেন। নবদ্বীপের কাজী কর্তৃক বৈষ্ণব-নিপীড়ন এবং সংকীর্তন প্রতিরোধে এই সর্গ সমাপ্ত। দশম সর্গে চৈতন্যদেবের সেই অভূতপূর্ব সংকীর্তন-শোভাযাত্রার দীর্ঘ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা পরম ভক্তির সুরে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। মাধাই কর্তৃক নিত্যানন্দ আহত হইলে—

দেখিলেন প্রভু হাসিছে নিতাই,
ঝরিছে শোণিত ললাট বাহি।
কৃষ্ণভাবাবেশে আবিষ্ট বিভোর
'চক্র! চক্র!' ক্রোধে গর্জিল তখন,
দেখিল জগাই, মাধাই, নিতাই,
অন্তরীক্ষে অগ্নি-চক্র বিভীষণ।

এইক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নাট্যরস-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং নিত্যানন্দের ক্ষমাসুন্দর চরিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে নবীনচন্দ্র বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বর্ণিত উক্ত অলৌকিক ঘটনাটুকুর সহায়তা লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রাণপ্রতিম নিত্যানন্দের রক্তক্ষরণে শ্রীচৈতন্যের ক্রোধের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইলেও এই অলৌকিকতাটুকু পরিহার করিলে কাব্যের বিশেষ ক্ষতি হইত না, কেননা পরেই ক্ষমাভিক্ষু মাধাইকে—

প্রভু কহে—'তোর নাহি পরিত্রাণ,
নিত্যানন্দ-অঙ্গে করিলি আঘাত ;
তিনিই পারেন ক্ষমিতে কেবল,
করেছিস তাঁর অঙ্গে রক্তপাত।'

চৈতন্যের তৎকালীন ক্ষুব্ধ মনোভাব-প্রকাশে ইহাই পর্যাপ্ত ছিল।

নগর সংকীর্তনযাত্রার পুরোভাগে প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেবকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত কাজী যেন মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব-দৃশ্যই ভাবনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। এই দৃশ্যটুকু নবীনচন্দ্রের স্বকল্পিত। নবজাগৃতি ও সমন্বয়ের কবি নবীনচন্দ্রের মুখে এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর অপূর্ব বাণী বহুপূর্বেই বাঙ্গালী শুনিয়াছিল।

উঠে হরিধ্বনি, উঠে হুলুধ্বনি,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে—মত্ত নারীনর,
গায় মুসলমান, ভক্তিতে বিহ্বল—
'লা এলাহি আল্লা', 'আল্লা হো আকবর!'

* * *

দেখিলেন শশি কি মহামিলন!
দেখিলেন কিবা মহাআলিঙ্গন!
আকবরের নীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ;
ভারতের মহা প্রয়াগ-সঙ্গম।
এই মহানীতি, এ মহামিলন ;
বুঝিলনা আওরঙ্গজেব অন্ধপ্রাণ,
হায় মা! হায় মা! বুঝিবে কি কভু
তোর দুই পুত্র হিন্দু-মুসলমান?

যুগচেতনার সঙ্গে কবির উক্ত ইতিহাসাশ্রিত স্বগত-চিন্তার সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারতে জাতীয় আন্দোলন তখন বঙ্গ-ভঙ্গ উদ্যোগকে উপলক্ষ্য করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক-ঐক্য সেই আন্দোলনের অন্যতম মন্ত্র ছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের নিগূঢ় প্রেরণাও ছিল তাহাই। সুতরাং তৎকালীন জাতীয় জাগরণ এবং আলোড়নের অন্তপ্র্বৃত্তিকে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ অনুরূপ আন্দোলনের সহিত এক করিয়া দেখার গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে, কেননা বিগত যুগের সাহিত্যকর্মীদের চিন্তা ও সৃষ্টি ছিল অনেকাংশে জাতীয় ভাবনাবেদনার প্রতিফলন। তাই নবীনচন্দ্রের উক্ত আকুলতাপূর্ণ মৈত্রীবাণীতে কাব্যরস খুঁজিতে গেলে আমরা ব্যর্থ হইব, বরং পরবর্তী কালে প্রবল জাতি-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে উক্ত আবেদনের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু অধিক মূল্যবান মনে হইবে।

একাদশ ও দ্বাদশ সর্গ অর্থাৎ 'সন্ন্যাস-সংকল্প' ও 'বিদায়' অধ্যায়ে করুণ রসবর্ণনা চরম স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহা করিবারও কথা। চৈতন্য-জীবননাট্যের উল্লেখযোগ্য পরিণতি এই সন্ন্যাসে, আর নিমাই-সন্ন্যাস বাংলাদেশের অন্তর-মথিত বেদনার কাহিনী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার ভিন্নতর জীবন—প্রচারক এবং প্রেমাবতারের জীবন, তাহাতে রসকৌতুক সুখদুঃখপূর্ণ মানুষীজীবনের উষ্ণস্পর্শ নাই। তাঁহার আকুল ক্রন্দনের হেতু তখন কৃষ্ণপ্রেম, সংসার ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব নহে। সন্ন্যাস-বর্ণনাতে আসিয়াই নানা কারণে 'অমৃতাভ' রচনা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এক নাটকীয় মুহূর্তে পৌঁছিয়াই চৈতন্য-গীতির 'সম' পড়িয়াছে, নতুবা কাব্যের অসম্পূর্ণতা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিত।

এই কাব্যের নানাস্থানে কবির ব্যক্তি-সম্পর্কের উল্লেখসমূহ (personal references) লক্ষণীয়। ইহা বিষয়বস্তুর সহিত কবির অন্তরঙ্গতা এবং পরিণত বয়সের স্বাভাবিক আত্মতন্ময়তার পরিচয়ই বহন করিতেছে। কাব্যটির সূচনাও ব্যক্তিগত বেদনা হইতে। একমাত্র সন্তান নির্মলচন্দ্রের উচ্চশিক্ষা-লাভার্থে বিলাত যাত্রা স্নেহদুর্বল অত্যাগসহন নবীনচন্দ্রের হৃদয় গভীর ব্যথায় ভরিয়া তুলিল। কবি বলিয়াছেন—"প্রাতঃকাল কাটাইতাম আমার 'অমিতাভের' উপসংহারে প্রতিশ্রুত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা লিখিয়া। পুত্র যেদিন কুমিল্লা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিল, তাহার মঙ্গলার্থ উহা সেদিনই

আমি লিখিতে আরম্ভ করি। তাহার প্রত্যেক সর্গের শেষে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের কাছে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিব, এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহা শেষ করিব সংকল্প করিয়াছিলাম। ইহার নাম 'অমৃতাভ'।" ** কাব্যের প্রায় প্রতি সর্গের শেষে এইভাবে পুত্র নির্মলের নাম যুক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি—মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-উদ্যোগের সঙ্গে বাঙ্গালীর এমন এক করুণ স্মৃতি জড়িত যে, তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত শোক এবং অন্তরঙ্গ প্রয়াণ-বেদনাও জাগিয়া উঠে। ('আগমনী-বিজয়া' পদসমূহের বিষয়-বস্তু উমা-মেনকার স্নেহকাতরতা যেমন বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতিসঞ্জাত)। জগন্নাথ মিশ্রের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে অপর সন্তান নিমাইও সন্ন্যাসী হইলেন। নবীনচন্দ্রের প্রথম পুত্র নীরেন্দ্র দশমাস মাত্র বয়সে মারা যায়, এবং দ্বিতীয় পুত্র ও একমাত্র বংশধর নির্মল উপযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করে,—সন্তানবৎসল পিতার দৃষ্টিতে ইহা বিশ্বরূপ ও নিমাই-এর সন্ন্যাস যাত্রা হইতে তো কিছুমাত্র কম বেদনাদায়ক নহে। তাই কাব্যের অভ্যন্তরে কবির মর্মস্পর্শী স্বগতোক্তিসমূহ এই বেদনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

এস নাথ! এস ওই মনোহর বেশে
নবীনের হৃদয়েতে! যায় দূর দেশে
আমার নির্মল শিশু কাতর অন্তরে
শিক্ষাকাঙ্ক্ষী সার্দ্ধ দুই বৎসরের তরে।

উপনয়ন অনুষ্ঠানে—

সোনার পুতুল, অঙ্গে বালার্ক-কিরণ,
করে দণ্ড, পৃষ্ঠে ঝুলি, মস্তক মুণ্ডিত;

সন্ন্যাসী-বেশী নিমাই-এর এই দেবমূর্তি অঙ্কন করিতে করিতে কবি সাদৃশ্যসূত্রে ভাবনেত্রে যেন নিরীক্ষণ করিলেন উপবীত নির্মলকে—

কি পবিত্র দৃশ্য হায়! দেখিয়াছি আমি
এ দৃশ্য প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে একদিন।
আমার নিমাই* উপনয়নে তাহার
সেজেছিল এইরূপে সন্ন্যাসী নবীন।

* "আমার নির্মলকে আমার একটি বন্ধুর পুত্র 'নিমাই' বলিয়া ডাকিত।"—অমৃতাভ, ৪র্থ সর্গ, পাদটীকা।

এই নির্মল-নিমাই-এর মঙ্গল কামনায় ভগবৎচরণে কবির আকুলতা নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক-প্রয়াণে নিমাই-এর শোকব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র কখন যেন অজ্ঞাতসারে নিজ পিতৃমাতৃ বিয়োগ-বেদনার স্মৃতিতে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন—

ভাগ্যে ছিল না আমার
ছিল না—অন্তিমে পিতৃ-মাতৃ পদে হায়!
দুটি বিন্দু অশ্রুও যে দিব উপহার।
তুমি নরনারায়ণ। নিয়তি তোমার
কত উচ্চ! ক্ষুদ্র জীব সান্ত্বনা আমার
আছে কি বা? কাঁদিয়াছি একটি জীবন,
আজি দরদর অশ্রু বহে অনিবার।

একস্থলে 'নির্মল আকাশে চপলা প্রকাশে'—বলিয়া কবি পুত্রবধূ 'চপলা'র নামটিও সস্নেহে নির্মলের সহিত উল্লেখ করিলেন।

কবির জীবন-সায়াহ্নে সর্বশেষ রচনা বলিয়াই হয়ত 'অমৃতাভ' কাব্যে সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিমন্থনজাত একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলি ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গভীর মায়াবশতঃ উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবিমর্মের প্রশ্রয়ও তাহারা লাভ করিয়াছে। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের উপসংহারেও অভিমন্যুর মৃত্যু উপলক্ষে কবির ব্যক্তিগত বাসনার অকৃত্রিম প্রকাশরূপ আমরা দেখিয়াছিলাম—

নির্গুণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দুটি ফুল,
একটি পড়িল ঝরি অকালে পুষ্প মুকুল
তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম-বৃন্তে। এই কলি সুকুমার
ফুটাইয়া প্রেম-করে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃপ্রেম-অশ্রুজলে।

* * *

শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান।

কাব্যের পক্ষে অবান্তর হইলেও এই ধরণের স্বগতোক্তিসমূহ কবিচিত্তের যে স্নেহসুকোমল বেদনামধুর দিক্ উদ্‌ঘাটিত করে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। 'অমৃতাভ'-কাব্যেই ইহা বেশী, তাহার কারণও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলা বর্ণনাত্মক কাব্যে ব্যক্তিসম্পর্কের নিবিড়তা আরোপের ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্র দৃষ্টান্ত।

'অমৃতাভ' নবীনচন্দ্রের সর্বশেষ এবং অসম্পূর্ণ কাব্য। কবি লিখিয়াছেন—"মনে করিয়াছিলাম এই বিশ্রাম সময়ে 'অমৃতাভ' লিখিয়া…তাহার (নির্মলের) প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উহা শেষ করিব। কিন্তু ভগবান আমার এই আশাও পূর্ণ করিলেন না। আমি এক ষড়যন্ত্রের বিষদন্ত হইতে অন্য এক ষড়যন্ত্রের বিষদন্তে পড়িলাম।"৩৫ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য-সংক্রান্ত এই ষড়যন্ত্র-নিগ্রহের বিবরণ কবির 'আমার জীবন'-এর পঞ্চম খণ্ড পাঠে জানা যাইবে। কী মানসিক অশান্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে 'অমৃতাভ' রচনার দুঃসাধ্য প্রয়াস চলিতেছিল, তাহার ইঙ্গিত কাব্য মধ্যেই রহিয়াছে—

কঠিন সংসার মরুময়,
কঠিন শিলার সম পরিবৃত পরিবারে,
নিরমম কঠিন হৃদয়,
হিংসা কৃতঘ্নতা-বাণে হৃদয় বিক্ষত-ক্ষত,
হৃদ্‌রক্ত বহিছে ধারায়।

তাই এই অধ্যায়ের সূচনায় বলিয়াছিলাম—অমৃতাভ জীবন-সায়াহ্নে ক্ষয়িত-শক্তি ভগ্নহৃদয় নবীনচন্দ্রের পূর্বসংকল্পসাধন ব্যগ্রতার অসম্পূর্ণ ফল। দুর্ভাগ্য নবীনচন্দ্রের, পুত্র নির্মল বিলাত হইতে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল, তাহার পরেও কিন্তু তিনি চৈতন্য-চরিত্রের অমৃত-আভার পূর্ণ বিকীরণ আর করিয়া যাইতে পারিলেন না।

সূত্র-নির্দেশ

১। আমার জীবন, ৫ম, ৩৪ পৃঃ।

২। ঐ ঐ, ৩৮ পৃঃ।

৩। ঐ ঐ, ঐ

৪। ঐ ঐ, ৩২ পৃঃ।

৫। A Review on 'Christ' by Nabin Chandra Sen in The Liberal and the New Dispensation, 24th May, 1891.

৬। মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৩৫৯ পৃঃ।

৭। ৩০ সংখ্যক চর্যা, চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।

৮। 'The labours of western scholars could not but bring about an awakening among the scholars of India.' 2500 years of Buddhism—Ed. by Prof, P. V. Bapat, p. 389.

৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের মুখপত্র, ১৩০৮ সন।

১০। তালিকাটি সাপ্তাহিক 'দেশ', ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত পার্থ বসুর 'বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধ-চর্চা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত

১১। আমার জীবন, ৫ম, ৩৩ পৃঃ।

১২। ঐ ঐ ৩৪ পৃঃ।

১৩। The History and Culture of Indian People, Vol. II—Ed. by Dr. R. C. Majumdar, p. 365.

১৪। The Living Thoughts of Gotama the Buddha—Dr. A. K. Kumarswami, p. 1-2.

১৫। বুদ্ধকথা—ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন, ২ পৃঃ।

১৬। নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে। গীতগোবিন্দ—জয়দেব।

১৭। 'করুণাঘন'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মাসিক 'বসুধারা'য় বৈশাখ, ১৩৬৪ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১৮। Article of Prof. C. V. Joshi in '2500 years of Buddhism', p. 22.

১৯। বুদ্ধকথা—ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন, ১৯-২০ পৃঃ।

২০। ঐ, ঐ ২৭-২৮ পৃঃ।

২১। Article of Prof. C. V. Joshi in '2500 years of Buddhism', p. 24.

২২। মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, ৪র্থ অধ্যায়।

২৩। ঐ ঐ

২৪। ঐ, ৩য় অধ্যায়।

২৫। বুদ্ধকথা—ডাঃ অমূল্যকৃষ্ণ সেন, ১৯৮ পৃঃ।

২৬। 'অমিতাভে' নবীনচন্দ্র লিখিত ভূমিকা দ্রঃ।

২৭। আমার জীবন, ৫ম, ৩৪-৩৫ পৃঃ।

২৮। Author's Preface in 'Light of Asia' by Edwin Arnold.

২৯। ভারতদর্শনসার—অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১১৮ পৃঃ।

৩০। আমার জীবন, ৫ম, ৩৮ পৃঃ।

৩১। Western Influence on 19th century Bengali Poetry—Harendramohan Das Gupta, p. 65.

৩২ চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ৭ম—বৃন্দাবন দাস।

৩৩। চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ১৬শ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩৪। আমার জীবন, ৫ম, ৪৩১ পৃঃ।

৩৫ ঐ, ঐ, ৪৭৯ পৃঃ।

গদ্য রচনা

কবিরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। খণ্ড কবিতায়, বর্ণনাত্মক কাব্যে, মহাকাব্যে, জীবনীকাব্যে তাঁহার কবিধর্মের পরিচয়ই আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছি।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের একাধিক বিচিত্রবিষয়ক গদ্যরচনাও যে তাঁহার কাব্য-সমূহের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে, এবং উহারাও যে কবিমনের স্নিগ্ধ স্পর্শ হইতে বঞ্চিত নহে—একথা আমরা অনেক সময় স্মরণ রাখি না। ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থখানি বাঙ্গালা গদ্য-রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস বিধায় উহাতে বহু সাধারণ গদ্যলেখকও উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে নবীনচন্দ্রের কোন স্থান হয় নাই। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে বাঙ্গালা গদ্য যাঁহাদের হাতে প্রাণবন্ত এবং যথার্থ রচনা-পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের রচনারীতি বিশ্লেষণসূত্রে নবীনচন্দ্রের গদ্যরীতিরও সংক্ষিপ্ত অথচ সপ্রশংস আলোচনা করিয়াছেন। এই স্বীকৃতি হইতে মনে হয়, নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনাসমূহ-বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী—উভয়দিক হইতেই পূর্ণতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ভাবপ্রবণ কবির পক্ষে প্রাঞ্জল গদ্যলেখক হইবার প্রকৃতিগত কোন বাধা নাই, রবীন্দ্রনাথই তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু নবীনচন্দ্র সাহিত্যে যে ধারার প্রতিনিধি, তাহাতে গদ্যপ্রবণ মনোভাবের প্রকাশ ছিল সংকুচিত, রঙ্গলালের গদ্যরচনা বলিতে গেলে কিছুই নাই। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকাটি (১৮৫৮) যে ধরণের গদ্যে রচিত, তাহা আড়ষ্ট ও সংস্কৃতানুসারী, যদিও তৎপূর্বেই বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ও অন্যান্য রচনায় রসসমৃদ্ধ গদ্যের এবং টেকচাঁদের আলালীভাষায় (১৮৫৪) কথ্যভঙ্গির হৃদ্যসুরের আভাস পাওয়া গিয়াছে। তথাপি মধুসূদন একদিকে তাঁহার নাটক ও প্রহসনসমূহে কিছুটা প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভাষা, এবং অন্যদিকে হোমারের ইলিয়াডের অনুবাদ 'হেক্টর বধে' (১৮৭১) মহৎ আখ্যায়িকা রচনার উপযোগী গম্ভীর দৃঢ় সংবদ্ধ গদ্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বিন্যাস-

এবং শব্দপ্রয়োগের ত্রুটিসত্ত্বেও তাহা স্মরণীয়। হেমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা বিশেষ কিছু নাই। তবে তাঁহার রচিত মেঘনাদ-বধ কাব্যের 'মুখবন্ধ' (১২৬৯ সন) ও তাহার সংশোধিতরূপ 'ভূমিকা' (১২৭৪ সন) এবং 'মনুষ্য-জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-কালীন আলোচনাসমূহের ভাষারীতির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

গদ্যরচনাক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব-সীমায় আসিয়া পড়েন। নবীনচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"আমিও বঙ্কিমবাবুর গদ্য পড়িয়া গদ্য লিখিতে শিখিয়াছি। তিনি আমার গুরুস্থানীয়।"[১] বঙ্কিম বাঙ্গালা গদ্যকে যে কী অপূর্ব দীপ্তিমান স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সর্বভাব-প্রকাশক্ষম করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আজ নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। নবীনচন্দ্রের (হেমচন্দ্রেরও) পূর্ববর্তী কবিরা এমন প্রাণবান গদ্যের সূর্যালোকে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ পান নাই। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ আবেগপ্রবণ কবি, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে একটি পরিহাসচতুর রসিক মন বাস করিত, তাহা শুধু মহাকাব্য বা কাহিনীকাব্যের ছন্দোবন্ধেই সমগ্র রসনির্ঝরকে বাঁধিয়া রাখে নাই। নবীনচন্দ্র আত্মাদরবিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও অত্যন্ত সামাজিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, তাই বহুজনের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া আপনাকে উপভোগ করিবার মত স্নিগ্ধ সরসতা তাঁহার ছিল। এই প্রকৃতির লোকের পক্ষে কাব্যের রূপমণ্ডল ছাড়িয়া কখনো কখনো গদ্যের সমতল-ভূমিতে সকলের সঙ্গে আনন্দকীর্তনে যোগদান করা অস্বাভাবিক কিছু নহে। বিশেষতঃ যখন সেই সময়কার বাঙ্গালা গদ্যেই 'কপালকুণ্ডলার' মত রোমান্স, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মত সমাজচিত্র, 'কমলাকান্তের দপ্তরে'-এর মত রসমধুর নক্সা রচনা সম্ভব হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভঙ্গিতে গাম্ভীর্যের সঙ্গে যে কৌতুকরস মিশিয়া আছে, তাহাই নবীনচন্দ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল অধিক পরিমাণে।

নবীনচন্দ্রের বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একাধিক উল্লেখযোগ্য গদ্য-গ্রন্থ রহিয়াছে, যেমন :—রসরচনা, ভ্রমণ-চিত্র, উপন্যাস, জীবনস্মৃতিকথা।

(ক) 'চণ্ডীর আভাষ'

'অনুবাদ-কাব্য' অধ্যায়ে আমরা 'চণ্ডীর' (১৮৮৯) গদ্যে রচিত

"'আভাষ বা ভূমিকার" উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি—"কৌতুকরসাশ্রিত কমলাকান্তীয় ভাষা-ভঙ্গিতে চণ্ডীর মাহাত্ম্য-বিশ্লেষণ আমাদের কাছে নবীনচন্দ্রের সেই রসিক চিত্তটিই উন্মোচিত করে, যাহার স্পর্শে পরবর্তী কালে রচিত 'প্রবাসের চিত্র' এবং 'আমার জীবন' এমন রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর গদ্যরচনা ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভাকে নিয়োজিত করিলে নবীনচন্দ্র সম্ভবতঃ আরও অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারিতেন।" এই সুদীর্ঘ 'আভাষ' চণ্ডীর আখ্যায়িকাটিরই কৌতুকজনক উপস্থাপনা, গল্পের ভঙ্গির মাঝে মাঝে রসাল মন্তব্য এবং দু'চারিটি যথাযোগ্য ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত উপভোগ্য। যেমন—"দেবগণের আবার বিপদ। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই অসুর তাঁহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আবার একটি Monster meeting করিয়া Resolution করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিষ্ণুর কাছে একেবারে directly না গিয়া সেই বিষ্ণুমায়া ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর হিমাচলে—তখনও সিমলা দার্জিলিঙ তবে ছিল—Her Excellency বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা আর একটি দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। এইটি আমাদের খাঁটি দরবারের ধরণের—আগাগোড়া খোসামুদি ও সেলাম। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—খোসামুদিটা অমোঘ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। দেবী আপনার দেহ-কোষ হইতে কালিকাঠাকুরাণীকে বিনিঃসৃত করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল দেওয়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুকু Humourous procedure বা রসিকা-কার্য্যপ্রণালী করিলেন। কালোরূপে হিমাচলটা আলো করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ড ঘুরিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাভঙ্গির প্রভাব ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। গল্পাংশ বিশ্লেষণের পর উহার আধ্যাত্মিক অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী 'তর্কভিন্দিপাল' নামক এক কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে লেখকের যে কথোপকথন বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে কমলাকান্তের উত্তমর্ণত্ব যেন ইঙ্গিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

"প্রশ্ন—মহাশয়ের নিবাস ?

উ—আপাততঃ তোমার বাড়ীতে।

প্র—প্রয়োজন ?

উ—ভিক্ষা ?

আমার হার হইল। আমি ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

ব্রা—তোমার সঙ্গে শ্রীশ্রীমান কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আলাপ আছে ?

উ—যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রা—আমি তাহার নাতি।

আমি মনে করিলাম, সে ত আফিমখোর,—এ গুলিখোর না হইয়া যায় না।" এই ভিন্দিপাল-চরিত্রের মুখ দিয়া নবীনচন্দ্র সম্ভবতঃ 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' সম্পর্কে তাঁহার নিজ ধারণাই ব্যক্ত করিয়াছেন।—"এখন বুঝিলে কি চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র ? স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্য—জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক—এরূপ আষাঢ়ে গল্পের দ্বারা জটিল তত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা প্রয়োজন।"

এমন কৌতুকরসাশ্রিত রচনাটির প্রতি কখনো দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই বলিয়া উদ্ধৃতিযোগে উহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

(খ) প্রবাসের পত্র

নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। নবীনচন্দ্র বলেন—"আমি তিন মাসের ছুটি লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাই।……… দার্জিলিং, বৈদ্যনাথ, এলাহাবাদ, কানপুর, বিঠুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার, লাহোর, বরদা, বম্বে, পুণা, নাসিক, নর্মদা, জব্বলপুর বেড়াইয়া স্ত্রীর কাছে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, উহা সুরেশ প্রথম সাহিত্যে, পরে পুস্তকে 'প্রবাসের পত্র' নাম দিয়া ছাপিয়াছেন।"[২] প্রকাশকরূপে এই গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন,—"সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই।…পত্রগুলি তাড়াতাড়িতে লেখা, হয়ত রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে।"

সাধারণতঃ 'পত্র' একান্ত ভাব-বিনিময়ের বস্তু হইলেও লিপিনৈপুণ্যে অনেক সময় তাহা সৃষ্টিধর্মী রচনাশিল্পে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। 'পত্রের' কুশীলব তো মাত্র দুইজন,—লেখক ও প্রাপক; তাই পত্রলেখকের সম্মুখে তখন সমগ্র পাঠকসমাজ জীবন্ত হইয়া উঠে না, একটিমাত্র ব্যক্তিই লেখকের সমস্ত আগ্রহের আশ্রয়। তাহাকে

দশজনের মত শুধু তথ্য জানাইয়া তৃপ্তি নাই, লেখকের উপলব্ধ রসসত্যটুকু তাহার অন্তরে সঞ্চারিত করাই প্রধান লক্ষ্য। তবে দুইটি ব্যক্তির অলক্ষ্য আনাগোনার ভাষা অগণ্য কৌতূহলী পাঠক যেন আড়ি পাতিয়া শোনে। যদিও তাহারা উদ্দিষ্ট নহে, তবু তাহাদের সেখান হইতে কেহ তাড়াইয়াও দেয় না। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ব্যক্তিগত হইয়াও সর্বজনীন, সাধারণের উপভোগ-সম্ভার সেখানে প্রচুর। নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী তথ্যপ্রধান বলিয়া ততটা ভাবৈশ্বর্যময় ও কাব্যরসসিক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারত-পরিক্রমারত অবস্থায় এই 'প্রবাসের পত্র' সহধর্মিণীকে লিখিত হইলেও মনে হয়—পত্রগুলির সর্বজনভোগ্য রসাবেদন সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের সজ্ঞানমনে সম্ভবতঃ কোন সংশয় ছিল না। তাই ঐ পত্রসমূহে এক একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের বিশেষ দ্রষ্টব্যের সাধারণ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং ঐতিহ্য-পরিচয় যেমন আছে, তেমনি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিরুচির প্রকাশও আছে, আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে আন্তরিকতার সুর।

পূর্বেই বলিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির প্রভাবে নবীনচন্দ্রের গদ্যও অনেকটা স্বচ্ছন্দচারী এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক রসিক হৃদয়ের যোগ তো আছেই। বঙ্কিমের মতই কোথাও ধ্বনিগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, কোথাও বা সহজ হৃদ্য বর্ণনার ভাষা, আবার স্থানবিশেষে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষাপ্রয়োগে তাঁহার লেখনী সম্যক পটু ছিল। দার্জিলিং দেখিয়া কবি লিখিয়াছেন—"আমি দার্জিলিং দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্তি হিমাচল দেখিলাম। বালসূর্যকিরণে প্রদীপ্ত, তপ্ত কাঞ্চনাভ কাঞ্চনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বুঝি এমন মহান দৃশ্য আর নাই। হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সানুস্থিত, শৈবিমালায় পুষ্পিত, শীতল পাদপ-শ্রেণীতে উপবনীকৃত, দার্জিলিংয়ের মনোহারী চিত্রখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম।" হিমালয়ের মহনীয়তার সহিত সুসঙ্গত এই ভাষাগাম্ভীর্য লক্ষণীয়। আবার শৈশব-সুহৃদ উমেশের পত্নীর বর্ণনায় চমৎকার হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভাষাও সেখানে সহজ ব্যঞ্জনায় প্রাণবান,—"ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথমে আমাদের মধুবাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়। ...এ ফুলেশ্বরীর গাম্ভীর্যমাখা ঈষৎ বিজলীসঞ্চার,—মধুমাখা স্নেহটুকু, বৈশাখী জ্যোৎস্নার অমৃতভরা ভাবটুকু বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই।" 'পুষ্করতীর্থের' ব্রহ্মার মন্দিরের বর্ণনায় নবীনচন্দ্র

সুন্দর কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছেন। যেমন—"অবতরণ সময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি। লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না। তাঁহারও শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই বনিতা। সাবিত্রীদেবীর যজ্ঞে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া তিনি নবযৌবন-সম্পন্না বালস্ত্রী গায়ত্রীদেবীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রীদেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চটিয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নবদম্পতিকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহাদের মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজায় কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরীব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার শ্বেত প্রস্তরের চতুর্মুখ মূর্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী, বুড়া এত চোটের পরেও নব-যৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই।"

এমনি বিচিত্র রসদৃষ্টি লইয়া স্থানবিশেষের পরিচয়লাভের প্রয়াস এবং উহার রসপূর্ণ প্রকাশের নিদর্শন এই গ্রন্থের নানাস্থানে রহিয়াছে। আবার উহার সর্বত্রই ভারতের ঐতিহ্য-সম্পদের প্রতি স্বদেশ-বৎসল লেখকের যে গভীর অনুরক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে, পরাধীন ভারতের গ্লানি-কলঙ্কের জন্য যে বেদনা-ফল্গু গোপনে বহিয়া গিয়াছে, তাহা নবীনচন্দ্রের মনোধর্মের বলিষ্ঠ দিকটিই প্রকটিত করিয়াছে। আবার ভারত-ঐতিহ্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস সুস্থমনা নবীনচন্দ্রকে একেবারে অন্ধ বা পশ্চাৎমুখী করিয়া দেয় নাই; পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞানের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের শুভঙ্কর রূপ তিনি 'রুড়কি' পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিলেন।—"সলিলস্বরূপা গঙ্গাদেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্বপুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছেন—তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সে শক্তি কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।.........পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বুঝিল, যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের চাকা ঘুরান যাইতে পারে। ......যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমাচল হইতে পদতলস্থ সমতলভূমিতে পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীরতর খাল বা কেনেল কাটিয়া গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া, জনশূন্য স্থানের মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে লইয়া, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্বস্রোতে ফেলিলেন। ইহাতে অন্তর্বর্তী স্থানসমূহে স্বর্ণ ফলিতেছে।......ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশ সিংহ যে এ-অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।......তাই

বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত, তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুল-পূজাই বটে।"

প্রকাশের স্বল্পকাল মধ্যেই 'প্রবাসের পত্রে'র রচনারীতি সাময়িকপত্রে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল।—"Prabaser Patra is in its own way a highly interesting production in which the entertaining prose of a traveller's story is sweetly blended with the enlivening poetry of the out-pouring of a feeling heat and the flight of a fervid imagination."[৩] আবার পত্রলেখক-নবীনচন্দ্র সম্পর্কে একালের সমালোচকের ক্ষুদ্র অথচ সার্থক মন্তব্যও উদ্ধারযোগ্য।—"ঐতিহাসিক চিত্র হলেও এ পত্রাবলীর সাহিত্যিক মূল্য আদৌ নেই বলা যায় না। স্বদেশ-প্রেমী কবি-মানসের বিস্ময়-আনন্দ-ভাবাবেগের আন্তরিকতাটুকু দুর্লক্ষ্য নয়। মাঝে মাঝে গভীর মননেরও পরিচয় পাওয়া যায়।"[৪] লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বাই, নর্মদা সম্পর্কে বিচিত্র মন্তব্যে ও চিন্তায় এই মননশীলতার ছাপ রহিয়াছে। তাই 'প্রবাসের পত্র' পত্র-সাহিত্য এবং ভ্রমণকাহিনীরূপে উপেক্ষণীয় তো নহেই, বরং নবীনচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ রচনাভঙ্গির নিদর্শন হিসাবে আরও মূল্যবান্।

(গ) ভানুমতী

১৯০০ সালে নবীনচন্দ্রের উপন্যাস 'ভানুমতী' প্রকাশিত হয়। উপন্যাস শুধু গল্পরচনা বা কাহিনীমাত্র নয়; তাহার শিল্পকৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বলিতে গেলে ঔপন্যাসিকের প্রতিভাই ভিন্ন জাতীয়। উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের ধারণা তেমন উচ্চ ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন: "কবিতায় তথাপি চৌদ্দের জন্য একটু মাথা ঘামাইতে হয়, উপন্যাস ও নাটকের পথ পরিষ্কার। একটা কিছু লিখিলেই উপন্যাস ও নাটক হয়।"[৫] কিন্তু তাহা যে হয় না, তাহার প্রমাণ 'ভানুমতী' উপন্যাস। এ-কথা সত্য যে, নবীনচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না, কাজেই উপন্যাস হিসাবে 'ভানুমতী' অত্যন্ত অপটু রচনা। চট্টগ্রামে ১৮৭৬ এবং ১৮৯৭ সালের সাইক্লোন বা মহাঝড়কে পটভূমি করিয়া এক বেদের পালিতা কন্যা ভানুমতীর মধ্যে বিচিত্র অলৌকিকতা আরোপ/করিয়া লেখক বৈরাগ্য ও সেবাধর্মের এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। উক্ত সাইক্লোনের সময় নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামে কর্মনিযুক্ত ছিলেন। সেই মহাদুর্যোগের প্রত্যক্ষ বর্ণনা তিনি 'আমার

জীবনে'ও (২য় ও ৫ম ভাগ) লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'ভানুমতী'তে শঙ্করপুরীর অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখও তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত। নিজ পৈতৃক গৃহ বারম্বার ভস্মীভূত হওয়ার প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র তাঁহার বাল্যকালে পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত শঙ্করপুরী স্বামী নামক এক সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কথা 'আমার জীবনে' (১ম ভাগ) উল্লেখ করিয়াছেন।

'প্রভাস' কাব্যের পরে এই গ্রন্থেই বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সেবা-আদর্শের প্রতি নবীনচন্দ্রের বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, আরো পরে 'অমৃতাভে' চৈতন্যলীলা-রচনায় পূত পরিবেশ এইভাবে পূর্ব হইতেই যেন তাঁহার অন্তরে গড়িয়া উঠিতেছিল। যাহা হোক, 'ভানুমতী'র কাহিনী আকর্ষণহীন ও অসংলগ্ন, প্রথমার্ধ দীর্ঘ প্রকৃতি-বর্ণনায় এবং দ্বিতীয়ার্ধ ধর্ম-বক্তৃতায় আচ্ছন্ন, চরিত্রচিত্রণও দুর্বল। নবীনচন্দ্র জানাইয়াছেন—দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী 'আশা'র আগ্রহাতিশয্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক সপ্তাহ মধ্যে 'ভানুমতী' রচিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ভানুমতী বালিকার পাঠোপযোগী সরল ভাষায় একটি সরস গল্প বিশেষ। তবে নরনারীর ইন্দ্রিয়জনিত প্রেম ভিন্ন বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে পারে কিনা এবং উপন্যাসে গদ্য-পদ্য ব্যবহার করিলে কিরূপ লাগে, উপন্যাসলেখকদের চিন্তা করিয়া দেখিতে দেওয়া—এই দু'টি আমার উদ্দেশ্য ছিল। এইখানে ভানুমতীর নূতনত্ব।"[৬] কিন্তু বস্তুতঃ ভানুমতীর ভাষা আদৌ 'বালিকার পাঠোপযোগী সরল ভাষা' হইয়া উঠে নাই, উহা 'সরল' অর্থে নির্দোষ গল্প হইতে পারে, কিন্তু 'সরস' নহে। নবীনচন্দ্রের অপর দুইটি উদ্দেশ্যের পরীক্ষাও বাস্তবক্ষেত্রে কতটুকু সার্থক হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে।

নরনারীর ইন্দ্রিয়জনিত প্রেম ব্যতীত বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে পারে কি না—ইহাই নবীনচন্দ্রের পরীক্ষার বস্তু ছিল। এই সম্পর্কে পূর্বাপর নবীন-চন্দ্রের একটি পবিত্রতা-বাতিক (puritanic) ছিল দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত প্রেম-কাহিনী সপরিবারে পাঠ করার পক্ষে অনুপযোগী, বঙ্কিমের নায়িকা-চরিত্রসমূহ দেশে একটা বিজাতীয় আদর্শ স্থাপন করিতেছে,—এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া তিনি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ইংরেজী শীরিতের ছায়া ছাড়িয়া দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ-ভগ্নিপ্রেম' ইত্যাদি বিষয়ে উপন্যাস লিখিতে অনুরোধও করিয়াছিলেন।[৭] 'ভানুমতীতে'ও একস্থলে অনাথনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে ভানুমতীকে বলিতেছেন: "যে

দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চশিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থ-পরতা ও পতি-প্রতিযোগিতা।" (একাদশ অধ্যায়) কিন্তু সত্যই কি নবীনচন্দ্র বাল্যপ্রেম, অবৈধপ্রণয় প্রভৃতির প্রতি বিমুখ ছিলেন? তাহা তো মনে হয় না। তাঁহার ক্লিওপেট্রা, 'রঙ্গমতী'র কুসুমিকা, 'কাব্যত্রয়ীর' জরৎকারু, শৈলজা প্রভৃতি প্রেমবিদীর্ণা নারীচরিত্রের প্রতি তাঁহার সুস্পষ্ট সহানুভূতি কি ফুটিয়া উঠে নাই? কাহিনীতে জীবনরসসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি কি তাহাদের নিয়োজিত করেন নাই? যাহা হোক, আমরা পূর্বে 'রঙ্গমতী'র বিস্তৃত আলোচনায়ও দেখিয়াছি—শুদ্ধমাত্র দেশোদ্ধার ও স্বদেশ-প্রীতির উন্নত আদর্শ লইয়াই 'রঙ্গমতী' রসঋদ্ধ হয় নাই, নরনারীর চিরন্তন হৃদয়রহস্যও স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের ঘটনা-স্রোতে আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। যৌনচেতনা ও প্রণয়াবেগ সামাজিক সম্পর্কক্ষেত্রে অনস্বীকার্য সত্য; প্রয়োজনে তাহাকে গৌণ করা চলে, কিন্তু উন্মূল করা অসম্ভব। নবীনচন্দ্র তাহাকে অস্বীকার করার উৎসাহে 'ভানুমতীতে' যে অধ্যাত্মপ্রেম ও সেবা-ধর্মের কুহেলিকাচ্ছন্ন জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মানবিক রসকৌতূহলের উষ্ণতা নাই, আছে এক নিস্পৃহ বৈরাগ্যের শীতলতা। উপন্যাস উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারে, ধর্ম-ব্যাকুলতাও তাহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের সুখদুঃখ, হর্ষবেদনার দ্বন্দ্ব-বিহীন অধ্যাত্মগৌরবের আখ্যানমাত্র হইয়া তাহার সার্থকতা কোথায়? বাঙ্গালা সাহিত্যের অনন্য উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'ও প্রণয়রসহীন, কিন্তু সুখদুঃখতরঙ্গিত পারিবারিক জীবনের যে রস-নির্ঝর সেখানে ক্ষরিত হইয়াছে, ভানুমতীর মতই একটি বালিকা সেখানে যে সহজ স্বাভাবিক মায়াকারুণ্য সঞ্চার করিয়াছে, তাহার তুলনা মিলে কী? এই হিসাবে 'ভানুমতীতে' নবীনচন্দ্রের পরীক্ষা কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই, বলিতে হইবে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন: "নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন—হয়ত তাঁহার কীর্তি সময়ের বিচারে অধিক টেঁকসই হইত।"[৮] কিন্তু এই অনুমানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। উপন্যাস, বিশেষতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে নবীনের মনোভাব আমরা পূর্বে জানিয়াছি। তাঁহার 'রঙ্গমতী' এবং 'কাব্যত্রয়ীতে' উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র-

উপাদান থাকিলেও বঙ্কিমী-রীতির গন্ত-উপন্যাসের কোন রস-সংস্কার তাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র কাব্যোপন্যাস।

সম্ভবতঃ এই কারণেই উপন্যাসে গন্ত-পদ্যের ব্যবহার—নবীনচন্দ্রের অন্যতম পরীক্ষা ছিল। তাই 'ভানুমতীতে' বর্ণনীয় বিষয়ের কতকাংশ কখনো কখনো অমিল পয়ার ছন্দে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই পরীক্ষা নূতন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ গন্ত-পদ্যময় 'চম্পূ' বিদ্যমান। কিন্তু চম্পূর উৎকর্ষ ও সার্থকতা বিষয়ে সমালোচকগণ নিঃসন্দিগ্ধ নহেন। ডাঃ সুশীলকুমার দে-র উক্তি এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য।—"Excepting rarely outstanding treatment here and there, the large number of campūs that exist scarcely shows any special characteristic in matter and manner....The campū has neither the sinewy strength and efficiency of real prose, nor the weight and power of real poetry....The history of campū, therefore, is of no great literary interest."[৯] রোমান কবি Gaius Petronius-এর কাহিনী-রচনায় গন্ত-পদ্যের একত্র প্রয়োগ দেখা যায়।[১০] ইংরেজী সাহিত্যে Abraham Cowley-র Essay-তে গন্ত-পদ্য একসঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—তাঁহার Of myself, Of greatness, Of solitude প্রভৃতি রচনা আত্মগতচিন্তার রসবিশ্লেষণাত্মক স্বল্পায়তন প্রবন্ধ মাত্র (Personal Essays)। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাংশ তাহাতে রসদ্যুতি সঞ্চার করিয়াছে। সমালোচকও বলেন: "The mind and temper which his delightful essays, and the poems which accompany them, express has its own real charm."[১১] কিন্তু দীর্ঘ গল্প-ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে তাহা কতটুকু উপযোগী হইত, বলা কঠিন।

'ভানুমতীতে' নবীনচন্দ্রের এইরূপ প্রয়াস বিদেশী সাহিত্যের আদর্শ-সঞ্জাত না হইয়া স্বকল্পিতও হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে বর্ণাঢ্য মর্মস্পর্শী গদ্যভাষার আদর্শ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র হয়ত বা তাহাতে আরও অভিনবত্ব সৃষ্টির আগ্রহে এইরূপ পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; কেননা তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনাটির মূলেই তো নূতনত্বের বাসনা বিদ্যমান ছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে, কাব্যে নিজ বর্ণন-কুশলতা প্রদর্শনে যিনি ক্লান্তিহীন, গন্তের ঋজু বন্ধনে তিনি অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন।

কারণ যাহাই হোক না কেন, এই চেষ্টার দ্বারা তাঁহার রচনার গতি বেগবান না হইয়া বরং শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; কেননা, উহা আখ্যানবস্তুর কোন নিগূঢ় প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে,—বাঙ্গালা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক গদ্যপদ্যময়ী আখ্যায়িকা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতায়' কবিতাংশসমূহ রচনার দিক দিয়া যেমন অনবদ্য, তেমনি বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহের সঙ্গে তাহাদের সুরের এবং রসের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। এমন কি—কবিতাসমূহকে সেখানে একটি বিশিষ্ট চরিত্র বলিয়াই মনে করা চলে।

ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ বা বিশেষত্ব 'ভানুমতী'তে কিছু না থাকিলেও উহার বর্ণনা এবং ভাষারীতিতে বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র প্রভাব লক্ষণীয়। আখ্যায়িকাটিতে আগাগোড়া পর্বত-সমুদ্র-পরিশোভিত চট্টগ্রামের এক সুন্দর স্থানিক পরিবেশ (Local atmosphere) সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনাও বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 'ভানুমতীর' সমুদ্র বর্ণনা তখনকার দিনে Englishman পত্রিকায়ও প্রশংসিত হইয়াছিল।—"The influence of the scenery of the sea-shore in assisting the poet's meditation and ecstasy has been ably depicted in a recent novel by the well-known poet babu Nabin Chandra Sen."[১২] রচনারীতির নিদর্শনরূপে দুইটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"শরৎকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্যক্ষেত্রখচিত তটভূমি।" (প্রথম অধ্যায়)

"পূর্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্রও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শব-মালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে।" (সপ্তম অধ্যায়)

(ঘ) আমার জীবন

পাঁচভাগে সম্পূর্ণ নবীনচন্দ্রের সুদীর্ঘ আত্মজীবনকাহিনী 'আমার জীবন' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সাল হইতে ১৩১৪ সালের মধ্যে। সাহিত্যিকের

আত্মজীবনীরূপে বিশালতার দিক দিয়া ইহার সহিত তুলনা চলিতে পারে একমাত্র একালে রচিত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি-কথা'র। আজকাল বড়-মাঝারি প্রায় সব কবি-সাহিত্যিকই আত্মজীবনী লিখিতেছেন;—কেহ কেহ বা নিজ নিজ সাহিত্যগোষ্ঠীর কীর্তিব্যাখ্যানে তৎপর। মনে হয়, এই যুগটাই বুঝি উত্তম পুরুষের স্বগত-ভাষণপূর্ণ। কিন্তু সেকালে কবি-সাহিত্যিকদের কেহই নবীনচন্দ্রের মত ব্যাপক আত্মজীবনী লিখেন নাই। প্রবন্ধের আকারে রচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের, মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীর কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩] মধুসূদন তাঁহার ইংরেজী পত্রাবলীতেই কবি-হৃদয়ের যাহা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ-উল্লাস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো নিজের সম্পর্কে প্রায় নীরব। আবার তাঁহার একেবারে বিপরীত নবীনচন্দ্রের মধ্যে আত্মঘোষণা অত্যন্ত প্রকট। মনে হয়, রাজপথের মাঝখানে দিগ্বিজয়ীর নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে নিজের কথাই দীর্ঘ সময় ধরিয়া দশজনের কাছে বলাতেই যেন তাঁহার ক্লান্তিহীন আগ্রহ, অন্যের তাহাতে ঔৎসুক্য নাই-বা থাকিল!—"আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে;···তাহার জীবন কে জানিতে চাহে?"[১৪] সূচনার এই বিনয়-বচনও তখন অত্যন্ত মামুলী ও আন্তরিকতা বর্জিত বলিয়া মনে হয়। 'আমার জীবন'-এ যদি ভাবাবেগোচ্ছল হৃদয়বান কবি-নবীনচন্দ্রকে হাসি-অশ্রুর আলো-অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতাম, তবে কত না আনন্দ হইত। কিন্তু সমগ্র কবি-জীবনের নেপথ্য-চিত্র না হইয়া উহার অধিকাংশই উচ্চ রাজপদে সমাসীন ডেপুটি-নবীনচন্দ্রের রাজকর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিকের রোজনামচা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার জাতীয় কবির উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির চিত্র আত্মপ্রচার ও দম্ভ প্রকাশের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ পাঠকালে দৈর্ঘ্যজনিত ক্লান্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিলে মনে হইবে, জীবনীটির রচনারীতি আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দ; বর্ণনার মনোহারিত্বে, রসকৌতুক-উচ্ছলতায়, বিচিত্র মানবচরিত্র বিশ্লেষণে এবং নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনায় উহা অনেকস্থলে উপন্যাসের গৌরব লাভ করিয়াছে। অধুনা (১৩৬২) প্রকাশিত

রম্যরচনা সংকলন 'পরম রমণীয়' গ্রন্থে 'আমার জীবন'-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনাকে সরসতার মর্যাদাদান এই হিসাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সেই সূত্রে নবীনচন্দ্রের গদ্যভঙ্গী সম্পর্কে সংকলন-কর্তার অভিমতও রসগ্রাহিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।—"তাঁর গদ্য অবশ্য কবিতার মত অলঙ্কারবহুল নয়, কিন্তু নিরলঙ্কার হয়েও লাবণ্যময়। এবং তারও মধ্যে সুন্দর একটি কবি-প্রাণের স্বাক্ষর রয়েছে। সেই কবি-প্রাণ যেন আরও সহজ, আরও স্বচ্ছন্দ। বস্তুতঃ, নবীনচন্দ্রের গদ্য-রচনা পড়তে পড়তে এক এক সময় মনে হয় যে, তাঁর কাব্যচেতনা যেন গদ্যের মধ্যেই তার সহজতর, সুন্দরতর প্রকাশপথ খুঁজে পেয়েছিল।"[১৫]

আবার সাহিত্য-সেবাসূত্রে নবীনচন্দ্র বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন প্রায় সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাহার নানা উল্লেখ তাঁহার আত্মচরিতে রহিয়াছে। কেবলমাত্র মধুসূদন-সান্নিধ্যের কথা তাহাতে নাই, তবে নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে মধুসূদন-নবীনচন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি বর্ণনা দিয়াছেন।[১৬] বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মহাত্মা শিশিরকুমার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী,—ইঁহাদের সকলের স্নেহপ্রীতি লাভই একমাত্র কথা নহে; ইঁহাদের আয়োজিত ভাবসাধনা ও কর্মযজ্ঞে নবীনচন্দ্র কবিরূপে সমিধও আহরণ করিয়াছিলেন। কবি নবীন-চন্দ্র উদ্যোগী, বহুকর্মা ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনকাহিনীর সহিত তৎকালীন বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকাহিনীও জড়িত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন: "তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসাবে ঐ গ্রন্থ স্মরণীয়—আর অধিক স্মরণীয় নবীন সেনের ব্যক্তিত্বের টীকারূপে।...শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক। 'আমার জীবন' চিত্তাকর্ষক—তাহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের খসড়া।"[১৭] তা' ছাড়া, নবীনচন্দ্রের কাব্য-রচনার নেপথ্য-ইতিহাস সংগ্রহের উহা একমাত্র আকর গ্রন্থ, যদিও বাহুল্যপূর্ণ উক্তিতে সে ইতিহাস কতকটা আচ্ছন্ন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের খুঁটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ হইতে তৎকালীন দেশীয় উচ্চ রাজকর্মচারীর জীবনের বাধা-বিপত্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির একটি চিত্র পাওয়া যায়। রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু—সকল সাহিত্যিক ডেপুটির কর্ম-জীবনই এইরূপ ছিল কিনা জানিতে কৌতূহল জাগে। তবু বার বার মনে হয়,—পরিমিত আয়তনের মধ্যে রসিক মন ও নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টি লইয়া

নবীনচন্দ্র যদি নিজ কর্মজীবন নয়—ধর্মজীবন অর্থাৎ কবিজীবনটিই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যাইতেন, তবে সুন্দর এক 'কবিকাহিনী' আমরা তাহাতে পাইতাম, কবি-সঙ্গ অত্যন্ত মধুর মনে হইত।

আত্মজীবনী রচনা সেই কারণেই দুরূহ, কেননা তাহাতে আত্মপ্রচারের স্বাভাবিক আগ্রহ প্রশমিত করিতে হয়। একটি সহজ বিনীতভাবের পরিবেশ তাহাতে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এইজন্য আত্মজীবনী লিখিতে অসম্মত হইয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ অকপটে বলিয়াছেন, যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার সেইরূপ সাহস হইবে, তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা উত্থাপন হইতে পারে। নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া আপনাকে আপনার উকিল হইতে হয়, কেবল দোষস্খালনের চেষ্টা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ।"[১৮] এই অকপট আত্মবিশ্লেষণের মহিমায় মহাকবি গ্যেটে-র আত্মজীবনী জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছে। আত্মজীবনীও যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনানৈপুণ্যে উপন্যাসের সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'। বিশ্লেষণশীল রসিক দর্শকের দৃষ্টিতে নিজ কবি-পুরুষটিকে কখনো আগ্রহ-মমতায়, কখনো পরিহাস-বিদ্রূপে অন্য দশজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়া কবি সেখানে যেন কৌতুকবোধ করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে কবি-প্রতিভা শতদলের এক একটি দল উন্মোচনের ইতিহাসও গাঁথা হইয়া যাইতেছে। অবশ্য 'জীবনস্মৃতি' পরিণত রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় বহন করে না। কিন্তু প্রভাত-রবিকে যে নিরাসক্ত প্রসন্ন বিনীত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন, মধ্যাহ্ন-রবি এবং সান্ধ্যরবিকেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই দেখিতে পারিতেন; কেননা, শিল্পবোধ ও মাত্রাজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-সত্তারই অঙ্গীভূত। তবু খ্যাতির সিংহদ্বারে উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব পরিমিতি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন; কেননা, তাহার পরেই আত্মঘোষণার আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন,—তুলনায় 'আমার জীবন'-এর প্রথম ভাগই সুখপাঠ্য, কেননা তখনো উন্মেষমুখী কবিই তাহাতে প্রধান; দন্তবর্ম-পরিহিত 'ডেপুটি' তখনো রঙ্গমঞ্চে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নাই।

পূর্বোক্ত রম্যরচনা-সংকলনগ্রন্থ 'পরম রমণীয়'তে 'প্রথম অনুরাগ' নামে যে অধ্যায়টি গৃহীত হইয়াছে, তাহা 'আমার জীবন' প্রথম ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত।

উহাতে কিশোর নবীনচন্দ্রের রোমাঞ্চময় প্রথম প্রণয়লীলার কাহিনী যেন পাঠকের মনে রসঘন এক ছোট গল্পের মাধুর্য সঞ্চার করে। এখানে এই প্রথম ভাগ হইতেই বিচিত্র রচনারীতির দুই একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। কলিকাতার সতীর্থ ষষ্ঠীচরণের অদ্ভুত প্রকৃতি লইয়া নবীনচন্দ্র যে 'ষষ্ঠীমাহাত্ম্য' কীর্তন করিয়াছেন, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি কৌতুকাবহ।

"—ষষ্ঠী নামটি যেমন অপূর্ব, লোকটিও তেমন—একজন মহাপুরুষ।··· ষষ্ঠী দাদার মামা, কাজেই আমার মামা। আমার মামা ত বাসা শুদ্ধ সকলেরই মামা,······পটলডাঙ্গার সকলেরই মামা। এরূপে কলিকাতা সহরে 'একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল', 'রেজেষ্ট্রার জেনেরেল', 'ইনস্পেক্টর জেনেরেল' প্রভৃতি নানাবিধ জেনেরেল উপাধিধারী উচ্চ রাজকর্মচারীর মধ্যে ষষ্ঠীও একজন 'মামা জেনেরেল' হইয়া উঠিল।······কলিকাতা সহরের গাড়ীর হুটাহুটি ছুটাছুটি দেখিয়া ষষ্ঠী কোথাও প্রাণপণে যাইতে চাহিত না।······ একদিন ষষ্ঠীকে তাহার একখানি বহি কিনিবার জন্য 'থেকারস্পিঙ্কের' বাড়ীতে যাইতে হইল। যাইবার সময়ে, দুপুরবেলা, ষষ্ঠী কোনমতে বিপদ কাটাইয়া গিয়া বহি কিনিয়াছে।···সে আনন্দে অধীর হইয়া······মহাগৌরবের সহিত বউবাজারের মোড় পর্যন্ত উপস্থিত। এখন অপরাহ্ন। মহাকালের ভীষণ যন্ত্রের মত শকটমালা নক্ষত্রবেগে চারিদিকে ছুটিতেছে। মোড়টি ষষ্ঠীর চক্ষে যেন চতুর্মুখ মহাকাল। ষষ্ঠী একবার অসম সাহসে রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে, অকৃতকার্য হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। কলিকাতা সহর, ষষ্ঠীর এই লীলা, সেই মুহুর্মুহু অগ্রসর ও পলায়ন, সেই অঙ্গভঙ্গি, সেই মুখভঙ্গি,···একটি ক্ষুদ্র জনতা হইয়া গিয়াছে।" (৭১-৭২ পৃঃ)

সাধারণ ছাত্রদের মনে পরীক্ষাতঙ্ক সকল যুগেই বুঝি একরূপ। নবীনচন্দ্র সরস উক্তিতে সকল যুগের ছাত্রদের মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক রহস্যের' বাচন-ভঙ্গি মনে পড়িয়া যায়: "আমি 'বিশ্ববিদ্যালয়কে' যমালয় বলিয়া জানি। 'চেনসেলার' স্বয়ং যম, 'রেজেষ্ট্রার' চিত্রগুপ্ত, 'সিণ্ডিকেট' যমদূত-সমিতি, 'পরীক্ষা' বৈতরণী, এবং 'পরীক্ষকগণ' গাভী। তাঁহাদের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া এই বৈতরণী পার হইতে হয়। (৫০ পৃঃ)······বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা যখন মনে করি তখন আমার আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। বলিদান। অজ শিশুগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া আনিল। পরীক্ষার ফিস্ দাখিল হইল। ছাগল চীৎকার

করিয়া কাঁদিতে লাগিল—বালক অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল,—বালকের 'নমিনেসন রোল' পঁহুছিল ছাগল তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল,—বালক কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষাগৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান।" (৫৭ পৃঃ)

আবার অন্যদিকে বর্ণনাত্মক রচনার আবেগময় গাম্ভীর্যও উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের বর্ণনা: "আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝর-কণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধুগর্ভের তরঙ্গভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদনদীস্রোতে রজতধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে।...অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল।" (১২৯ পৃঃ)

পিতৃমাতৃহীন সংসারভারবিব্রত অসহায় যুবক নবীনচন্দ্রের দুর্দশা ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রামের বর্ণনায় এই ভাষাই আবার করুণমাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য খণ্ডগুলিও বিচিত্র সামাজিক তথ্য, কৌতূহলোদ্দীপক নানা ঘটনা ও সরস বর্ণনার সমাবেশে উপভোগ্য।

সূত্র-নির্দেশ

১। আমার জীবন, ৪র্থ, ২৭৯ পৃঃ।

২। ঐ, ঐ, ৭৩ পৃঃ।

৩। Calcutta Review, Vol. XCVI, April, 1893.

৪। বাংলার পত্রসাহিত্য—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ পৃঃ।

৫। আমার জীবন, ৫ম, ১১৭ পৃঃ।

৬। ঐ, ঐ, ২৪৩-৪৪ পৃঃ।

৭। আমার জীবন, ১ম (৯৩ পৃঃ), ৩য় (২৩০ পৃঃ) ও ৫ম (৪০৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৮। প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাব্যবিতান' গ্রন্থের ভূমিকা।

৯। A History of Sanskrit Literature. Vol. I—Ed. by Dr. S. N. Das Gupta & Dr. S. K. De, p. 434.

১০। "Gaius Patronius, one of the Emperor Nero's companion, was the author of 'Patronii Arbitri Satyricon', a prose satirical romance interspersed with verse, which has survived in a fragmentary state."—Oxford Companion to English Literature—Sir Paul Harvey, p. 611.

১১। Remark of Sir Herbert Grierson, quoted in 'Abraham Cowley—Poetry and Prose', p, XIVII.

১২। আমার জীবন, ৫ম, ২৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। আমার জীবন, ১ম, ১ পৃঃ।

১৫। পরম রমণীয়—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, ২৫৫-৫৬।

১৬। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম, ৩৬৭ পৃঃ।

১৭। চিত্রচরিত্র—প্রমথনাথ বিশী, ৯৬ পৃঃ।

১৮। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৬০৭ পৃঃ।

ভাষা ও ছন্দ

১

অভিনব কোন বাণীপন্থা নির্দেশ করিবার মত প্রতিভা নবীনচন্দ্রের ছিল না, একথা সত্য। তবে খণ্ড গীতিকবিতায় এবং আখ্যায়িকা কাব্যে তাঁহার উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবিপ্রকৃতিকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে ভাষা ও বাচনভঙ্গি আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা মূলতঃ মধুসূদনের অনুসারী হইলেও বৈশিষ্ট্যহীন নহে। উহা বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—নূতন যুগের নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার অনুকূল কাব্য সৃষ্টি করিতে গিয়া একমাত্র মধুসূদনই 'ভাষাপথ খননি' স্ববলে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষার শব্দশক্তি ও ধ্বনিসঙ্গীত নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর বাংলা ভাষায় তাহারই সযত্ন প্রয়োগের ফলে তাঁহার কাব্য 'মহাগীত' হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সেই শব্দসাধনা ও সিদ্ধি অনুবর্তীদের কাহারও ছিল না। সতর্কতা সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের ভাষাপ্রয়োগ কৃত্রিম ও আড়ষ্ট, গীতিপ্রাণতা সত্ত্বেও বিহারীলালের শব্দদৈন্য সুপ্রকট, ভাবোদ্বেলতা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের ভাষা সামঞ্জস্যহীন। তবু তুলনায় আবেগপ্রবণ কাব্যময় ভাষার উপর নবীনচন্দ্রের অধিকার অনেক বেশী সচ্ছন্দ ছিল। তাহা ছাড়া, নবীনচন্দ্রের বিভিন্ন কাব্যের বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জীবনরসসম্পৃক্ত ছিল বলিয়া উহাদের বর্ণনার উপযোগী ভাষা তাঁহার লেখনীমুখে স্বতঃই আসিয়া পড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন—"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ"।[১] নবীনচন্দ্রের কাব্যে বুদ্ধির চাইতে হৃদয়ের আবেদনই বেশী, তাই তাঁহার কল্পনাবিলসিত বর্ণনা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তজ্জন্য নবীনচন্দ্রের কোন বিশেষ সাধনা বা প্রযত্ন ছিল না। সেই কারণেই তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ সঙ্গীতরসময় কবি-ভাষার মাধুর্য্য যেমন আমাদিগকে তৃপ্তি দেয়, তেমনি নানাস্থানে তাঁহার মাত্রাবোধহীন আতিশয্য, গভীরতার সহিত তরলতার নির্বিচার সমাবেশ আমাদের রসবোধ ক্ষুণ্ণ করে। এ ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি প্রয়োগ করিয়া বলা চলে—"তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য

ছিল, কিন্তু গৃহিণীপণা ছিল না।"[১] এমন কবিপ্রাণ, এত আবেগোচ্ছ্বাস, এত জীবনের উত্তাপ—ইহার সহিত একটু গৃহিণীর স্বভাব অর্থাৎ সংযম, শৃঙ্খলা ও পরিমাণবোধ যুক্ত হইলে নবীনচন্দ্র আরও সার্থক কবি হইতে পারিতেন। এই আঙ্গিক-সচেতনতার অভাবই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে দোষ-দুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণে নবীনচন্দ্রের কবি-জীবনের সূচনা,[২] তবু তাঁহার মধ্যে গুপ্তকবির প্রভাব কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। মধুসূদনের মত ক্লাসিক-কাব্যগঠনের উপযোগী শব্দসম্পদ নবীনচন্দ্রের না থাকিলেও রোমান্টিক কাব্যোপযোগী এক আবেগপ্রবণ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রারম্ভিক রচনার অন্যতম 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতাটিতেই তিনি দীর্ঘবর্ণনার উপযোগী যে গীতিরসাত্মক ভাষার উদ্বোধন করিয়াছিলেন তাহার মাধুর্য উল্লেখযোগ্য, কেননা অতঃপর এই ভাষাভঙ্গিই (সমিল ও অমিল পয়ার এবং ত্রিপদীতে) তাঁহার আখ্যায়িকা-কাব্যসমূহে বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে; আবার উহার মধ্যেই পরবর্তী-যুগের সমৃদ্ধ ভাবকল্পনার বাহন হইবার প্রতিশ্রুতিও নিহিত ছিল দেখা যায়। নিম্নের উদ্ধৃতিটুকুতে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপের' আবেগমন্থর ভাষার পূর্বাভাস সূচিত হয় নাই কী ?

পড়ে কি হে মনে,
সেইদিনে ? একদিন নির্ঝরিণী পাশে,
যথায় নির্গত বারি তুষিতে সম্ভাষে
ভাসায়ে প্রণালী-শিলা স্ফটিক জীবনে,
বসিয়াছিলাম নাথ ! শীতল ছায়ায় ;
মধ্যাহ্ন রবির করে, সলিল শিকর
পতিত হইতেছিল ইন্দ্রধনু প্রায়,
বিকাশি কিরণচ্ছটা, মরি কি সুন্দর !
প্রখর ভাস্কর তাপে তাপিত অবনী।
মণ্ডিত আতপতাপে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অদূরে জ্বলিতেছিল ধাঁধিয়া নয়ন,
বিহঙ্গ বসিয়া ডালে নীরব অমনি,
কেবল বায়সগণ কখন কখন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্ন স্বরে ;

গাভীগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত-কলেবরে।

মধুসূদনের অনুরূপ দুরূহ সংস্কৃতশব্দ এবং বাগ্‌ভঙ্গি প্রথম দিকে নবীনচন্দ্র কিছু কিছু প্রয়োগ করেন নাই এমন নহে। যেমন, 'পলাশির যুদ্ধে'—পরাক্রমে পরন্তপ, সুগোলমৃণালভুজ, দ্রুত ইরম্মদ বেগে, প্রভঞ্জনসহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি, নশ্বর সমরে, পরিস্কারি নেত্রদ্বয়, অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু-আবৃতবদন, নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল—প্রভৃতি প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'রঙ্গমতী'তেই মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের অনুকৃতি সর্বাধিক। উদাহরণস্বরূপ এখানে কাব্যাংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল,—

নবীন নিদাঘ আভা, প্রখর উজ্জ্বল,
পড়িয়াছে বসন্তের কম কলেবরে,—
ভাঙ্গিল বিলাস স্বপ্ন, ঋতুকুলপতি
জাগিলা ফাল্গুন শেষে কুসুম শয্যায়;
প্রণয়িনী উরঃ স্বর্গে প্রভাতে যেমতি
জাগিলা প্রেমিক, নিশি-বিলাসে বিহ্বল।
সরোষে কুসুমাকার কহিলা হাসিয়া,—
"বসুন্ধরে! ছি! ছি! একি রীতি তব! যেই
সরস কুসুম দামে, শ্যামাঙ্গ তোমার
সাজাইনু শ্যামাঙ্গিনী! সেই পুষ্পচয়
না হইতে শুষ্ক,—না হইতে শেষ মম
কেলি অভিনয়,—কহ আসিল কেমনে
উগ্র মূর্তি এ অতিথি বিলাস-মন্দিরে
মম? (রঙ্গমতী—১ম সর্গ)

এতদ্‌ভিন্ন—বিদাইয়া, ত্রানিয়া, শাস্তিব, কলঙ্কিব প্রভৃতি নামধাতু, এবং 'পূর্ববঙ্গত্রাস', 'বীরকুলর্ষভভ্রাতা', 'নক্রবেগে সাঁতারিয়া', 'সরলমৃণালভুজে', 'গলত্রক্তনিভাননা', 'যথা ধৃতবিহঙ্গিনী নিষাদপিঞ্জরে', 'তুষারশৃঙ্খল যথা ত্বিষাম্পতি করে', 'উদয় অচলে যথা দেব অংশুমালী', 'রেখেছে মাখিয়া তরলবিদ্যুতে কিবা স্বর্ণ মলম্বায়', 'দম্ভোলী যেমতি মিশায় আকাশ-অঙ্গে',—প্রভৃতি মাইকেলী-বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগ 'রঙ্গমতী'তে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইবে। মাইকেলের ভাষা ও ছন্দের অনুকৃতিতে নবীনচন্দ্র তুলনায় যে অধিক সাফল্য

অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় 'রঙ্গমতীতে'ই রহিয়াছে। তথাপি নবীনচন্দ্র তাহাতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন নাই, বরং পূর্বোক্ত 'দুঃখিনী কামিনী' কবিতার আবেগোচ্ছল বর্ণনাত্মক কবিভাষাই যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' আরও সমৃদ্ধতরভাবে অনুসৃত হইবে, তাহার আভাস এবং ঐ প্রকাশভঙ্গির প্রতি নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতাও এই 'রঙ্গমতী'তেই পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন—

দেখিলা যুবক
উদাসিনী প্রকৃতির শোভা। কলেবর
ধূসর আকাশ, জলে বিভূতিমণ্ডিত,
জটাভার বনরাজি। পশ্চিম ভাস্করে
করিয়াছে দেহ রক্তচন্দনে চর্চিত।
মরি! কি উদাস মূর্তি! যুবক তখন
চাহিলা অন্তর পানে। দেখিলা তথায়,—
দেখিলা হৃদয় বিশ্ব প্রণয়-কিরণে,
সৌর করজালে যেন, পূর্ণ বিভাসিত।
এইরূপে অনিশ্চিত কানন ভিতরে
পড়িয়াছে সেই কর, সেই করে হায়।
ফুটায় নলিনী ফুল্ল চিত্ত-সরোবরে। (১ম সর্গ)

যেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের উপযোগী স্বচ্ছ গদ্যভাষা সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন, সেই সময়েই নবীনচন্দ্র মাইকেলের গম্ভীর আড়ম্বরপূর্ণ ক্লাসিক-ভাষাকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের (কিম্বা কাব্যোপন্যাসের) উপযোগী করিয়া তাহাতে আবেগতরঙ্গ জাগাইয়া তুলিলেন। গদ্যভাষার যুগোচিত সহজ সৌন্দর্য কাব্যভাষাকেও দুরূহ সংস্কৃত শব্দভার মুক্ত করিয়া বর্ণনার বর্ণ-বিস্তারের সুযোগ দিল। সুতরাং মধুসূদনের কবিভাষার সার্থক অনুকরণ করিতে পারেন নাই—ইহা নবীনচন্দ্রের পক্ষে অগৌরবের কথা নহে; বরং তিনি যে ভিন্ন প্রকৃতির মহাকাব্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যেভাবে তাহাকে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ অনুকৃতি শোচনীয়ই হইত। তাঁহার এই গীতিরসাত্মক প্রকাশভঙ্গিতে ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই, তবু ইহাতেই তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের মধ্যে যে এক যথার্থ কবিপ্রাণ বিদ্যমান ছিল এবং স্থানে স্থানে গদ্যময়তা সত্ত্বেও তাহার প্রকাশ যে ক্ষণে ক্ষণে কবিত্বের বিদ্যুৎ-শিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহৃদয় রসিক পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রবীন্দ্র-যুগের ভাবালাবণ্য এবং গীতিময় চিত্রল বর্ণনাভঙ্গির পূর্বাভাষ তাঁহাতে সুস্পষ্ট। আমরা পূর্বে প্রতিটি কাব্য আলোচনাকালে তাঁহার রচনার কাব্য-সৌন্দর্যও প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃতিযোগে বিশ্লেষণ করিয়াছি। এখানে যথার্থ কবিত্বের আরও কিছু নিদর্শন দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি—পর্বত-সমুদ্রের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসঞ্জাত বর্ণনা নবীনচন্দ্রের মধ্যেই যেন আমরা প্রথম সুস্পষ্টরূপে পাইলাম, কেননা তিনি পর্বত-সমুদ্রশোভিত চট্টগ্রামের সন্তান। তাঁহার দৃষ্টিতে পর্বতের উত্তুঙ্গ বিশাল সুগম্ভীর রূপ—

সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত পর্বত-লহরী,—
গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে!
প্রকৃতি কৌতুকশীলা, আহা মরি! যেন
উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ
তরঙ্গ-লহরী-লীলা ভূধরশিখরে,—
অচঞ্চল, অতরল, অমর, অটল। (রঙ্গমতী—৩য় সর্গ)

তেমনি সমুদ্রের শুধু তরঙ্গোদ্বেল রূপ নয়—সমুদ্র এবং আকাশে যে আনন্দলীলা সঞ্চারিত, প্রকৃতির উদার উৎসঙ্গে যে প্রশান্তি প্রসারিত, তাহার অপূর্ব ভাবময় চিত্র নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে রহিয়াছে—

নির্মল আনন্দরাশি, নির্মল আনন্দহাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্মল,—
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
অপরাহ্ণ,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য! অনন্তের অনন্ত মিলন!

নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা,
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার। (প্রভাস—১ম সর্গ)

সমুদ্রের এই উদার পটভূমিকায় হিরণ্ময় প্রভাতের এক শান্তোজ্জ্বল মহিমা কত মাধুর্য ও পবিত্রতার সমন্বয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নের ছত্র কয়টিতে—

লক্ষ্মীপূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে,
সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক করি অভিনয়,
দেখ পার্থ, সিন্ধু গর্ভে উঠিছে কেমন।
পদ্মমুখী পদ্মালয়া ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিলা যেমতি রঞ্জি রূপের বিভায়
নীলসিন্ধু, নীলাকাশ শ্যামল ধরায়।
হাসিল যেমতি সেই রূপের পরশে
নারায়ণ নীলবক্ষ, হাসিতেছে দেখ
উষার প্রথমালোকে সুনীল গগন,
সুনীল বারিদপুঞ্জ স্তরে স্তরে স্তরে,—
স্থির বিজলীতে যেন চিত্ত বিভাসিত।

*　　*　　*

ধীরে ধীরে হতেছে বিকাশ—
নীল সিন্ধু, শ্বেত'বলা, ধূসর আকাশ।

(রৈবতক—১ম সর্গ)

তেমনি সন্ধ্যার বর্ণনায়ও অনুরূপ প্রশান্তি বিদ্যমান—

অস্তমিত দিনমণি; দেখিলা কুমার
নীরব, নির্জন, স্থির, শান্ত প্রকৃতির
শ্যাম বক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
শান্তিময়ী সুগভীরা, সুকোমল করে।

(অমিতাভ—১৩শ সর্গ)

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহে দেখিতে পাই—প্রাণধর্মী কবির অকৃত্রিম উপলব্ধিতে প্রকৃতি জীবন্ত সত্তা লইয়া আবির্ভূত; এগুলি ঠিক স্থির-চিত্র নহে, বরং জীবনচাঞ্চল্যে স্পন্দমান। তেমনি নিম্নোদ্ধৃত বর্ষা-বর্ণনাটিতে চমৎকার গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে,—

অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদজাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যা-ছায়া যেন কাননশোভায়।
তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে
আসিতেছে বারিধারা ; দুই চারি, দশ,—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা ; ছুটিল গোপাল
হাম্বারবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক-বালিকা,
কেহ গিরিকোটরেতে, কেহ তরুতলে
প্রশস্ত পল্লবছত্রে—লইনু আশ্রয়।

*　　　*　　　*

সেই ঘন বরিষণ, ঘন গরজন
প্রতিধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘ,
মেঘেতে বিজলীখেলা, সজল সে হাসি,
গিরিবাহী প্রপাতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
সদ্যঃস্নাত কাননের পরিমলময়
সুশীতল মন্দশ্বাস,—করিল হৃদয়
উচ্ছ্বসিত সুবাসিত, প্লাবিত, পূর্ণিত।

(রৈবতক—৭ম)

'তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে'—এই একটিমাত্র অপূর্ব বাক্যবন্ধেই অরণ্যে বর্ষার রাজকীয় সমাগম সূচিত হইয়াছে। তারপর বিন্দু বিন্দু বারিপতন হইতে অবিরল ধারাবর্ষণ, ভয়চকিত উর্ধ্বপুচ্ছ ধেনুগণের সশব্দ পলায়ন, বিপর্যস্ত রাখালগণের ইতস্ততঃ আশ্রয়সন্ধান, মেঘবিদ্যুৎ-লীলাচঞ্চল প্রচণ্ড বর্ষণের বিরতি, সদ্যস্নাত কাননের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য—সমস্ত মিলাইয়া বর্ষার এক সজীব গতিশীল চিত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার সূচনাংশ স্মরণ করাইয়া দেয়। তেমনি নিম্নোদ্ধৃত বসন্ত-বর্ণনার সহিত জরৎকারুর প্রথম প্রেমের স্মৃতিচারণসুখ জড়িত হইয়া গিয়া এক বেদনা-মধুর চিত্রসঙ্গীত জাগিয়া উঠিয়াছে,—

একদিন মধুমাসে　　　মধুরে চাঁদনি হাসে,
মাধুরী ঢালিয়া নীলিমায়

সরসীর নীল নীরে, ঢালিয়া মাধুরী তীরে
উপবন শ্যামল শোভায়।
বহে সন্ধ্যানিল ধীরে চুম্বি ক্ষুদ্র ঊর্মি-নীরে,
চুম্বি ঊর্মি প্রাণের ভিতর।
কি অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসের, কি অজ্ঞাত নিঃশ্বাসের
উচ্ছ্বাসেতে পূর্ণিত অন্তর। (রৈবতক—৮ম)

এতদ্‌ভিন্ন নানাপ্রসঙ্গে বিচিত্র প্রাকৃতিক অবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতময় বর্ণনা অত্যন্ত উপভোগ্য ;—

শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে। (পলাশির যুদ্ধ—২য়)

* * *

প্রভাতের বাল-সূর্য জ্বালিয়া মধ্যাহ্নভাতি
সায়াহ্নের আঁধারে লুকায়। (অমিতাভ—৭ম)

প্রকৃতি-রাজ্য হইতেই উপমা আহরণ করিয়া মানবচরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ লক্ষণীয়—

রুক্মিণীর দৃষ্টি,—দৃষ্টি শান্ত জ্যোৎস্নার।
সত্যভামা-দৃষ্টি,—দৃষ্টি গাম্ভীর্য সন্ধ্যার। (প্রভাস—১ম)

রূপৈশ্বর্য-বর্ণনায়ও নবীনচন্দ্রের বৈচিত্র্য-বিলাস এবং কল্পনার স্বতঃস্ফূর্তিতে মুগ্ধ হইতে হয়। কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও বা ইঙ্গিতে নানা কাব্যের প্রতিটি নায়িকা চরিত্রের মৌলিক প্রকৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ। নবীনচন্দ্রের বর্ণাঢ্য কবিভাষা এই সব ক্ষেত্রে যেমন মধুর স্বাচ্ছন্দ্যে বিলসিত, তেমনি উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে পরবর্তী যুগের প্রকাশ-ভঙ্গির আভাসও দুর্লক্ষ্য নয়। নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব তাহারই নিদর্শন। প্রণয়ব্যথিতা ক্লিওপেট্রার বর্ণনা—

বিষাদ-আঁধারে এই রূপ-কহিনূর
জ্বলিতেছে, ভাসিতেছে শুকতারা সম
বিষাদ-আকাশ-গায়ে যুগল নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি, মুক্তানিভ !
আছে দাঁড়াইয়া দুই নয়ন-কোণায়।
নড়ে না, ঝরে না,—আহা ! নাহি চাহে যেন

ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে। (ক্লিওপেট্রা)

মূর্ছিতা নায়িকা কুসুমিকার বর্ণনা—

পড়ে আছে কক্ষতলে—সুষমার ছবি—
অচেতন কুসুমিকা, কৌমুদী প্রতিমা।
একটি বীণার তান নিশীথ বিপিনে
মূর্তিমতী যেন! এক খণ্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোন আঁধার কুটীরে। (রঙ্গমতী—৬ষ্ঠ)

কোমলপ্রাণা প্রণয়ভীরু সরলা সুভদ্রার বর্ণনা—

পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত,
অলক-আঁধারে ওই অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশি,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি ;
অতীতের সুখ-স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা,
নিরাশার অন্ধকারে যেন ভালবাসা। (রৈবতক—৬ষ্ঠ)

যৌবনচঞ্চলা রূপসচেতনা জরৎকারুর বর্ণনা—

কি গঠন ক্ষীণ কটি! হৃদয়ে তরঙ্গ দুটি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায়, আপনি উন্মত্তপ্রায়,
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস। (রৈবতক—৮ম)

এই সমস্ত বর্ণনার বর্ণোজ্জ্বলতা শুধু নবীনচন্দ্রের ভাবমদির কবিহৃদয়কে প্রকাশ করিতেছে না—তাঁহাকে বারে বারে রবিরশ্মিপ্রদীপ্ত যুগেও টানিয়া আনিতেছে। প্রেমবিদীর্ণা জরৎকারুর এই করুণ আর্তনাদ—

কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন? (কুরুক্ষেত্র—৮ম)

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের—

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি, বিধি হে। (গুপ্ত প্রেম—মানসী)

এই উক্তির রস-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তেমনি সুভদ্রাকে প্রথম দেখিয়া অর্জুনের নিম্নোক্ত বিহ্বল অবস্থার সহিত—

অর্জুন ভাবিলা মনে সেই গিরিমূলে
সেই প্রপাতের পার্শ্বে নির্ঝরিণী কূলে,
বিসর্জিয়া রাজ্য, ধন, বীরত্ব-পিপাসা,
রহিবেন নির্মাইয়া পল্লব কুটীর,
ওই মুখখানি পানে চাহিয়া চাহিয়া। (রৈবতক—২য়)

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে,*—

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।

যাহা হোক, নবীনচন্দ্রের কবিভাষার এই প্রসাদগুণ, বর্ণনার চিত্রধর্মিতা এবং আবেগবিহ্বল কল্পনাবিহারের বৈশিষ্ট্যটুকু সহৃদয় পাঠককে উপলব্ধি করিতেই হইবে।

কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নবীনচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ অধিকার এবং রূপকল্প-সৃষ্টিতে তাঁহার অযত্নসিদ্ধ নৈপুণ্যের বহু নিদর্শন আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু নানাস্থানে ভাষাপ্রয়োগে সামঞ্জস্যবোধের অভাব, মহৎ ধারণার (sublime) সহিত উপহাস্য ধারণার (Ridiculous) নিবিচার মিশ্রণ, বর্ণনার বাহুল্যপূর্ণ বিস্তার, রচনার কারুকৃতি সম্পর্কে অনবধানতা ও ঔদাসীন্য—এই সমস্ত ত্রুটিতে দোষদুষ্ট হইয়া নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টি বহুকাল কঠোর সমালোচনার বিষয় হইয়া আছে। এই পরিমিতিহীনতা নবীনচন্দ্রের কাব্যের গুণ-দোষেরও অধিক, ইহা তাঁহার অসংযত উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবিস্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত, এমন কি ইহাই তাঁহার অন্যতম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও বলা চলে। স্বল্পায়তন কাব্যে—যেমন 'পলাশির যুদ্ধে'—তাঁহার কল্পনাবেগ ততটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু বৃহদায়তন 'কাব্যত্রয়ী'তে তাহা অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই আঙ্গিকগত ত্রুটির জন্য মহাকাব্যের মহৎ স্বরূপের সর্ববিধ উপাদান থাকা সত্ত্বেও উহা আশানুরূপ সার্থক সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। অসঙ্গতিপূর্ণ অবান্তর কয়েকটি সর্গ যে কাব্যগৌরব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার

'বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগ' গ্রন্থে 'রৈবতকে'র কতিপয় সামঞ্জস্যহীন বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে উহার সংখ্যা আরও বাড়ান যাইতে পারে।

নবীনচন্দ্র নূতন কোন ছন্দরীতির প্রবর্তন করেন নাই, বরং চিরাচরিত পয়ার ত্রিপদীর বাঁধাপথে পাদচারণাতেই তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের পয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার মধ্যে তিনি তাঁহার কবিমনোবৃত্তির অনুকূল তীব্র আবেগ ও আন্তরিকতার সুর ধ্বনিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বিধবা কামিনী'-তেই এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। যেমন—

অশ্রুজলে ছল ছল নয়নের তারা,—
অকালে শিশিরে কেন সিক্ত কমলিনী?
নীলোৎপল হ'তে ঝরে মুকুতার ধারা,
কাহার লাগিয়া আহা! দিবস-যামিনী?
(অবকাশরঞ্জিনী)

এক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্যমিল-বৈচিত্র্যটুকু লক্ষণীয়। বিহারীলাল এবং হেমচন্দ্রও এইরূপ অন্ত্যমিল কখনো কখনো প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পয়ারের স্তবক-গঠনে নবীনচন্দ্র কিছুটা বৈচিত্র্য আনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ বিচিত্র অন্ত্যমিল স্তবকের সৌকর্যবিধান করিয়া থাকে। নবীনচন্দ্র এইরূপ চারি চরণের স্তবক (Quatrain) ব্যতীত ছয় চরণের স্তবকও রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—

শারদ-চন্দ্রমাতলে, সরোবর-তীরে,
বসি প্রাণেশের কাছে পুলকিত মনে,
নাচিতে হিল্লোলমালা অতি ধীরে ধীরে,
নৈশ সমীরণ-স্রোতে নিরখি নয়নে,
শুনাইব পবিত্র প্রণয়-আলাপন,
দেখাব প্রণয় বিশ্বমোহন কেমন। (অবলাবান্ধব—
অবকাশরঞ্জিনী)

এখানে অন্ত্যমিল পদ্ধতি ক খ ক খ গ গ। তেমনি আট চরণবিশিষ্ট স্তবকের সৌন্দর্যও রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—

সুদূরে তরঙ্গ-মালা, বঙ্গ-পারাবারে
তুলিয়া তরল শিরঃ, নীল কলেবর,
দেখিছে কেমনে অস্ত যায় প্রভাকর ;
সে নীল সলিল-লীলা কে বলিতে পারে ?
অদূরে স্বর্ণরেখা শান্ত স্রোতস্বতী,
সন্ধ্যালোকে শোভে যেন রজতের হার ;
শোভে তীরে তরুরাজী, শ্যামরূপবতী ,
ভাসে নীরে ক্ষুদ্রতরী পক্ষীর আকার।

(পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী—অবকাশরঞ্জিনী)

এখানে মিলের গঠন ক খ খ ক গ ঘ গ ঘ। আবার 'পলাশির যুদ্ধে' দশ চরণের নবতর স্তবকে এই পয়ারছন্দই বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন ;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ-নেত্রে, কষ্টে, যেন একমনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে, কিম্বা চিত্তসনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্‌ঘাটন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

এখানে নবীনচন্দ্র যদি স্পেন্সেরিয়ান স্তবকের আদর্শ আদৌ অনুকরণ করিয়া থাকেন,* তবে সেই অনুকরণ সার্থক হয় নাই। কেননা, উক্ত স্তবকের বৈশিষ্ট্য হইল—'The stanza used by Spenser in Farie Queene, consisting of eight 5-stress lines followed by one 6-strees line, with the rhyme scheme, a b a b b c b c c.'* বায়রণ তাঁহার 'Childe Harold's Pilgrimage' কাব্যে এই স্তবকবন্ধের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের "পলাশির যুদ্ধ" Childe Harold-এর ভাবরসে পুষ্ট বলিয়া

এবং স্তবকগঠন ও অন্ত্যমিলবৈচিত্র্যরীতি ইহাতেও প্রবর্তিত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত অনুমান করা হইয়া থাকে। স্তবক-গঠনের বিচিত্র রূপ নবীনচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনীতে' পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্ত্যমিলের বৈচিত্র্য সেখানেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। স্পেন্সেরিয়ান স্তবকে আটটি Iambic Pentameter-চরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনি নবম দীর্ঘ Alexandrine-চরণটিতে প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়া এক সুন্দর বৈচিত্র্যের স্বাদ আনিয়া দেয়। নবীনচন্দ্র বাঙ্গালা পয়ারের সাধারণ দশটি চরণ লইয়া স্তবক বাঁধিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে অন্ত্যমিলের বৈচিত্র্য (ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ) যুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বাঙ্গালা পয়ারেরই দীর্ঘতর স্তবকবন্ধ মাত্র, যাহার সম্পর্কে মোহিতলালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।—"ইহাকে প্রায় বৃহত্তম পদবন্ধ বলা যাইতে পারে—এগুলি দশ পংক্তির এক একটি দশক, অতএব ইহাতে পদবন্ধের সর্ববিধ কারিগরির অবকাশ আছে। কিন্তু কবি সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই।......অতএব, আকারে যেমন হোক, গঠনে এই পদবন্ধ অতিশয় শিথিল, এবং ইহার স্রোতও প্রায় একটানা। তথাপি অনেকস্থলে, মিলের সতর্কতায় এবং ভাবের সম্পূর্ণতায়, 'পলাশির যুদ্ধ' পদবন্ধের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, এবং কাব্যবিশেষের পক্ষে বাংলা পদবন্ধও যে কিরূপ উপযোগী হইতে পারে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।"[৭] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থের 'তাজমহল' কবিতায় এই চতুর্দশ মাত্রার পয়ারের দশ চরণবিশিষ্ট স্তবকেই দশম চরণটিকে অষ্টাদশ মাত্রায় প্রসারিত করিয়া কিছুটা স্পেন্সেরিয়ান স্তবকের ধারণা দিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলাকাব্যে উক্ত স্তবকের সার্থক অনুকরণ একমাত্র মোহিতলালই করিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'স্মরগরল' কাব্যের 'নারীস্তোত্র' কবিতাটিতে। অষ্টাদশ মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ পয়ারের আটটি চরণের সহিত দ্বাবিংশ মাত্রাবিশিষ্ট একটি চরণ সংযুক্ত করিয়া তিনি উক্ত ইংরেজী স্তবকবন্ধের রূপকল্পটি (pattern) সুন্দরভাবে ধরিয়া দিয়াছেন।

'অবকাশরঞ্জিনী'র খণ্ডকবিতাসমূহেই নবীনচন্দ্র ছন্দোগঠনের যাহা কিছু বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। লঘু-ত্রিপদীর নিদর্শন তাঁহার মধ্যে সামান্যই দৃষ্ট হয়, এবং কাহিনীকাব্য 'কুরুক্ষেত্রে' কিম্বা জীবনীকাব্য 'অমৃতাভে' কখনো কখনো উহা প্রয়োগ করিতে গিয়া রচনাকে বরং তিনি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার কারণ, নবীনচন্দ্রের উদ্দাম ভাবাবেগ বহনের জন্য

পয়ারের পরে দীর্ঘত্রিপদীর (৮+৮+১০ মাত্রার) প্রশস্ততাই অধিক উপযোগী ছিল, লঘুত্রিপদীর লঘুতা নহে।

তাই পয়ার এবং দীর্ঘ-ত্রিপদীর ব্যবহারই নবীনচন্দ্রে অধিক। এতদ্‌ভিন্ন বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র কর্তৃক বহুলভাবে প্রযুক্ত বারো মাত্রার ছন্দ (৬+৬) নবীনচন্দ্রও কখনো কখনো ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

হৃদয়ের ভাব কথায় কেমনে
প্রকাশিব বল স্বজনী-সকাশে ?
খেলে যে লহরী জলধি-জীবনে
সরসী সে লীলা কেমনে প্রকাশে ?

(নিরাশ প্রণয়—অবকাশরঞ্জিনী)

এই বারো মাত্রার ছন্দে রচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতিকবিতাটিকে নবীনচন্দ্র 'সনেট' আখ্যা দিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র-নিভ ফুল্লচন্দ্র মুখে,
মহিমার হাসি ভাসিছে তায় ;
পতি-গরবেতে গরবিত বুকে
গরব-তরঙ্গ খেলিয়া যায়।
পূর্ণ কলেবর, চিত্র পূর্ণতার,
পবিত্র মাধুরী কোমলতাময় ;
পূর্ণ-সিন্ধু-জলে, উচ্ছ্বাস আধার,
ফুটন্ত জ্যোৎস্না হতেছে লয়।
পতি-ভালবাসা অঙ্গে অঙ্গে মাখা,
পতি-ভালবাসা হৃদয়ে ভরে,
পতি-ভালবাসা নাহি যায় রাখা,
হৃদয় ভরিয়া উথলে পড়ে।
সোনার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে-পতি শিব চন্দ্রের মতন !

(প্রতিকৃতি—অবকাশরঞ্জিনী)

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি (৭৮ পৃঃ দ্রঃ), প্রকৃতপক্ষে সাতটি পূর্ণাঙ্গ চরণের প্রত্যেকটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চতুর্দশ চরণসজ্জার প্রয়াস ব্যতীত উহাতে সনেট-লক্ষণ কিছুই নাই। সনেটের সুদৃঢ় কায়ায় সুনির্দিষ্ট একটি ভাবকে

অষ্টক-ষট্‌ক পর্যায়ে সন্নিবেশিত করার সংযত-কৌশল উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও পরিমিতি-বোধহীন কবি নবীনচন্দ্রের অনায়ত্ত ছিল। কবিতাটিতে প্রথম-তৃতীয়, পঞ্চম-সপ্তম, নবম-একাদশ চরণে যে অন্ত্যমিল দৃষ্ট হয়, তাহা বস্তুতঃ পদাভ্যন্তরস্থিত মিল, উহাকে সনেটের অন্ত্যমিল-বৈচিত্র্য মনে করিবার কারণ নাই।

ত্রিপদীর আকারে পনেরো মাত্রার ছন্দও নবীনচন্দ্র গীতিকবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না সৃজিল ?
লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশাণ ?
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল ?
(হৃদয়উচ্ছ্বাস—অবকাশরঞ্জিনী)

পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর পরে ষোল মাত্রার ছন্দের প্রতি নবীনচন্দ্রের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। 'কাব্যত্রয়ী'তে তিনি প্রধানতঃ এই তিন ধরণের ছন্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। ষোল মাত্রার ছন্দটিকে কবি যেন বেদনা-গাম্ভীর্য প্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী মনে করিতেন। তাই 'কুরুক্ষেত্রে'র শেষ সর্গে শোকাবেগ বহনের জন্য ঐ ছন্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। এমন কি, বাংলাকাব্যে বেদনা-মন্থর আবেগ, শান্তরস ও ভক্তি-উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়োজনে এই ছন্দটির বহুল প্রয়োগ সম্ভবতঃ নবীনচন্দ্রই করিয়াছেন। 'প্রভাসে'র নিম্নোদ্ধৃত উপসংহার অংশটুকু হইতেই এই ছন্দে নবীনচন্দ্রের অকৃত্রিম আত্ম-উদ্‌ঘাটনের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর ;
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।
গীত-শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে !
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাসতীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী !
এই তীরে সন্ধ্যা, উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী !

অভিপ্রায় এবং যত্ন থাকিলে অধিক মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘতর বিলম্বিত ছন্দও যে নবীনচন্দ্র রচনা করিতে পারিতেন, তাহার সামান্য নিদর্শন 'কাব্যত্রয়ী'তে ভিন্নতর ছন্দের ফাঁকে সম্ভবতঃ কবির অজ্ঞাতসারেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—অষ্টাদশ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার—

শয্যাপার্শ্বে ছিল পড়ি অযতনে বিচিত্র দর্পণ,
লইয়া রূপসী গেল সুবাসিত দ্বীপের সদন।

(রৈবতক—১৮শ)

এবং দ্বাবিংশ মাত্রার ত্রিপদী-গোত্রীয় ছন্দ—

যথা আকাশেতে নিত্য সর্বগামী মহাবায়ু করে অবস্থান,
সেইরূপে সর্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত,—তিনি ভগবান।

(কুরুক্ষেত্র—৪র্থ)

স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ প্রয়োগের একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখিতে পাই 'রঙ্গমতী' কাব্যে মাঝিদের গানে—তালে তালে দাঁড় ফেলিবার ধ্বনিটি পর্যন্ত কবি এখানে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, সেই সঙ্গে কবিতার ভাবেও উদাস বিরহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেমন—

একবার—একবার,
বঁধু মোর—কণ্ঠহার!
একবার—দুইবার,
বঁধু মোর—চন্দ্রহার!
একবার—তিনবার,
প্রাণ বঁধু—অবলার!
একবার—তিনবার,
বঁধু নাহি—এল আর!

কৌতূহলী পাঠক বহু পরবর্তী কালে ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও অনুরূপ উপলক্ষে একই ছন্দধ্বনির প্রকাশ দেখিয়া আনন্দবোধ করিবেন। যেমন—

ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা,
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল। ('দূরের পাল্লা'—কাব্যসঞ্চয়ন)

এইটুকু ছাড়া স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ বা ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ নবীনচন্দ্রের কাব্যে একেবারেই নাই বলিলে চলে। সম্ভবতঃ গভীর গম্ভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের পক্ষে এই ছন্দটিকে নবীনচন্দ্র তেমন উপযোগী মনে করিতেন না; মধুসূদনও কদাচিৎ প্রহসনে ব্যতীত এই ছড়ার ছন্দ অন্যত্র প্রয়োগ করেন নাই। হেমচন্দ্রও মাত্র সাময়িক বিষয়ের কৌতুককর বর্ণনার জন্যই ঐ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইলেও হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র কেহই নিজ নিজ মহাকাব্যে উহার যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। আবার একই কাব্যে একই ছন্দে সর্ববিধ ভাব মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ করা যে সম্ভব, মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির পরেও একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে উভয় কবিই অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাই অমিত্রাক্ষরের শক্তির উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর পয়ার-ত্রিপদীর (হেমচন্দ্রে মিত্রাক্ষর পয়ার ছাড়াও লঘুত্রিপদী, বারো মাত্রার একাবলী এবং অন্য দু-একটি ছন্দ দৃষ্ট হয়) আশ্রয় লইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের মত রীতিনিষ্ঠ এবং নবীনচন্দ্রের মত উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবির পক্ষে এই চিরাচরিত ছন্দের অভিভাবকত্ব যেন প্রয়োজন ছিল। তবু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে,—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের রসবৈভব এবং ধ্বনিমাধুর্য অনুকারকদের মধ্যে একমাত্র নবীনচন্দ্রই কিছুটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তদুপরি মধুসূদনের ছন্দপথে চলিতে গিয়া তিনি 'ক্লিওপেট্রা', 'রঙ্গমতী', 'কাব্যত্রয়ী' এবং 'অমিতাভ'-এ গীতিরসাত্মক দীর্ঘ বর্ণনার উপযোগী এমন এক অমিল পয়ার-স্রোত সৃষ্টি করিলেন, যাহা পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে কমনীয় লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

'অবকাশরঞ্জিনী'র 'অশোকবনে সীতা' কবিতাটি ব্যতীত নবীনচন্দ্র মধু-প্রবর্তিত অমিত্রছন্দের প্রয়োগে প্রথম প্রথম ততটা তৎপর হন নাই; তখনো গীতিলক্ষণাক্রান্ত পয়ার ও ত্রিপদীই তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত কবিতাটির ধারণাও যেমন মূলতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ হইতে গৃহীত, ভাষা এবং ছন্দও তেমনি সুন্দরভাবে অনুকৃত।

চিত্র-নভঃকিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকশিত নৈশ কুসুম-মালায়

উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির-নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে। বিশ্বচরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।

* * *

ছুটিয়াছে কল্লোলিনী নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল তীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।

লক্ষ্য করিতে হইবে,—এই প্রথম প্রয়াসেই নবীনচন্দ্র মধুসূদনের ধ্বনিগাম্ভীর্য অনেকটা বজায় রাখিয়াও বর্ণনাত্মক ভাষার সারল্য ও গীতিমাধুর্য দিয়া সেই ছন্দকে আখ্যায়িকা কাব্যের প্রয়োজনে ভিন্নতরভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, উহার বহমানতা চরণমধ্যে নানাস্থানে আট মাত্রায় যতি-পতনেও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; কিছুকাল পরে রচিত 'ক্লিওপেট্রা'র মত দীর্ঘ কবিতায় নবীনচন্দ্র এই রীতিতে আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার সহিত তুলনায় হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অধিক পরিমাণে মধুসূদনের অনুস্মৃতি-সঞ্জাত হইয়াও আড়ষ্ট রহিয়া গিয়াছে, একান্ত প্রথানুগত্য তাঁহার এই আড়ষ্টতার কারণ বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি-সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অন্যথা করি নাই।"[৮] উভয়ের কাব্য হইতে বর্ণনাত্মক দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিলে আমাদের পূর্ব মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যাইবে—

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্বতমালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;

অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোনখানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

(বৃত্রসংহার—১০ম সর্গ)

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন-বিভায়
দিবসান্তে আতপের;—মিশিতেছে ধীরে
সুখশান্তি ছায়া যেন সন্তাপশিখায়।
উঠিছে পূরবে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর; নীলাম্বরে শুক্র শশধর।
শারদীয় শুক্লাষ্টমী। কৃষ্ণের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সেই রজততিলক
প্রকৃতি ললাটে,—স্থির নীলিমা-সাগরে
শুক্র ফেনখণ্ড যেন। পার্থের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সান্ধ্য নীলাম্বরতলে
সায়াহ্ন ভূধর শোভা, প্রীতিফুল্ল মন।

(রৈবতক—৭ম সর্গ)

নবীনচন্দ্র মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের ক্লাসিক গঠনকে নহে, প্রবহমান ধ্বনি-সঙ্গীতকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন বলিয়া শুধু মাত্র প্রথায় আবদ্ধ না থাকিয়া ঐ ছন্দকে চিত্র ও বর্ণনারস সৃষ্টির অনুকূল বাহনরূপে প্রয়োগ করিলেন। হেমচন্দ্রও 'রৈবতকে'র এই ছন্দ-প্রবাহের প্রশংসা করিয়া নবীনচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন—"তোমার এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তুমি যেরূপ জলের মত চালাইয়াছ, আমার বিশ্বাস যে, এতদিনে নাটক লিখিবার ভাষা সৃষ্টি হইল।"[১] হেমচন্দ্রের এই বিশ্বাস যে অহেতুক নহে তাহা 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশের (১৩০০) এক বৎসর মাত্র পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, এবং নবীনচন্দ্রের এই ভাষা ও ছন্দ কোন্

বৈশিষ্ট্যের দরুণ রবীন্দ্রনাথের অমিল ও সমিল প্রবহমান পয়ার-রচনার পূর্বাভাসরূপে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে বিরাজ করিতেছে, তাহাও উপলব্ধ হইবে।

এই নবরূপায়িত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবীনচন্দ্র যে কেবল মধুর গীতিরসাত্মক বর্ণনাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা নহে, 'রৈবতকে'র 'পূর্বস্মৃতি' এবং 'কুরুক্ষেত্রে'র 'বীরের শোক' নামক গম্ভীর ও করুণরসাত্মক শ্রেষ্ঠ সর্গ দুইটিও এই ছন্দে রচিত। সুতরাং এই ছন্দরূপটিতে নবীনচন্দ্র আত্মপ্রকাশের যে অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও আত্মপ্রত্যয় থাকিলে তিনি কখনই 'কাব্যত্রয়ী'তে হেমচন্দ্রের অনুরূপ পন্থায়[১০] বিভিন্ন ছন্দের আশ্রয় লইয়া বৈচিত্র্যসৃষ্টির চপলতা প্রদর্শন করিতেন না। যদিও বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্য অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন—

একবৃত্তময়ৈঃ পদৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ।

* * *

নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে ॥[১১]

তথাপি মহাকাব্যের গম্ভীর পরিবেশসৃষ্টি ও বিশাল ঐশ্বর্যপ্রকাশের জন্য Aristotle যে পূর্বাপর এক Heroic Metre-এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ছন্দ হইতে ছন্দান্তরে সংক্রমণে সেই উদাত্ত ধ্বনি স্তিমিত হইয়া পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, —Still more unnatural would it appear, if one were to write an epic in a medley of metres."[১২] বিচিত্র ছন্দপ্রয়োগের ফলে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে আঙ্গিক-শৈথিল্য দেখা দিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। মধুসূদনের অন্তঃকর্ণে মহাকাব্যের ধ্রুপদী সুরমহিমা ঝঙ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি Heroic Metre-এর আদর্শে পয়ার ছন্দকে অন্ত্যানুপ্রাসবর্জিতভাবে তাঁহার সমগ্র কাব্যে তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সেই ছন্দকেই যেভাবে আত্মপ্রকাশের অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতেও বৈচিত্র্যসৃষ্টির সুন্দর অবকাশ ছিল। সুতরাং 'কাব্যত্রয়ী'তে পূর্বাপর ঐ অমিল-প্রবহমান পয়ারের অনুবর্তন করিলে কাব্যোৎকর্ষই সূচিত হইত। ছন্দ-নির্বাচনে সুস্থির বিবেকের অভাবেই নবীনচন্দ্রের কাব্য শিথিলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ছন্দের কাঠামো (pattern) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'কাব্যত্রয়ী'র স্থানে স্থানে নাটকীয় সংলাপ-সৃষ্টি নবীনচন্দ্রের অভিনব প্রয়াস বলিতে হইবে। 'প্রকৃতির

প্রতিশোধ’ নাটকে (১২৯১) রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ছন্দোবদ্ধ (পয়ারে) সংলাপরীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন দেখিতে পাই। কিন্তু মহাকাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ কায়ায় এবং গম্ভীর মহিমময় পরিবেশে এইরূপ নাট্যরীতি-প্রয়োগ সুখাবহ মনে হয় না, কেননা তাহাতে বাগ্‌বাহুল্যজনিত শৈথিল্য আসিয়া পড়িতে পারে। নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও সহজ রঙ্গরসের সুর লাগাইতে গিয়া কবি ছন্দোবদ্ধ কথাগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পাত্র-পাত্রীর মুখে জুড়িয়া দিয়া কৌতুকপূর্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর (Repartee) রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘রৈবতকে’র পঞ্চদশ সর্গে দীর্ঘ-ত্রিপদীর কাঠামোতে কৃষ্ণ এবং সত্যভামার কথোপকথনটুকুর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যাহা হোক, আবেগোচ্ছল কবিত্বস্ফূর্তির প্রয়োজনে নবীনচন্দ্র ভাষা এবং ছন্দে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অনন্যসাধারণ না হইলেও উল্লেখযোগ্য ; কেননা, ইহা সেই যুগের পাঠক-সম্প্রদায়কে যেমন অভিনবত্বের স্বাদ দিয়াছিল, তেমনি পরবর্তী রবীন্দ্রযুগের প্রথম অধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গির পূর্বাভাসও কিয়ৎ পরিমাণে দিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সূত্র-নির্দেশ

১। 'পলাশির যুদ্ধ' সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৮১।

২। 'সঞ্জীবচন্দ্র'—আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

৩। "আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।"—আমার জীবন, ১ম ভাগ, ১৩০পৃঃ।

৪। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের নবযুগ' গ্রন্থে ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রথম এই সাদৃশ্যটুকুর উল্লেখ করেন।

৫। 'ইহা ইংরেজী স্পেন্সরীয় স্তবকের অনুকরণ।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড) ডাঃ সুকুমার সেন, ৩২৭ পৃঃ।

৬। Cassell's Encyclopaedia of Literature, Vol. I. P, 524.

৭। 'বাংলা কবিতার ছন্দ'—মোহিতলাল মজুমদার, ১৫৮ পৃঃ।

৮। 'বৃত্রসংহার', প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। 'আমার জীবন', ৪র্থ ভাগ, ১৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রাংশ।

১০। "নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দইঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে।"—বৃত্রসংহারের বিজ্ঞাপন, হেমচন্দ্র।

১১। 'সাহিত্যদর্পণ', ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ কবিরাজ।

১২। 'Poetics'—Aristotle, P. 83.

উপসংহার

নবীনচন্দ্রের কাব্য-পরিক্রমা এইখানে শেষ হইল। বিস্তৃত পরিসরে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচায়ক সমগ্র রচনারই মর্মোদ্ঘাটন ও রসবিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সেই সূত্রে এক উচ্ছ্বাসময় কবি-হৃদয়ের মধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। নবীনচন্দ্রের কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি এই যে—যুগাদর্শের কবি বলিয়া তাঁহার কাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র ভাবান্দোলনের তরঙ্গাঘাত লাগিয়াছে, যুগজীবনের নানা আদর্শ তাহাতে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। প্রতি পদে পদে উন্নত রসবিচারের মানদণ্ডে সেই বাণীরূপের পরিমাপ করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে, কেননা, সেই যুগের কাব্য-সাধনা ছিল মূলতঃ জীবনপ্রত্যয়, স্বদেশভাবনা ও ধর্মচেতনারই অংশ-বিশেষ; বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের প্রেরণা ততটা নহে, যতটা মহত্তর জাতীয় ভাবের সাধনা। তাই সেই সাধনার বাঙ্ময় প্রকাশকে আমরা প্রথমে যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছি, তৎপর তাহাতে কাব্যসৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়াছি।

এ কথা সত্য যে, সে যুগের অধিকাংশ কবিরই রচনা সর্বথা পরিচ্ছন্ন নহে। কি মহৎ আদর্শের কথা, কি দেশের কথা বা নিজের কথা—সর্বক্ষেত্রেই উচ্চকণ্ঠ প্রচারণা এবং স্পষ্টভাষণকেই যেন কাব্যরূপ দান করা হইয়াছে। শুধু কাব্য কেন, জাতির আত্মবিকাশ-প্রয়াসেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবোন্মাদনা, ভাবগভীরতা নহে। নবীনচন্দ্রের মত objective কবিদের ক্ষেত্রে এ কথা অধিক প্রযোজ্য, কেননা তাঁহারা এই জাতীয় জীবনের আবেগ-উদ্বেগেরই ভাষ্যকার। তখনও কাব্যের আঙ্গিক-পারিপাট্য এবং শিল্প-সচেতনতা ছিল অপেক্ষিত। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, নবীনচন্দ্রের মধ্যে এক যথার্থ কবিপ্রাণ বিদ্যমান ছিল এবং বর্ণাঢ্য কবিভাষা ও আবেগভার-বহনক্ষম ছন্দে তাঁহার অধিকারও স্বল্প ছিল না। তাহারই প্রসাদে বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাঁহার কবিপ্রতিভা স্ফূর্ত হইয়াছিল। নানা স্থানে তাঁহার চিত্রধর্মী বর্ণনা পাঠকচিত্তে মোহ জাগাইয়া তোলে। বাগ্‌-বাহুল্য ও সামঞ্জস্যহীনতার জন্য কখনো কখনো তাঁহার রচনা যতই বিরূপতা সঞ্চার করুক না কেন, আগ্রহশীল পাঠককে অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে যে—তিনি এক জীবন-চঞ্চল আবেগমুখর কবির উষ্ণসঙ্গ লাভ করিতেছেন। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ

হৃদয়ের কবি, সেই হৃদয় প্রকৃতির উদার উৎসঙ্গে লালিত, জীবনবোধ ও আবেগোচ্ছ্বাস দ্বারাই তাহার পরিপুষ্টি, অধ্যয়ন ও মননের দ্বারা নহে। আবার প্রেমই তাঁহার কবিচিত্তের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—কি প্রণয়োপলব্ধিতে, কি স্বদেশপ্রীতিতে, কি মহৎ জীবনানুধ্যানে, কি ভক্তিচেতনায় ঐ প্রেম সর্বত্র দুর্বার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। তাই বহিরঙ্গের দিক দিয়া মধুসূদনের কাব্য-রীতির অনুবর্তন করিলেও রবীন্দ্রযুগপ্রবৃত্তির সহিতই তাঁহার সাধর্ম্য গভীর এবং অন্তরঙ্গ। তাঁহার প্রকাশভঙ্গিও ক্লাসিক নয়, রোমান্টিক—তাই বলিতে গিয়া তিনি গাহিয়া উঠেন, চলিতে গিয়া ভাসিয়া যান। সেইজন্য তাঁহার মহাকাব্যও গীতিসুরে মুখরিত। এক হিসাবে তিনি যেন মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলন-সেতু। তিনি শুধু ভাবাদর্শ-সমন্বয়ের কবি নন, কাব্যাদর্শ-সমন্বয়েরও কবি।

জগৎ ও জীবনের উন্নত আদর্শে গভীর নিষ্ঠা, মানবতার উপর অবিচল বিশ্বাস এবং জাতীয় ঐতিহ্যে বিপুল আস্থা লইয়া ভাবদৃষ্টিতে মহিমান্বিত ভারতের উজ্জ্বল রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই নবীনচন্দ্র "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। মহাকাব্যোপযোগী বিশাল পটভূমিকা এবং ভাববস্তুর উদার বিস্তৃতি একমাত্র ঐ 'কাব্যত্রয়ীতে'ই বিদ্যমান। অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা, বর্ণনাবাহুল্য এবং ছন্দশৈথিল্যের দরুণ উহার কাব্যদীপ্তি কিয়ৎপরিমাণে ম্লান হইলেও আদর্শের উচ্চতন্ত্রীতে বাঁধা সেই সুর আজিকার ভারত-রাষ্ট্রের বিঘোষিত মহান লক্ষ্যের সহিত সুসঙ্গত; আবার জীবনের আশা-নৈরাশ্য, মহিমা-গ্লানি উহাতে যে আনন্দ-হতাশায় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এ যুগের উপন্যাস-রসিকের নিকটও কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হইবে। নবীনচন্দ্রের অনুসৃত কাব্যরীতি বহুকাল পূর্বে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে সত্য, তবু তাঁহার গীতিপ্রবণ কবিধর্ম তাঁহাকে যেন বারে বারে রবীন্দ্রযুগের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিয়াছে। মনে হয়—আর কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করিলে কিম্বা সে যুগের বিচিত্র ভাবসংঘাতে অনাহত থাকিতে পারিলে নবীনচন্দ্র হয়ত বা উপযুক্ত গীতিকবিই হইতে পারিতেন।

দেবকল্প মানবদিগের পূত জীবন-গাথা রচনার মধ্য দিয়া নবীনচন্দ্র যেমন তাঁহার কাব্যে মহাজীবনের মানবিক রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন,

তেমনি সেইযুগের দেশপ্রীতিতে প্রবল পৌরুষ সঞ্চারও তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। তাহা গভীরতাহীন উচ্ছ্বাসময় আর্তনাদ বলিয়া আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—প্রখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবধি আমাদের স্বদেশ-চেতনা ও মুক্তি-সংকল্প প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে, পূর্ববর্তী প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের (অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' হইতে ১৯০৫ সালের আন্দোলনের জের পর্যন্ত) স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা, গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিবে। দেশাত্মবোধ উন্মেষের সমকালীন কবি হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যুগধর্ম ও বীরাচারী কবিধর্মের উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কাব্যে সরব ঘোষণা প্রত্যাশিত ছিল, এবং তাহার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং আদর্শ-মাহাত্ম্য যদি এখনও স্বীকৃত হয়, তবে তাহার চারণ-কবি নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-বিষয়ক কবিতাসমূহের তাৎপর্যও অবশ্যই উপলব্ধ হইবে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র মতই নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' অক্ষয় মহিমায় বিরাজিত।

প্রধানতঃ কবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও গদ্য-রচনায় নবীনচন্দ্রের দক্ষতা বড় অল্প ছিল না। তাঁহার গদ্যভঙ্গি ছিল প্রসাদগুণভূয়িষ্ঠ, বর্ণনায় মনোহারিত্বে, রসকৌতুক-উচ্ছলতায়, সর্বব্যাপী স্বাচ্ছন্দ্যে উহা স্নিগ্ধ ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল; ব্যক্তিহৃদয়ের নিগূঢ় স্পর্শও যেন তাহাতে সর্বাধিক অনুভূত হয়।

একটি কথা। আখ্যায়িকা-কাব্যে নাটকীয় সংলাপ-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া থাকিলেও নাট্যরসবোধ নবীনচন্দ্রের ছিল না। সেক্সপীয়রের 'Mid Summer Night's Dream' নাটকের মর্মানুবাদ পাঠে তাহা উপলব্ধ হয়। এই আলোচনা গ্রন্থের পরিশিষ্টে (ক) প্রদত্ত নবীনচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জীতে 'শুভনির্মাল্য' নামে যে ক্ষুদ্র নাটিকাটির উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ যথাস্থানে পূর্বে দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি (১৩৬৬) শ্রীদীপককুমার সেনের সম্পাদনায় ঐ নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছে। প্রথম প্রকাশকালে মাত্র একশত কপি ছাপা হইয়াছিল বলিয়া উহার কোন প্রচারই হয় নাই। পরে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ, ১৩৫৪) উহা একবার পুনর্মুদ্রিত করেন। যাহা হোক, নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' ৫ম ভাগে

তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রচিত এবং বিবাহ-বাসরে বিতরিত ও অভিনীত এই নাটিকাটির সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। উহার বিষয়বস্তু তাঁহারই ভাষায়—"প্রথম অঙ্কে বর ও পুরোহিত। পুরোহিতের মুখে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা এবং বরের কয়েকটি উপাসনামূলক গান। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার কুলমাতা দশভূজার দ্বারা নন্দনের পারিজাত-গ্রথিত পরিণয় মালা আমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রদান ও উভয়ের মুখে আশীর্বাদ-গীত। তৃতীয় দৃশ্যে বর সভাসীন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুই অপ্সরার নৃত্যগীত।" বলাবাহুল্য, এই 'অপেরা' ধরণের নাটিকাটির বিষয়-মাহাত্ম্য ব্যতীত নাট্যগুণ তেমন কিছু নাই। নবীনচন্দ্রও এই অকিঞ্চিৎকর রচনাটির প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন মনে হয় না।

সর্বশেষে বলিতে হয়, নবীনচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। কোন নূতন যুগ, নূতন আদর্শ, নূতন ভাষা বা ছন্দের প্রবর্তন তিনি করেন নাই; কিন্তু সর্ববিধ রচনায় প্রবল প্রাণধর্ম ও উদ্দাম আবেগ সঞ্চারই তাঁহার কবিপ্রতিভার লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। বিবিধ আঙ্গিকগত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যে সেই প্রাণস্পন্দন আজিও অনুভূত হয়। আবার তাঁহার রচনা সংখ্যায় ও আয়তনে যেমন স্বল্প নহে, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্যেও তাহারা সমৃদ্ধ। সে যুগে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত এত বিচিত্র রচনা-প্রয়াস আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। তাই কবি হিসাবে নবীনচন্দ্র উপেক্ষণীয় তো নহেনই, বরং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালা কাব্য-পাঠকের চিত্তে তাঁহার 'স্বে-মহিম্নি' প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

(ক) নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে সংশোধিত গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল। তালিকায় বন্ধনীমধ্যে যে ইংরাজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরী-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

১। অবকাশরঞ্জিনী, ১ম ভাগ (খণ্ড কাব্য)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ [ইং ১৮৭১]। পৃঃ ১৭১।

ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।

২। পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)। ১ বৈশাখ ১২৮২ [১৫ এপ্রিল ১৮৭৫]। পৃঃ ১৭৩+পরিশিষ্ট ৵০।

ইহার একটি 'বিদ্যালয় পাঠ্য' সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। ভারত উচ্ছ্বাস (কবিতা)। [২০ ডিসেম্বর ১৮৭৫]। পৃঃ ১৩।

ইহা ২য় ভাগ, 'অবকাশরঞ্জিনীর' ১২৯৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত-আগমন উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' রচিত হয়।

৪। ক্লিওপেট্রা (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৮৪ [ইং ১৮৭৭]। পৃঃ ৫১।

ইহা ১২৯৫ সালে মুদ্রিত 'অবকাশরঞ্জিনীর' ২য় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। অবকাশরঞ্জিনী, ২য় খণ্ড (কাব্য)। মাঘ ১২৮৪ সাল [২৯ জানুয়ারী ১৮৭৮]। পৃঃ ২২২।

১২৯৫ সালে প্রকাশিত (পৃঃ ২৮৭) ইহার একটি সংস্করণে এই কয়েকটি কবিতা অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে:—ক্লিওপেট্রা, ভারত-উচ্ছ্বাস, বন্ধুতা ও বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীর্তিনাশা, মেঘনা, একবর্ষ, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, নবজীবন, প্রকৃতির গীত।

৬। রঙ্গমতী (কাব্য)। ১৫ জুলাই, ১৮৮০। পৃঃ ২৪৬+শুদ্ধিপত্র ।০।

৭। রৈবতক (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৯৩ [২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭]। পৃঃ ৩৮০।

৮। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (পদ্যানুবাদ)। [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯] পৃঃ ২০৪।

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (পদ্যানুবাদ)। [ইং ১৮৮৯ ?] পৃঃ ২২৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৭০-৭১) পাঠে জানা যায়, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমিতে' ইহা সমালোচিত হইয়াছিল।

১০। খৃষ্ট (কাব্য)। ১২৯৭ সাল [৪ মার্চ ১৮৯১]। পৃঃ ৬৭।

"মেথু প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবন ও ধর্ম উদ্ধৃত ও কবিতায় অনুবাদিত।"

১১। প্রবাসের পত্র—ভারতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আশ্বিন ১২৯৯ [ইং ১৮৯২]। পৃঃ ১১৮।

"প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুণা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতরমণীর চিত্র, এই তিনখানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।"

১২। কুরুক্ষেত্র (কাব্য)। ৩০ বৈশাখ ১৩০০ [ইং ১৮৯৩]। পৃঃ ৩৪৪।

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান-ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'রৈবতকের' সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রের' সম্যক কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না।

১৩। অমিতাভ (কাব্য)। ২৯ আষাঢ় ১৩০২ [ইং ১৮৯৫]। পৃঃ ।৵০+ ২০১। ইহার বিষয় বুদ্ধলীলা।

১৪। প্রভাস (কাব্য) ? [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬]। পৃঃ ২৪৫+৬ পরিশিষ্ট।

"রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।"

১৫। শুভনির্মাল্য (নাটিকা)। [২৭ জানুয়ারী ১৯০০]। পৃঃ ২০।

চট্টগ্রামে পুত্র নির্মলের বিবাহ উপলক্ষে কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৯৪ দ্রষ্টব্য। পুস্তিকাখানি 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ ১০৫৪) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৬। ভানুমতী (উপন্যাস)। ২৫ মার্চ ১৯০০। পৃঃ ১৭৯।

১৭। আমার জীবন (আত্মজীবনী):

১ম ভাগ। ১৩১৪ সাল [১২ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮]। পৃঃ ২৬২+২ নিবেদন।
২য় ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৬। পৃঃ ৪২৯।
৩য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃঃ ৫১৪।
৪র্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃঃ ৪৭৯।
৫ম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। পৃঃ ৫২৩।

১৮। অমৃতাভ (কাব্য) অগ্রহায়ণ ১৩১৬ [ইং ১৯০৯]। পৃঃ ২২৪।

ইহাই কবির শেষ কাব্য। 'অমৃতাভ' কাব্যের বিষয় চৈতন্যলীলা। কবি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পর্যন্ত) রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকাসহ ইহা প্রকাশিত হয়।

১৯। **গ্রন্থাবলী**: ১৩১১ সালে হিতবাদী কার্যালয় হইতে 'নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'অমৃতাভ', 'শুভনির্মাল্য' ও 'আমার জীবন' ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল পুস্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরে বসুমতী-কার্যালয় হইতেও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নবীনচন্দ্রের বহু রচনা এখনও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিতেছি—

১। 'নব্যভারত' ফাল্গুন ১৩১৫—'কর্ণেল অলকট্' (কবিতা)

২। 'বঙ্গদর্শন' আষাঢ় ১৩১৬—'হরিদ্বার' (ভ্রমণ)

৩। 'মানসী' ১৩১৭-১৯—'নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন'—সেক্সপীয়রের A Midsummer Night's Dream-এর মর্মানুবাদ। ইহার কিয়দংশ প্রথমে ১৩০১ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। 'ভারতবর্ষ' আশ্বিন ১৩২১—'দুর্গোৎসব, ষষ্ঠী' ('দেখে আয় তোরা হিমালয়ে') ও 'দুর্গোৎসব, সপ্তমী' (এস মা আনন্দময়ী)।

৫। 'ভারতবর্ষ' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭—'একটি গান' (মন বল আর কি ভাবনা ?)।

৬। 'ভারতবর্ষ' আষাঢ়, ১৩৪১—'নবীনবাবুর বক্তৃতা ফেনী জুবিলী বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ ইংরেজির প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞাপনী'।

এতদ্ব্যতীত ১ম ভাগ 'নবীনচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ' (প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী—৪র্থ খণ্ড) পুস্তকে নবীনচন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা স্থান পাইয়াছে।

(খ) চাকুরী-জীবনের খতিয়ান

৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবীনচন্দ্রের সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর সরকারী কার্যকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস History of Services Gazetted and other officers serving under the government of Bengal (1903) পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া তাঁহার "নবীনচন্দ্র সেন" (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪১) গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি কবে কোন্ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা ঠিকমত জানা থাকিলে, তাঁহার আত্মজীবনীতে বর্ণিত চাকুরী-জীবনের দীর্ঘ-ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। তজ্জন্য আমরা উহা এখানে উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
	বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের এসিষ্ট্যাণ্ট	১১ জুলাই ১৮৬৮	
যশোহর	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর	—	২৪ জুলাই ১৮৬৮
ঐ	ঐ (৭ম শ্রেণী)	১৭ মে ১৮৬৯	—
শাহাবাদস্থ ভবুয়া	ঐ	৬ জুলাই ১৮৭০	—
চট্টগ্রাম	ঐ	৩ এপ্রিল ১৮৭১	—
ঐ	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১১ জানুয়ারী ১৮৭৪	—
ঐ	কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট	—	১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬
ঐ	ঐ	১৩ আগষ্ট ১৮৭৬	—

ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৫ জুন ১৮৭৭ হইতে ১৯ দিন।

সস্‌পেণ্ডেড : ৪ জুলাই ১৮৭৭ হইতে ১ মাস ১৪ দিন।

ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৮ আগষ্ট ১৮৭৭ হইতে ৩ মাস ১ দিন।

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
পুরী	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টার (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৯ নভেম্বর ১৮৭৭	—
ফরিদপুরস্থ মাদারিপুর	ঐ	২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৮৭৮	—
পাটনাস্থ বেহার	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮০	—
ঐ	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১ আগষ্ট ১৮৮২	—
ভাগলপুর	ঐ (৫ম শ্রেণী)	২ নভেম্বর ১৮৮৩	—
নোয়াখালী	ঐ	৫ মে ১৮৮৪	

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
ফেনী, নোয়াখালী	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টার (৫ম শ্রেণী)	২৫ নভেম্বর ১৮৮৪	—
ঐ	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৭ জানুয়ারী ১৮৮৮	—
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট	—	২৫ এপ্রিল ১৮৯১
নোয়াখালীস্থ ফেণী	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর	১ আগষ্ট ১৮৯১	—
ঐ	ঐ (৩য় শ্রেণী)	—	২৬ অক্টোবর ১৮৯১
ঐ	ঐ	১১ ডিসেম্বর ১৮৯২	—
নদীয়াস্থ রাণাঘাট	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর (৩য় শ্রেণী)	১০ মার্চ ১৮৯৩	—
ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পঃ গঃ	ঐ ঐ	২৯ এপ্রিল ১৮৯৫	—
আলিপুর	ঐ ঐ	১৫ মে ১৮৯৫	—
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	—	৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট	২৫ জানুয়ারী ১৮৯৭	—
ঐ	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর (২য় শ্রেণী)	১৮ জুলাই ১৮৯৭	—
ময়মনসিংহ	ঐ ঐ	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮	
ত্রিপুরা	ঐ ঐ	৫ এপ্রিল ১৮৯৯	—
ছুটি : ১২ মার্চ ১৯০২ হইতে ১১ মাস ২৬ দিন।			
ঐ	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (১ম শ্রেণী)	—	৬ জুলাই ১৯০৩

অবসর গ্রহণ : ১ জুলাই ১৯০৪।

(গ) 'পলাশির যুদ্ধ' ও রাজরোষ

'পলাশির যুদ্ধ' অধ্যায়ে বলিয়াছি—"নির্ভীক স্পষ্টভাষায় জাতীয় অন্তর্দাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া পলাশির যুদ্ধের নানা অংশের জন্য একদা কবিকে সরকারী কর্মচারীরূপে গ্লানি এবং বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল।" এই বিড়ম্বনা ভোগের ইতিহাস নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনের' পঞ্চম ভাগে 'নিষ্কাম হিংসা ও রাজদ্রোহিতা' এবং 'লাটের ক্রোধ' অধ্যায় দুইটিতে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তখন একদিকে সাহিত্যজগতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত, অন্যদিকে চাকুরী-জীবনও তাঁহার প্রায় সমাপ্তির মুখে। প্রবীণ সুদক্ষ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হওয়া সত্বেও দীর্ঘকাল নবীনচন্দ্রের পদোন্নতি স্থগিত ছিল। 'পলাশির যুদ্ধ' সম্পর্কে আপত্তিজ্ঞাপক সরকারী পত্রটি এইরূপ :—

Confidential

No 2275
General Department.
Education Branch.

From :
F. A. Slack, Esqr., C. S.
Offs. Secretary to the Government of Bengal.

To
Babu Nabin Chandra Sen.
Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tippera.

Dated Calcutta, the 28th July, 1899.

Sir,

I am directed to inform you that the attention of His Honour the Lieutenant Governer has been drawn by the report of the Examiner appointed to inquire into the character of the books approved by the Text Book Committee, to the Objectionable nature of several passages, quoted in the annexed sheet,—of your book 'Palasir Yuddha'. I am to say that you will be held responsible for the elimination of these passages from any future edition of that book.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servent,
F. A. Slack

ভবিষ্যৎ সংস্করণ হইতে আপত্তিকর অংশ বাদ দিতে স্বীকৃত হইবার পরও 'প্রমোশন' হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করা হয়। C. L. S. Russell, Esqr., Under Secretary কর্তৃক লিখিত ১০ই মে, ১৯০০ তারিখের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে তাহা জানা যাইবে—

"Promotion to the first four grades of Deputy Magistrates and Deputy Collectors is given by selection for special merit and without regard to seniority, and that after consideration of the reports received regarding the work of Babu Nabin Chandra Sen, the Lieutenant Governor did not consider him deserving of advancement to the first grade.

পরের সেপ্টেম্বরের 'প্রোমোশনে'ও নবীনচন্দ্রকে ডিঙ্গাইয়া তাঁহার নীচের কর্মচারীর প্রমোশন হইল। নবীনচন্দ্র সে সম্পর্কে জানিতে চাহিলে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলেন—

U. S. Club
20th Sept. 1900.

Dear Sir,

With regard to your letter received to day all I can say is that you appear to have forgotten the recent episode concerning your work 'The Battle of Plassey'.

Yours faithfully.
(*Sd/-*) F. A. Slack

'পলাশির যুদ্ধ'ই যে নবীনচন্দ্রের লাঞ্ছনার কারণ, ইহা অবশেষে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—নবীনচন্দ্র ২য় শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখে। অবশেষে ৬ই জুলাই, ১৯০৩ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং তাহার প্রায় এক বৎসর পরেই ১লা জুলাই, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথমোক্ত সরকারী পত্রে উল্লিখিত 'পলাশির যুদ্ধের' 'objectionable passages' বা আপত্তিকর (সরকারী ভাষ্যে) অংশসমূহ নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' ৫ম ভাগ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) রাণীভবানীর উক্তি—

বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্বার।
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতাধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কাটি আনিবে কুমীরে?
প্রদানিবে স্থির গৃহে স্বহস্তে অনল?
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্ত বলে, লভিবে কি ফল?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর!
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর। (১ম সর্গ)

(২) রাণীভবানীর উক্তি—

জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ।
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে; হয়ে উগ্রতর
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দুল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে;—
পরিণাম ভেবে মম শরীর শিহরে। (১ম সর্গ)

(৩) কবির উক্তি—

এই কি পলাশি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে—কি বলিব?—বলিব কেমনে?
স্মরিলে সে কথা হায়! বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,—
যেইখানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে?

যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্বল বাঙ্গালী আজি সজল নয়নে,
গাইবে সে দুঃখ কথা— (৩য় সর্গ)

(৪) কবির উক্তি-

সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা—হইল স্বপন। (৫ম সর্গ)

নবীনচন্দ্র পরে উক্ত কাব্যের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, সেই পরিবর্তিত রূপই বর্তমানে প্রচলিত। কৌতূহলী পাঠক উল্লেখযোগ্য অংশসমূহের পূর্বতন রূপ মডার্ণ বুক এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত 'পলাশির যুদ্ধে'র পরিশিষ্টে (খ) দেখিতে পাইবেন।

নির্দেশিকা

(উদ্ধার-চিহ্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা-নামের দ্যোতক)